এদেশে-ওদেশে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা চার আনা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও কালিকা প্রেস লিঃ, ডি, এল্, রায় স্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

গল্পগুণেশ!

ভবান্ যে সুরসিক সুজন জেনেছি তা গল্পালাপে :
বলতে যা চান বলতে জানেন, বলতে পারেন আপন ভাবে।
তাই তো সেদিন বলেছিলেন : "মুখটি বুঁজেই থাকেন যাঁরা
গভীরতায় টইটুম্বুর নন্ নেসাসারিলি তাঁরা।"
আমিও তালে বলেছিলাম : "সিন্দুকটি বন্ধ দেখেই
যায় না বলা রত্নে ভরা—শিখলাম এটা অনেক ঠেকেই।"

যা দেখেছি, যা চেখেছি, যা শুনেছি—নানা রঙে
আপনাকে তাই বলতে আমি চাই আজ আমার আপন ঢঙে।
হাসতে যারা ভালোবাসে, উজিয়ে প্রাণের কথা বলে
তাদের পরে বিরূপ যাঁরা নন যে ভবান্ তাঁদের দলে—
এই কথাটা যতই ভাবি ততই মানি উদারতা :
মানি—মনের মালাবদল আনে অচিন সার্থকতা।

চৈত্র, ১৩৪৭

স্নেহধন্য

দিলীপ

করবার। যাঁরা মানুষের অন্তরাত্মাকে—spirit of manকে—সবচেয়ে বরেণ্য মনে করেন তাঁদের পক্ষে বলশেভিস্‌মের স্বপক্ষে কিছু লেখা হবে আত্মিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণেরই সামিল। তাই বলশেভিস্‌মের স্বপক্ষে সে সময়ে যা কিছু ইশারা করবার ভঙ্গি করেছিলাম সে সবই বাদ দিতে হ'ল। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু জুড়ে দিলাম যা রিশারের জীবদ্দশায় লেখা সম্ভব ছিল না। তিনি কয়েকবছর আগে মারা গেছেন। তাঁর আত্মহত্যার গুজবও কানে আসে। আমি সংলাপের ভাষা অকুণ্ঠেই বদলেছি। আমার উদ্দেশ্য—মূল বক্তব্যটিকে ফোটানো, তাই ভাষা বদ্‌লাতে কুণ্ঠিত বোধ করি নি—কেন না আমি জানি এর ফলে রিশারের মূল বক্তব্যটি বেশি ফুটেছে। মাদাম কালভে নিবন্ধের সংলাপের সম্বন্ধেও ঐ কথা।

"জল্পনা কল্পনা" নিবন্ধটিতেও অনেক অংশ বাদ দিতে হ'ল—এবং এখানে-সেখানে অনেক কিছু জুড়তে হ'লও ঐ একই কারণে: অর্থাৎ মূল বক্তব্যটিকে যথাসম্ভব পূর্ণায়তি দিতে। এটিও ১৯২৭ সালেই লেখা। এটি বেরোয় বছর তিনেক আগে আনন্দবাজারে।

"কলির গরুড়"—ছড়াটিও ১৯২৭ সালে লেখা—কেবল সে সময়ে এটি গদ্যে লিখেছিলাম। ১৯৪০-এ এটি লিখতে গিয়ে হঠাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দ পেয়ে বসল—প্রবহমাণ স্বরবৃত্ত—আমার "ছান্দসিকী" বইটিতে যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি পরমানন্দে। ভাবলাম, মন্দ কি? আষাঢ়ে-তে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন; পরে আলেখ্যে এর পরিণতি হয়—আষাঢ়ের ছন্দশৈথিল্য বর্জন করার দরুণ। এটিকে ছড়ায় গল্প মনে করাই শ্রেয়। এটি বেরিয়েছিল ভারতবর্ষে। এ ছন্দের মধ্যে প্রবহমাণ ভঙ্গি কিন্তু ঠিক মামুলি নয়।

"গুণী সুরেন্দ্রনাথ"—কয়েক বৎসর আগে বেরিয়েছিল বিচিত্রায়—সুরেন্দ্রনাথের তিরোধানের কয়েক মাস পরেই। এটিও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত।

"সুরেলা"—বেরোয় উত্তরায় অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর পরে, কয়েক বৎসর আগে। অতুলপ্রসাদের সম্বন্ধে আরও অনেক লেখবার আছে। 'এদেশে-ওদেশে'র দ্বিতীয়ভাগে সে সব লেখার ইচ্ছা আছে। শরৎচন্দ্র, ভাতখণ্ডে, লরেন্স, দেশবন্ধু, কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখব তাতে।

"অলডাস হক্সলি" প্রবন্ধটি বেরোয় উত্তরায় ১৩৪৭ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক বন্ধু শ্রীমেঘনাদ সাহা মহাশয় ভারতবর্ষ পত্রিকায় ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে হাসিমস্করা শুরু করেন—এ সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভবের নানা সাক্ষ্যকে বুজরুকি সাব্যস্ত ক'রে। বন্ধুবর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী "হসন্তের পত্রে" মেঘনাদ বাবুর ব্যঙ্গবাণের জবাব দিয়েছিলেন—সেটি বেরিয়েছিল দেশ পত্রিকায়। বড় চমৎকার লিখেছিলেন তিনি। ইচ্ছা ছিল এরই উপসংহারে জুড়ে দেব। কিন্তু হ'ল না স্থানাভাবে। এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিক যে ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে অতিমাত্রায় ব্যঙ্গ করেন এ-সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এ-প্রবন্ধটির তাৎপর্য ও যুক্তি বেশি সুবোধ্য হবে।

পরিশেষে ঋণ স্বীকারের পালা। বইটির নাম তথা সম্পাদনের জন্যে আমি ঋণী বন্ধুবর শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাছে। তিনি নিজে রসিক তাই এ শ্রেণীর বইয়ে রস পান। তিনি উদ্যোগী না হ'লে এ বই হয়ত কোনোদিনই বেরুত না।

বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র আমার প্রুফ দেখার কাজে সহায়তা

করেছেন। তা সত্ত্বেও মুদ্রাপ্রমাদ কিছু র'য়ে গেল, এ জন্যে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে ক্ষমা চাচ্চি—শুধু কয়েকটি মারাত্মক ভুলকে চিহ্নিত ক'রে।

১৬ পৃষ্ঠায় ৮এর লাইনে—পরকে—পাঠ্য।

১২৮ পৃষ্ঠায় ১৭-র লাইনে—কাব্যমন্দাকিনী—পাঠ্য।

১৩৯ পৃষ্ঠায় ১৪-র লাইনে—দিন কিনে—পাঠ্য।

১৫৪ পৃষ্ঠায় ১৫-র লাইনে—নিশির তিমির—পাঠ্য।

১৭৪ পৃষ্ঠায় ৭-এর লাইনে—রয় সে নব উদয় অভিমানী—পাঠ্য।

১৯৫ পৃষ্ঠায় ৬-এর লাইনে—ও অপরূপ বিকাশধারা—পাঠ্য।

বাকি যেসব ভুল রইল সেগুলি ভুল ব'লে চেনা কঠিন হবে না ভেবেই চিহ্নিত করলাম না। তাছাড়া শুদ্ধিপত্রের বহর বাড়িয়ে লাভও বিশেষ দেখি না—ওদিকে খুব কম পাঠকই নজর দেন। তবু—

শুনি আমাদের দেশে উপন্যাস ছাড়া আর কোনো লেখা বড় একটা কাটে না। তাই 'এদেশে-ওদেশে'-র ভাগ্যে সমাদর জুটবে এ সম্ভাবনা কম। তবে নিবন্ধগুলি সবই আনন্দের তাগিদে লেখা—এই যা ভরসা।

চৈত্র, ১৩৪৭
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এদেশে—ওদেশে

দুহামেল

(Georges Duhamel)

য়ুরোপের আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে দুহামেল যে অগ্রণীদের পর্যায়ে পড়েন সে বিষয়ে ওদের দেশে অভিজ্ঞ মহলে মতভেদ নেই। এঁর রচনার ছত্রে ছত্রে চিন্তাশীলতা ছাড়া আর যে গুণটি মন টানে তাকে আলঙ্কারিকদের পারিভাষিকে বলে "প্রসাদগুণ।" প্রসন্নতা বললেও ভুল হবে না। কারণ এ মানুষটি প্রসন্ন স্বভাবেও বটে —শুধু লেখায়ই নন। জীবনে অশেষ দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয়ে যাঁদের অন্তরাত্মার প্রসন্নতা ম্লান হয় না, সেরকম মানুষ সব দেশে সব যুগেই বিরল। জর্জ দুহামেল এহেন বিরল মনীষীদের অন্যতম অধিনায়ক। শুধু জাতিতে ফরাসি নন—স্বভাবেও তাই; অর্থাৎ রসিক, রসাল, সুজন, অমায়িক—ফরাসিদেশকে সবচেয়ে ভালবাসেন —অথচ বিদেশিবিমুখ নন। ডীন ইঞ্জ তাঁর Outspoken Essaysএ বলেছেন ইংরাজ জাতির স্বভাব দ্বীপসম্ভব—insular—যেটা দ্বীপাবদ্ধ জাতিরা প্রায়ই হয়। ফরাসিদেশের একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে ওদেশ আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবর্তক হ'য়েও য়ুরোপের সঙ্গে ওর নাড়ীর টান যেন কে কেটে দিয়েছে। তাই ফরাসি জাতি প্রায়ই বিদেশী ভাষা শিখতে চায় না সহজে। দুহামেল মনে প্রাণে স্ব-ভাষী —সাহিত্যিক, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যিক নন—ফরাসি সাহিত্যিক।

তাই তো আরো এঁকে নেশায় পেয়েছে—সাহিত্যের নেশা—যেটা ফরাসি জাতের চিরকালিক জন্মস্বত্ব। বিশেষ ক'রে গদ্য সাহিত্যে। বহুমুখী সে গদ্য। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা—কী নয়? অথচ এ সবই ওরা রসের জারকে জারিয়ে স্বাদু ক'রে নেবে—নইলে ফরাসি জাত বলেছে কেন? *Belles lettres!* কী চমৎকার কথা!…"মঞ্জুবাণী!" ইংরাজি ভাষায় এর প্রতিশব্দ এখনো গ'ড়ে ওঠে নি। Dilettante, "অশিক্ষিত পটু"—তথৈবচ—যদিও একথাটি ইংরাজি ভাষা আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। কিন্তু এর প্রতিশব্দ রচতে পারে নি এইটেই লক্ষ্য করবার। কেন পারে নি? কারণ এ ধরণের রস-সমৃদ্ধ শব্দের পিছনে যে মন রয়েছে সে মনের স্রষ্টা য়ুরোপে একমাত্র ফরাসি জাত। সাধে কি গ্রীকদের পরে স্নিগ্ধ বৈদগ্ধ্য প্রচার করল এরাই। রস এদের কাছে সত্যিই নেশা… পেশা নয়।

কথাটা ভুল বোঝা না হয়। বলা হচ্ছে না মোটেই যে ফরাসিরা সবাই দাতাকর্ণ—বরং উল্টো। পারিসের ফরাসিরা প্রায়ই খাঁটি ফরাসির নমুনা নয়। খাঁটি ফরাসি পারিসিয়ানদের মতন প্রজাপতিপন্থী ফুরতিবাজ নয়…তারা স্বভাবে শ্রমশীল, রক্ষণশীল, ঘরোয়া…এমন কি ইংরাজদের মতন রেস্তোরাঁ-বিলাসীও নয়। এই সব কারণে ঠিক্ কঞ্জুষ না হোক কৃপণ ব'লে এদের বেশ একটা নামডাক আছে কন্টিনেন্টে তথা ইংলণ্ডে। আমি কিন্তু এদের হিসেবি বলব। চব্বিশ ঘণ্টা প্রতিবেশী জাতিকে ভয় ক'রে ও ভয় দেখিয়ে, জাঁক ক'রে ও সমঝিয়ে যাদের চলতে হয় তাদের দুর্দিনের জন্যে কিছু মধুসঞ্চয় ক'রে রাখতে হবে বৈ কি। তাই এরা বুঝে সুঝে চলে। বিনা মেঘেই যে বাজ বেশি হানা দেয় এরা ঠেকে শিখেছে…একবার নয়, বহুবার!

কিন্তু তবু বলতেই হবে যে এরা স্বভাবে রসিক। রসের অন্ধি-সন্ধি এদের জানা। একটা উদাহরণ দিই! কি ভাবে ইতালিয়ান বিলাসী কাসানোভা (Casanova) পারিসে গিয়ে পড়েন নাট্যকার ক্রেবিল-র (Crebillion) কাছে। পারিসে bells lettres-এর চর্চা এত গাঢ়-ভাবে হয় যে তত্রত্য সাহিত্যে গুরুবাদ ও নকলনবিশি আছে সবাই জানে। ওস্তাদের কাছে আমরা ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে শিখি তেমনি ওরা শেখে গন্ত পন্ত লিখতে। যেমন ধরা যাক্ মোপাসাঁ শিখতেন বিখ্যাত ফ্লবেয়ারের কাছে। কাসানোভা গুরু ক্রেবিল'র কাছে তাঁর কবিতা নিয়ে হাজির। ক্রেবিল দেখে শুনে বললেন! হুঁম্···চমৎকার। চরণগুলি শুদ্ধ। ভাব সুন্দর···কাব্যময়। ভাষা নিখুঁৎ। কিন্তু তবু কবিতাটি বাজে।" ক্যাসানোভা তো অবাক্...এধরণের কথা বেচারি ইতালিতে কবেই বা শুনেছে? বলল: "সে কি প্রভু? সব ভালো অথচ কবিতাটি বাজে··মানে?" ক্রেবিল বললেন: "ঠিক আসল জিনিষটি নেই যে...যদিও সেটি যে কী ব'লে বোঝান যায় না। তবে একটা উপমা দেওয়া যায় শোনো। ধরো একটি নিখুঁৎ কন্দর্প। কিন্তু মেয়েটি বলল: 'হ'লে হবে কি ওঁর সবই আছে, অথচ কিছুই নেই...মানে, উনি পারলেন না আমার মন চুরি করতে।' (বনামি দোব্রে প্রণীত "ক্যাসানোভা"...তৃতীয় অধ্যায়)

তুহামেলকে বলা চলে এই ধরণের রসিক। তাই রুগী দেখেন ইনি টাকার জন্যে বটে, কিন্তু লেখেন মুখ্যত লেখারই জন্যে। লিখে আয় হয়ত কিছু হয়···কিন্তু সেটা এঁর কাছে গৌণ। এধরণের শৌখিন রসিককে ভালো না লেগে পারে—লেখা যাঁর কাছে নেশা হ'য়েও পেশা নয়?

রুগী দেখেন বলা হ'ল যখন তখন এঁর পেশার কথাও বলা

হ'ল একনিশ্বাসে। অর্থাৎ ইনি পারিসের ডাক্তার—আর বেশ নামকরা ডাক্তার। বিগত মহাযুদ্ধে অনেক হতাহতের পরিচর্যায় থাকতে হয়েছিল তাই রণসাধ এঁর মিটেছে, সে কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ওঁর বিখ্যাত "Civilization" বইটির ছত্রে ছত্রে। এ বইটির শেষে দুহামেল লিখছেন :

"বিংশ শতক আমার কাছে জঘন্য মনে হয়—সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎকেও মনে হয় কুৎসিত যার উপরে ভর ক'রে য়ুরোপ নিজের জঘন্যতার পরিচয় দিচ্ছে—ঘৃণ্য কলঙ্কের ম'ত। তাই বর্ব্বরদের মধ্যে নিগ্রোদের মধ্যে আমার পালাতে ইচ্ছে হ'ত কিন্তু নিগ্রোরাও তো আর খাঁটি নিগ্রো নেই, আমরা তাদেরকেও যে করেছি ভ্রষ্ট। তারা যে কী তা কি Soissonsতে স্বচক্ষে দেখিনি? (২৫৮ পৃষ্ঠা)"

অবশ্য এধরণের কথার মধ্যে বৈরাগ্যের বিতৃষ্ণার অতিশয়োক্তি থাকতে বাধ্য—কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে দুহামেল হলেন তাঁদের মুখপাত্র যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন যুদ্ধ কী বস্তু, যুদ্ধে শুধু যে নিজে আহত হয়েছেন তাই নয় বহু আহত সৈনিকের সেবা করেছেন —তাদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা চোখের সাম্‌নে দিনের পর দিন চাক্ষুষ করেছেন। তাই উপরের উদ্ধৃতিটিকে অত্যুক্তি জাতীয় ব'লে খানিকটা নামঞ্জুর করা সম্ভব হ'লেও দুহামেলের এ শ্রেণীর চিন্তাকে কোনো চিন্তাশীল সুধীই পূরোপূরি নামঞ্জুর করবেন না যে "এ-জগৎকে আমার মনে হয় ভ্রষ্টলক্ষ্য, অসংলগ্ন, অসুখী। আর এ-ও মনে হয় যে এ-ধারণা ভ্রান্ত নয়। মনে করবেন না আপনারা যে যখন বলছি এ জগতের অবস্থা শোচনীয় তখন আমি ওজন ক'রে কথা বলছি না। অপিচ, এ-যুগের বেতার-বার্তার কীর্তি দেখে যে আমার মতিগতি ফিরবে তা মনে হয় না।...(২৭১ পৃষ্ঠা)"

আলডুস হাক্‌সলি তাঁর Ends and Means বইটিতে বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন এযুগে যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিক তাঁদের বিজ্ঞানমোহ যদিও কতকটা কেটেছে, কিন্তু রাম শ্যাম যদু হরি রূপ অনভিজ্ঞ বিজ্ঞানান্ধরা এখনও বিজ্ঞানের চতুর্বর্গসাধনী শক্তি নিয়ে আরো জোরে ঢেঁড়া পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন—পথে ঘাটে, সময়ে অসময়ে। হয়েছে কি, এঁরা আধুনিক সভ্যতাকে বড় ক'রে দেখেন প্রায়ই বিজ্ঞানের সেই সব দানের জন্য যারা বেশি চোখ ধাঁধায়, চমক লাগায়। দুহামেল তাঁর "Civilization"-এ ছবির পর ছবি এঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিক tank, বোমা আরো হাজারো মারণাস্ত্র কি ভাবে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে দানবিকতার দিকে। যুদ্ধের মধ্যে মানুষের সেবার দিকটা এর যে চোখে পড়ে নি তা নয়—এঁর নানা চিত্রে ও নকসায় সে পরিচয়ও রয়েছে।* কিন্তু তবু এঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি যার ফলে অনেকেরই কাচে কাঞ্চন ভ্রম হয়,

---

* Civilization বইটিতে—Amours de Ponceau (পঁসো সৈনিকের পত্নীপ্রেম) চিত্রটী শিল্পানুরাগী মাত্রেরই পাঠ্য। এতে দুহামেল অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এঁকেছেন দারুণ আহত সৈনিক পঁসোর জীবন সঙ্কটের সময়ে তার তন্বী পত্নী এসে কিভাবে যমের মুখ থেকে তাকে বাঁচালো। এসূত্রে কী দরদের সঙ্গেই যে ইনি বর্ণনা করেছেন হাঁসপাতালে ধাত্রীদের সেবা দরদ ও পঁসোর পত্নীপ্রেম নিয়ে নারীসুলভ ঔৎসুক্যের বাড়াবাড়ি। প্রথম যেদিন পঁসো কয়েক ঘণ্টার জন্যে স্ত্রীর ঘরে যাবার অনুমতি পেল তখন সুন্দরী তরুণী ধাত্রীদের সে কী আগ্রহ, ডাক্তারদের সে কী দার্শনিকতা যে আহত সৈনিকরা বীরপুরুষ, তাদের বংশ তো থাকা চাই, মেয়েরাও তাঁর অভিসার বিধানে সে কী পুলকীত! উঃ! সবাই পঁসোকে যেন অলকাতিলক কেটে পাঠালো স্ত্রীর ঘরে, আহা যেন সাক্ষাৎ রসবৃন্দাবনে! সঙ্গে সঙ্গে পঁসোর পঙ্গুতা নিয়ে বেদনাও অপূর্ব রসাল—মর্মস্পর্শী!

সভ্যতাকে বড় মনে হয় তার সাজ সরঞ্জামেরই জন্য। ডুহামেল বলছেন :

"সুখ কী,মঙ্গল কাকে বলে সে নিয়ে মানুষের প্রায়ই ঠিক ভুল হয়। এমন কি উদারতম মানুষেরও এ-ভুল হয় কেন না তাকে নীরবতা ও নির্জনতা থেকে বঞ্চিত রাখে আমাদের যন্ত্র-সভ্যতা। আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাঁতি—যাদের সিংহাসনে বসিয়ে জনে জনে স্তবোন্মুখ। কিন্তু তবু আমি বলবই বলব যে সত্য সভ্যতা নেই এসব অতিকায় উপাদানে উপকরণে—অবান্তর মারণাস্ত্রে। তাকে পেতে হবে মানুষের হৃদয় রাজ্যে,—সেখানে যদি তাকে না মেলে তবে জানবেন সে কোথাওই নেই।" (২৭২ পৃষ্ঠা)

এঁর আর একটি বইয়ে ডুহামেল নিজের যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দরদী ভঙ্গিমায় তা থেকেও একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ হচ্ছে :

"ভাগ্যবশে যুদ্ধের সময়ে আমাকে এমন একটি স্থানে থাকতে হয়েছিল, আর এমন কাজে,—যেখানে মানুষের ব্যথাই ছিল আমার একমাত্র দৃশ্য, ও ব্যথার সঙ্গে যুদ্ধ করা ও তাকে বোঝা-ই ছিল আমার একমাত্র কর্তব্য। তাই যদি এ বইখানাতে আমি মানুষের বেদনা নিয়ে একটু বেশি উদ্‌ভ্রান্ত ব'লে প্রতীয়মান হই, তবে আশা করি, সেটা ক্ষমনীয়।"* সংসারে এক একজন লোক থাকেন, কোন

* Let sort m'a, pendant la guerre, assigne´une pleace et une tāche telles que la douleur est mon unique spectacle, mon e´tude et mon adversaire de tous les instants. Que l'on m'excuse d'y songer avec une perse´ve´rance qui ressemble ā de l'obsession.—La Possession du Monde (জগতের সম্পৎ)……Georges Duhamel.

বিপৎপাতেই যাঁদের স্থির ও শান্ত বুদ্ধিকে বিচলিত করতে পারে না। দুহামেল এই শ্রেণীর লোক। স্বনামধন্য রোমা-রোলাঁর অন্তরঙ্গ ইনি। তিনি আমাকে দুহামেল সম্বন্ধে ভূমিকাচ্ছলে একদিন বলেছিলেন "দুহামেল বিচার ও বিশ্লেষণ-প্রবণ; ততটা রাগ-প্রবণ (emotional) নন। নৈলে যুদ্ধের সময়ে ও বিশেষত তার কেন্দ্রের মধ্যে থেকেও তিনি অমন নির্বিচল থাকতে পারতেন না।"

এহেন মনীষীর সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯২২ শে সুইজর্লণ্ডে একটি শান্তি-সমিতিতে। সেখানে যেদিন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন প্রথম দর্শনেই তাঁর সৌম্য, বুদ্ধি-উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ শান্ত মুখশ্রী আমার একটু বেশিরকমই ভাল লেগেছিল। আমি তখন একজনকে বলেছিলাম: "বোধ হয় ইনিই জর্জ দুহামেল; কারণ এঁর মুখ চোখে একটি অসাধারণত্ব আছে।" মহৎ লোক মাত্রেরই মুখে যে সব সময়ে একটা আকর্ষণী শক্তি থাকতে বাধ্য এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। অনেকে প্রথম দর্শনেই আমাদের মনের উপর একটা চমৎকার প্রভাব বিস্তার করেন; আবার অনেকের মুখ চোখে এমন কোনও বিশেষত্বই দেখা যায় না। রাসেলের সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন যেন তাঁর চেহারা দেখে একটু নিরাশ হয়েছিলাম মনে আছে; কিন্তু দুহামেল একজন সত্যকার আর্টিষ্ট ব'লেই হোক বা না হোক—(যেহেতু ইনি শুধু যে সাহিত্যিক তাই নয়, তার ওপর সঙ্গীত রসের একজন সত্যকার রসিক)—তাঁর মুখমণ্ডলের ও প্রশস্ত সৌম্য ললাটের এমন একটা মনোজ্ঞ আকর্ষণী শক্তি ছিল, যা আমাদের অনেকেরই মন টেনেছিল। পরে আমার এঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এ সমিতিতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দুহামেল দম্পতিকে আমাদের অনেকেরই ভারি ভালো লেগে গিয়েছিল। আমরা

প্রায়ই আহারের সময় দুহামেল-দম্পতীর সঙ্গে এক টেবিলে বসতাম। এঁর স্ত্রীও ছিলেন অতি মধুর প্রকৃতির মানুষ। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। মলিয়েরের "মানববিদ্বেষী" Misanthrope নামক বিখ্যাত নাটকটি যখন পারিসের একটি শ্রেষ্ঠ থিয়েটারে অভিনীত হ'তে দেখি, তখন এঁর Arsinoe-র ভূমিকা যে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল তা মনে আছে। তাই হঠাৎ এরূপ একজন প্রথমশ্রেণীর অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে মনটা ভারি খুশি না হ'য়েই পারে নি। তাছাড়া, এই সূত্রে য়ুরোপে অভিনয়কলার যে এতখানি সম্মান—যাতে দুহামেলের মতন লোকও একজন অভিনেত্রীকে বিবাহ করতে ব্যগ্র হ'তে পারেন—ভেবে মনে আনন্দ হয়েছিল। আর আমাদের দেশে? তবে যাক্ এ কথা, যা বলছিলাম।

দুহামেল এ সমিতিতে "ব্যক্তিত্ব ও মানবতন্ত্রতা" (L'individualisme et l'inte´rnationalisme) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। নিতান্ত ধীরে ধীরে, বিনা আড়ম্বরে, গল্পচ্ছলে। এঁর বক্তৃতার মধ্যে লম্বা-চওড়া আস্ফালনের নামগন্ধও ছিল না ব'লে আমাদের বেশ চমৎকার লেগেছিল। ইনি বলেছিলেন: "বক্তাকে আমি কখনও বিশ্বাস করি না, তবে কথককে করি। আমি তোমাদের কাছে কথা বলতে এসেছি বক্তা-হিসাবে নয়, বন্ধুভাবে। আমার উদ্দেশ্য বক্ষ্যমাণ বিষয়টি নিয়ে নিতান্তই বন্ধুভাবে একটু তর্ক করা, একটু আলোচনা করা।"

এর মধ্যে ছিল কথার বর্ণে ও আলোছায়ায় নিজেকে প্রকাশ করবার চমৎকার ক্ষমতা, যেটা সাহিত্যিক হ'লেই যে সব সময়ে থাকে তা নয়। বরং কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেও দেখেছি কথা কইতে গেলেই ঘুলিয়ে ফেলেন সব। এঁর কথালাপ চলত ঝরণার ম'ত তর্ তর্ ক'রে। ফরাসি ভাষার কোন স্বাভাবিক সরসতার জন্যই কি না

জানি না, কথাবার্তায় ফরাসি জাতির ক্ষমতা বোধ হয় অন্যান্য অনেক জাতির চেয়ে বেশি। অন্তত অনেক বাক্যবাগীশের এই মত। এই সূত্রে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে, ফরাসি জাতির পাশে থেকেও জর্মন জাতি কেমন করে জর্মন ভাষার মতন একটা অসুন্দর ভাষা গ'ড়ে তুলেছে, ও কেনই বা তারা ফরাসি জাতির কাছ থেকে বাক্য-সন্ধানী হতে শিখল না।

ওঁর দৈনিক কথাবার্তা কেমন একটা সূক্ষ্ম রসিকতা-ধারায় রঞ্জিত ছিল, তার একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় মন্দ নয়। এ-সমিতিতে এক আমেরিকান পাদ্রি মহোদয়ের একটু অত্যধিক জলদ্‌গম্ভীর স্বরে কথা বলার ও উত্তেজিত ভাবভঙ্গি অনেকেরই ভাল লাগে নি। দুহামেলকে কৌতুকচ্ছলে এ কথা বলাতে তিনি একটু হেসে উত্তর দেন: "রায় মহাশয়! যখন দেখবে কোনও বক্তা তারস্বরে ও সজোরে কোনও মতামত প্রকাশ করছেন তখন বুঝবে যে তিনি যা জোর ক'রে বলছেন তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। আর যখন দেখবে যে, তিনি টেবিলে ভীম মুষ্ট্যাঘাত ক'রে কোনও বিশেষ মত জাহির করছেন তখন নিশ্চয় জেনো যে, তিনি যা বলছেন তা নিজে বিশ্বাস করেন না।"

ভারতীয় সঙ্গীত শুনে ইনি আমাকে বলেছিলেন যে, এ অভিনব সঙ্গীত তাঁর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া তুলেছে এবং সঙ্গীতের এ নূতন রাজ্যের অস্তিত্বও তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন: "তোমাদের দেশের সঙ্গীতে তোমাদের উচ্চ সভ্যতার যে একটা মস্ত প্রমাণ, এ বিষয়ে এক অন্ধ ছাড়া আর কেউই সন্দেহ করতে পারে না। এখন যদি কোনও বিজ্ঞম্মন্য ইংরেজ আমার কাছে এসে ভারতীয় সভ্যতার হীনতা প্রমাণ করবার প্রয়াস পান, তবে

যে আমি তাঁর মুখের উপরই হেসে তাঁকে অপ্রস্তুত করে দেব * এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।" য়ুরোপে সঙ্গীত-রসের উদার ও প্রকৃতরসিক ছাড়া অন্য কারুর মনে আমাদের সঙ্গীত যে বড় একটা সাড়া তোলে না, এটা লক্ষ্য ক'রে আমি প্রথম প্রথম একটু আহত বোধ করতাম; তাই আমাদের সঙ্গীতের এরূপ আন্তরিক তারিফে যে আমার মনটা খুশিতে ভ'রে গিয়েছিল, এ কথা বোধ হয় বলাই বেশি।

ভারতীয় সঙ্গীত দুহামেলের একটু বেশি রকম ভালো লেগেছিল, কারণ তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন: "দেখ, আমি সঙ্গীত বিনা বাঁচতে পারি না। যুদ্ধের সময়ে আহতদের চিকিৎসা করার সময়ে সঙ্গীত শুনতে না পেয়ে আমি বাঁশি বাজাতে শিখেছিলাম এবং তা থেকে যে কতটা আনন্দ পেতাম, তা আর তোমাকে কি বলব? এখনও মাঝেমাঝেই আমার বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে আমরা রীতিমত কন্সার্ট দিয়ে থাকি।" এ থেকে বোঝা যায় যে, ইনি সঙ্গীতকে সত্যসত্যই ভালোবেসে এসেছেন ও সে ভালোবাসা—"Oh, I love music"-রূপ সামাজিক ভালোবাসা নয়—সত্যকার সঙ্গীতানুরাগ।

ভারতীয় সঙ্গীত যে তাঁর মনে কিরূপ সাড়া তুলেছিল, তা তিনি আমাকে পরে একটি দীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন—"Il ne se passe pas de jour où je ne m'efforce de chanter dans mon coeur les chants extraordinaires que vous nous avez fait entendre le dernier soir" (এমন দিন বোধ হয় যায় না, যে দিন আমি মনে মনে তোমাদের অসাধারণ ভারতীয় সঙ্গীত গাইতে চেষ্টা না করি, যা তুমি সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের শুনিয়েছিলে।)

* এস্থলে "rire au nez" বাক্যটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন; তার হুবহু বাঙ্গলা অনুবাদ হবে "নাকের ওপর হেসে দেওয়া"।

দুঃখময় জগতে, যেখানে মানুষের বাস্তব দারিদ্র্যগত অবিচারের কষ্ট এত বেশি, সেখানে সঙ্গীতরূপ ললিত কলার চর্চা কি একদিক্‌দিয়ে হৃদয়হীন কাজ নয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ইনি উত্তর দেন : "জগতে দুঃখ কষ্ট লাঘব করার ক্ষমতা কি সঙ্গীতের কম? আরও দেখুন, সত্যকার সঙ্গীতকার তাঁর সঙ্গীতের চর্চায় জগতের যতটা হিত সাধন করতে পারবেন, অন্য কোনও সমাজ-হিতকর কাজেও তিনি ততখানি কাজ করতে পারবেন কি না, এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করার খুবই কারণ আছে।" ব'লে তিনি একটি ভারি চমৎকার গল্প বলেন—সত্য ঘটনা। বিগত যুদ্ধের সময়ে একটি জর্মন সৈনিক আহত হ'য়ে ফরাসি হাঁসপাতালে আসে। ডুহামেল ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। রোজই আসেন যান, ও তার সঙ্গে মৃদুভাবে ও বন্ধুভাবে কথাবার্তা কইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু বন্দী তাঁকে শত্রু ব'লে এড়িয়ে এড়িয়েই চলে। "হাঁ-না" ছাড়া কোনও কথাই বলে না। ডুহামেল বললেন "কোনও মতেই তার মনটির নাগাল না পেয়ে এত খারাপ লাগে রায় মহাশয়, অথচ শত্রু-বিদ্বেষ তার মনে এতই প্রবল যে, কোনও উপায়ও দেখিনা। একদিন আমি তার কাছে বসে অন্যমনস্ক ভাবে Beethoven-এর একটি Symphonyর একটুখানি সুর আস্তে আস্তে শীষ দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি, ওর মুখের কঠিন ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে কোমলভাব দেখা দিয়েছে ও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—'Beethoven এর অমুক Symphony—নয়?' আমি একটু হেসে বললাম 'হাঁ'। কিন্তু তার পরেই বোধ হয় ওর ফের মনে হ'ল যে আমি তার দেশের শত্রু; অমনি ওর মুখে সেই দূরত্বের ও কাঠিন্যের পর্দা টেনে দিল কে।" সাধে কি তিনি লিখতে পেরেছেন : "মানুষের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে, অপরকে

সুখ দিতে পারা; এবং যারা এ কথাটি জানে না, তারা জীবনের কী-ই-বা জানল?" (La plus grande joie, elle est de donner le bonheur, et ceux qui l'ignorent ont tout a apprendre de lo vie...... Possession du Monde.) এ গোঁড়া জাতীয়তার যুগেও ইনি মানুষের মনুষ্যত্বকে খাটো করেন নি, কেন না ইনি স্বভাবে দেশভক্ত হ'লেও দেশধ্বজ নন।

ইনি সচরাচর খুব সরস ও দ্রুত কথা বললেও, অপরের কথা সর্বদাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। চীন জাতির একটি মহৎ গুণের সম্বন্ধে রাসেলের মন্তব্য পড়তে পড়তে দুহামলের কথা মনে হয়: "কোনও চীনের সঙ্গে কথাবার্তা কইবার সময়ে বেশ অনুভব করা যায় যে, সে অপরের সঙ্গে কথা কয় তাকে বোঝ্‌বার চেষ্টা নিয়ে, তার কোনও পরিবর্তন বা অঙ্গহানি ঘটাবার অভিপ্রায় নিয়ে নয়" * এবিষয়ে দুহামেল যে কতটা উদারমনা, তা তাঁর এই কয়টি কথা থেকে প্রতীয়মান হয়:—"যদি কখনও কেউ তোমাকে আশ্চর্য কিছু বলে, অর্থাৎ এমন কোনও কথা যা তুমি কখনও শোনোনি, হেসো না, মন দিয়ে শুনো। তাকে না হয় বোলো তার কথাটি আরও দু'চারবার বলতে বা বোঝাতে। কারণ তার এ অভিনব কথার মধ্যে কিছু না কিছু শেখার থাকবেই।"† দুঃখের বিষয় এরূপ মনোভাব জগতের

* In talking with a Chinese, you feel that he is trying to understand you, not to alter you or interfere with you.

The Problem of China (p. 84) Bertrand Russel.

† Si quelqu'un vous dit sur le monde une chose e'trange, une parole que vous n'avez point encore entendneue, riez pas, mais e'-coutez attentivenment; faites re'pe'ter, faites expliquer, il y a sans donte quelque chose a' prendre la...La Possession du Monde.

মধ্যে বেশি লোকের মনে স্থায়ী হয় না। হ'লে আজ জগতে গোঁড়ামি এমন বুক ফুলিয়ে বেড়াত না।

একদিন আমরা এই লুগানো শান্তি-সমিতিতে এক টেবিলে আহার রূপ প্রয়োজনীয় কাজটিতে নিরত আছি—এমন সময়ে দুহামেল হঠাৎ একটি পরিচারিকাকে "মাদাম" (মহাশয়া) সম্বোধন ক'রে কি একটি আহার্য আনতে অনুরোধ করেন। য়ুরোপে পরিচারক-পরিচারিকা সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশের পরিচারকদের অবস্থার চেয়ে ঢের উন্নত হ'লেও আমি এর আগে কোন পরিচারিকার "মাদাম" সম্বোধন শুনি নি। হয়ত অনেকের মনে হতে পারে যে, এ শিষ্টতা একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তা নয়। কারণ দুহামেল যে শিষ্ট আচরণ করতেন তার পিছনে লৌকিক বাধ্যবাধকতার বাষ্পও ছিল না। তাঁর মত ছিল এই যে আমরা জীবনে প্রায়ই মনে ক'রে থাকি যে, দুঃস্থ যে, তার দুরবস্থা দূর করা ছাড়া আর কোনো মহৎ কাজ নেই মানুষের। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ের রহস্য দুর্ভেদ্য—কী ক'রে যে মানুষের বৈষম্য-সমস্যার সুরাহা হয় তা-ও আমরা কেউই জোর ক'রে বলতে পারি না। কিন্তু যেটা পারি সেটা যদি প্রাণপণে করি তাহলে অপরের বড় বড় দুঃখ শোকের কিছু করতে না পারলেও, দুঃস্থের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে না পারলেও, দুটো মুখের কথায়ও অনেক ক্ষোভের গ্রন্থিমোচন হয়। সেইজন্যে দরদের একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যথা কোথায় সূক্ষ্ম হ'য়ে লুকিয়ে থাকে, দুঃখ কোথায় নিজেকে না জানিয়ে আরো দুঃখ পায় তার খবর পেতে চেষ্টা করা। আন্তরিক শীলতা (মৌখিক 'থ্যাংক ইউ'এর শীলতা নয়) করতে পারে এই বড় কাজটি যদি আমরা ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝি।

আমার সৌভাগ্যবশে এ-সত্য আমি বহুবার উপলব্ধি করেছি জীবনে। তাই অর্থকষ্ট জাতীয় জ্বালায় জ্বলতে না হওয়া সত্ত্বেও অনেক

দুঃস্থের দুঃখকে বোধে বোধ করতে পেরেছি। দুহামেলের দৃষ্টান্ত এদিকে আমার সহজবোধকে আরো উস্কে দিয়েছিল ব'লে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কী ভাবে একটু বলি খুলে।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে অনেক ভদ্র পরিবারকে পরিচর্যাবৃত্তিভোগী হ'তে হয় দায়ে প'ড়ে। এ শ্রেণীর পরিচারিকাকে (কারণ দাসীবৃত্তি তাদেরই বেশি করতে হয়) দুটো মিষ্ট কথা বললে তাদের দুঃখমোচন না হোক—অনেক ক্ষোভের গ্রন্থি কেটে দেওয়া অসম্ভব নয়—যে গ্রন্থি বাঁধে দুটো টান : উপরওয়ালার অহমিকা আর পদানতের অবসাদ। এই লুগানোতেই এম্‌নি একটি শোকাবহ গ্রন্থিমোচনের ভার আমার উপর পড়েছিল খানিকটা।

সে বেচারি ছিল আমারই ঘরের পরিচারিকা—অবশ্য হোটেল-নিযুক্ত। তন্বী শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে। ইতালিতে যেরকম brunette প্রায়ই দেখা যায় সেই রকম রঙ। চোখদুটি ছিল তার যেন জলে-ভরা। কথা বলতে গেলে প্রায়ই সে মুখ তুলে তাকাত না—উত্তর দিলেও দিত মাটির দিকে চেয়ে। কেউ আমাকে কিছুই বলে নি—কিন্তু দুহামেলের কাণ্ড দেখে তাকে আমিও নাম ধ'রে না ডেকে ডেকেছিলাম মাদাম ব'লে। মেয়েটি তাকালো আমার দিকে। সেই থেকে ওর সঙ্গে ভাব সুরু হয়। ওর আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল যেন মুহূর্তে—হয়ত আমার সমীহ করার দরুণই কে জানে? ওর চোখ দুটি যেন বলত নিরন্তর :

মুখের দরদ নয়ত মুখের কথা
উৎস যে তার প্রাণের অতল তলে
ব্যথা দিয়ে বুঝলে মনের ব্যথা
আকাশ-আলোই ঝরণা হ'য়ে ঝলে।

এইসূত্রে দেখলাম আর একটা জিনিষ। এ মেয়েটি কাউকেই ধরা ছোঁওয়া দিত না। একলা একলাই থাকত চুপচাপ। হঠাৎ কি হ'ল—আমাকে বলতে সুরু করল কত কথাই যে! আহা—পরে কত সন্ধ্যায়ই যে ওর ম্লান মুখখানা মনে পড়েছে—আর সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা—আমাকে ওর কথা বলতে পেয়ে। অথচ আমি শুধু শুনে গিয়েছিলাম—এ ছাড়া আর কী বরদানই বা তাকে দিতে পারতাম?

বলল বেচারি মেয়ে: "কখনো দাসীবৃত্তি করতে হ'তে পারে কেই বা ভেবেছিল, ভাবতে পারে?"

বলল: "আমি ভদ্রঘরের মেয়ে মসিয়ে! যুদ্ধের আগে আমাদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। যুদ্ধে ঘর গেল, কারখানা গেল—কত কী আর গেল রোজগার করত যারা—" চোখ তার জলে ভ'রে আসত—"রইলাম শুধু আমিই একা। ভগবানের নিষ্ঠুরতা কোথায় সবচেয়ে বেশি জানেন কি? যাদের নেওয়া উচিত নয় তাদের নেন সেখানে তত নয় যত সেইখানে যেখানে যাদের নেওয়া উচিত তাদের রেখে যান চিরজীবী ক'রে! যাওয়া উচিত ছিল অকেজো এই মেয়েটার—কিন্তু যাবার বেলায় গেল তার কর্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ বাপ ভাই বুদ্ধিমতী বোন্।

"আমার মতন আরো অনেক মেয়ে এম্‌নিই মুখ বুজে কাজ ক'রে যায় আজ। তবে আমাদের একমাত্র সুখ এই যে সারাদিন ভাববার সময় পাই নে। ভাবলে কি বাঁচা যায় মসিয়ে:—তার চেয়ে ভালো খেটে খেটে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলা—ঘুম আসে ভাবনাকে ছাপিয়ে—জীবনের সব চেয়ে বড় শান্তি তো ভুলে থাকা!"

সবচেয়ে মনে পড়ে তার কৃতজ্ঞতা যে তার এ দুঃখের কাহিনী কেউ শুনছে মন দিয়ে। মেয়েটি গরবিণী—একটি পয়সাও বখশিশ (tip) নেবে না কারুর কাছে, অথচ খাটবে অক্লান্ত। আমি যে তার

কাহিনী শুনতাম, এই যেন ছিল তার পরম পুরস্কার। ওদেশে এমন যত্নও কোনো পরিচারিকার কাছে পাই নি। অথচ ওকে আমি কী-ই বা দিয়েছিলাম—শুধু ওর দুঃখে আমি দুঃখিত এই মৌন আশ্বাস দেওয়া ছাড়া? অথচ তাতেই যে ওর মন ভ'রে উঠত, আনন্দ উপছে পড়ত, এ-সত্যকে তো আর কিছু না ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দুহামেলের খানিক আগের কথাটি ফের মনে পড়ে:

কালো কাঁটায় ফোটায় কুসুম কে?
পরকে যে আনন্দ দিয়ে চলে:
এই কথাটি জানল না কো যে
চিনল না হায় জীবন কারে বলে!

জীবনে আমরা কত সময়ে তো কতই লোকের সংস্পর্শে আসি। সব সময়ে কিছু তখনি তখনি বোঝা যায় না কোন্ ক্ষণিকের অতিথি আমাদের প্রাণবাগানের কয়টি ফুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু তবু এ-কথা সত্য যে তাদের প্রভাব লুপ্তির আড়াল থেকে আরো দীপ্তি বিলায়। দুহামেলের উপরে যেমন পড়েছিল ভারতীয় সঙ্গীতের এম্‌নিতর প্রভাব * আমার উপর তেম্‌নি পড়েছিল তাঁর নানা সূক্ষ্মাতি-

---

* ১৯৩৪ সালে ১৫ই মে তারিখের Conferencia পত্রিকায় তিনি "Pourquoi J'aime la musique de chambre" নিবন্ধে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "দিলীপকুমার খ্যাতনামা রাগ ও গান গাইলেন। ওঁদের সঙ্গীত মোটেই স্বরলিপি করা থাকে না…যুগ যুগ ধ'রে সে চলে তার ঐতিহ্যের জের টেনে।" সবটা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের অপূর্ব সঙ্গীত তাঁর মনে কতটা ছাপ ফেলেছিল—বিশেষত আমাদের সুরবিহারের দরুণ—তা বোঝা যায় তাঁর এই কয়টি কথা থেকে যে "ces musiques vont dans l'expression des sentiments, des passions et des idees, aussi loin et aussi propond qu'il

সূক্ষ্ম দরদ ও অনুভবের প্রভাব। সে সময়ে এতটা বুঝি নি। কিন্তু দিনের পর দিন যতই একটানা ব'য়ে গেছে নানা আশা-নিরাশা আনন্দ বেদনার আলোছায়ার মধ্য দিয়ে ততই সে সবার অন্তঃশীলা সুরপ্রবাহে চলন্ত মেঘে ছবি ফুটে ওঠার মতন এই প্রত্যয়-প্রতিমার রূপটি ঝল্‌কে উঠেছে যে খৃষ্ট মিথ্যা বলেন নি: "Man does not live by bread alone." আজকের দিনে একথাটি আমরা বড় সহজে ভুলে যাই সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসাদ্বেষ, অভাব-অভিযোগের দুরন্ত ঝড় তুফানে। অন্ন চাই—বস্ত্র চাই—সত্য কথা—এর চেয়ে সত্য কথা জীবনে কমই মেলে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এ ধরণের সত্য আমাদের অনুভব বিকাশের একটা সুষমার দিক যে দাবিয়ে রেখে দেয়—যা বিনা জীবন হয়ে ওঠে শুধুই জীবন ধারণ। হয়ত দারিদ্র্যের বিড়ম্বনায়, নিয়তির চাপে অনেকেরই জীবনে ফোটে না সে দিকটা—মানি। কিন্তু তবু বলা চলে না যে দারিদ্র্যের দুঃখই সব চেয়ে বড় দুঃখ। যেমন ধরা যাক স্বাস্থ্য আর অস্বাস্থ্য— এ physical culture এর ও sports এর দুঃসহ জয়ধ্বনির যুগে মানুষ বড় সহজে ভুলে যায় যে খেলাধুলা ও মাংসপেশীর পরিপুষ্টি কাম্য হলেও লক্ষ্য নয়। দেহ দুঃখ দিলে হয়ত অনেক সময়ে গভীরতর আনন্দ মেলে না (যদিও চেতনার বিকাশে এও অনেক সময়েই দেখা গেছে যে, ব্যাধিক্লিষ্ট মানুষ যন্ত্রণার জয়ধ্বনিকেই সোপান ক'রে উঠেছে আনন্দ শান্তি প্রতীতির শিখরলোকে) দেহের যন্ত্রপাতি বিকল হ'লে

---

est humainement possible d'aller"—অর্থাৎ "এ সঙ্গীত তার আবেগ-উচ্ছাস ও ভাবরূপের প্রকাশলীলায় মানুষ যতটা উচুতে উঠতে পারে উঠেছে।" য়ুরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ অনেকে যে-ধরণের আমীরি চালে আমাদের সঙ্গীতকে দিলাশা দেন, বলা বাহুল্য দুহামেলের সাধুবাদ সে-জাতীয় বখশিশ নয়।

হয়ত চেতনার অনেকখানি শান্তির ঐদিকেই বাজেখরচ হয়। কিন্তু তবু বলব, দেহসুখ আনন্দলোকের নীচের স্তরেরই একটা বাণী—উপরের আলো হাওয়া গন্ধছন্দের খবর রাখে না। তেমনি সামাজিক সুব্যবস্থা সভ্যতার একটি প্রয়োজনীয় ভিত—বনেদ একথা গ্রাহ্য, কিন্তু তাই ব'লে একথা মান্‌ব না যে ওর দৌড় খুব বেশি দূর পর্যন্ত। যে-শৃঙ্খলা যে-বণ্টন যে-দর্শন যে-হর্ষণ "ততঃ-কিম্‌"-এর নাগাল পায় না, খবর রাখে না, দিশা চায় না—তাকে গরজের তাগিদে খাতির করতে পারি, কিন্তু উপলক্ষ্য হিসেবে, লক্ষ্য হিসেবে না। এ-ও বলার প্রয়োজন হ'ত না যদি না মানুষের স্থূলবুদ্ধির দরদস্তুরে বড় আনন্দ, বড় লক্ষ্য, বড় স্বপ্নকে হাটের যাচনদার আসত যাচাই করতে। কেন না সব বলা হ'য়ে গেলেও যেটা না বলা থেকে যায় সেটা হচ্ছে এই যে স্থূলবুদ্ধির কাঙালপনায় প'ড়ে মানুষ যখন ছোট সুখের চৌহদ্দিকেই দেখে একান্ত ক'রে তখন বড় সুখের চাহিদা জাগে না, আর এই ট্রাজিডিই জীবনে ঘটে বেশি। দুহামেলের চরিত্র নিয়ে যখন ভাবি তখন একথা যেন আরো বেশি ক'রেই মনকে নাড়া দেয়। সূক্ষ্ম অনুভবের এমন অনেক ঢেউই তাঁর আলোচনে বইত, আমাদের নানা সূক্ষ্মবেদনার এমন অনেক আলোছায়াই তাঁর ভাবে ভঙ্গিতে বিছিয়ে যেত, সর্বোপরি আমাদের অন্তর্জীবনের যে সব সুকুমার আশা আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস আবেগের সুর বহুব্যাপক নিশ্চেতনার জগদ্দল চাপে ঢাকা প'ড়ে যায় তারা তাঁর ব্যক্তিরূপের দরদে এমন উজ্জ্বল হ'য়েই ফুটত, যে ক্রমাগতই মনে হ'ত মানুষের মনুষ্যত্ব যদি সত্যি জেগে ওঠে তবে সে এই ভাবেই বিকাশ চাইবে—স্থূল থেকে সূক্ষ্মের অভিসারে।

ও দেশের ছিটে ফোঁটা

নক্সা

স্থান—বার্লিনে একটি সালঁ ওরফে প্রশস্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানা। লম্বা কক্ষটির শেষে একটি ছোট ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চ বাঁধা, সামনে নীল মখমলের যবনিকা। গৃহকর্ত্রীর (ইনিই Dame de salon) জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে কিছু পেশাদারি নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত আছে। তৎপূর্বে অতিথিদের গল্পালাপ ও জলযোগের ব্যবস্থা।

কাল—অপরাহ্ন, তবে সন্ধ্যা বলাই ভালো—শীতের গোধূলি, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয় ওদেশে।

কথাবার্তা আধা ইংরাজি আধা জর্মনি—যখন যেটা সুবিধা—আরও এই জন্যে যে, বিধবা গৃহকর্ত্রীর স্বামী যদিও জর্মন ছিলেন তিনি নিজে আধা ইংরাজ আধা আইরিশ। তাঁহার কুমারী নাম ছিল মিস ম্যাকার্থি এখনকার নাম ফ্রাউ ক্লুটকে। বয়স প্রায় ষাট—পার্টি দেওয়া তাঁহার জীবনব্রত। ধনী বিধবা, কাজেই ঘরের খেয়ে বন্য মহিষ তাড়ানো পোষায়।

সবাইয়ের চা খাওয়া সারা হয়েছে এখানে ওখানে কাউচে, ডাইভানে, চেয়ারে উপবিষ্ট অতিথিরা মৃদু গল্পালাপে মত্ত এমন সময়ে হের হুফেনবাখ্‌সের প্রবেশ (জর্মন ভাষায় হের্‌ Herr মানে মিষ্টার ফ্রাউ Frau মানে মিসেস, ফ্রয়লাইন Fraulein মানে মিস্‌)

নবাগত জাতিতে জর্মন, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। শীর্ষে কেশাভাব যা অল্প ছিল অতি ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা যেমন জর্মনদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়; ভারতবর্ষের মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজকের কথা মনে পড়ে।

গৃহকর্ত্রী ফ্রাউ ক্লুটকে : আসুন আসুন হের্ হুফেন্‌বাখ্‌স্। সকলে উঠে দাঁড়ালেন দস্তুর মাফিক—গৃহকর্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ সেরে স্বহস্তে কাছের ট্রের কেক স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতি ধরলেন অতিথির সামনে।

হের্ হুফেনবাখ্‌স্ : Danke sehr gnadige* Frau—(চায়ে চুমুক) চমৎকার।—না—দাংকে—শুধু চা-ই-ভালো—কী? না স্যাণ্ডউইচ, না Danke schön (সুন্দর ধন্যবাদ)

গৃহকর্ত্রী : Bitte schön (কিছুই না)—কিন্তু সে কি হের্ হুফেন্‌-বাখ্‌স্? স্যাণ্ডউইচও না? মানে? এ গুরুপাক নয়—শসার।

হুফেন্‌বাখ্‌স্ : শরীর-ভালো নেই গ্নেদিগে ফ্রাউ, দাংকে।

গৃহকর্ত্রী (কোমলকণ্ঠে) : শরীরের অপরাধই বা কি বলুন? যে সময় যাচ্ছে—কে যে কবে কোন্ অতলে যাবেন তলিয়ে, ডুব মারবেন রসাতলমুখী মার্কের নিচু টানে (ফরেষ্টারকে) আজ কত? এক পাউণ্ডে চার হাজার মার্ক! উঃ—লাল বাতি জ্বলবার আর বাকি কী বলুন হের্ হুফেন্‌-বাখ্‌স্!

হুফেনবাখ্‌স্ : সে কথা আর একবার ক'রে বলতে ফ্রাউ ক্লুটকে! ঘোড়ার খড়েরও দর যেন আগুন। তার ওপর আবার ফ্রান্সকে দিতে হবে কম্পেন্‌সেশন। Donnerwetter যুদ্ধ করলেন সবাই—খেশারতি দেবে একা জর্মনি। Gott in Himmel (আকাশে ঈশ্বর) কি নেই ভেবেছে এরা?

গৃহকর্ত্রী (বিপন্ন) : ফ্রান্সের এ অন্যায় বটে—

হুফেন্‌বাখ্‌স্ : শুধু ফ্রান্সের? ঐ পাজির পাঝাড়া ইংরেজটা না

---

* ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! সদাশয়!

থাকলে (হঠাৎ) ক্ষমা করবেন গ্নেদিগে ফাউ—আমি বলছিলাম কি ফরাসিদের সঙ্গে এরকম ষড় করা কিন্তু উচিত হয় নি ইংরেজদের। ওদের সঙ্গে আপনাদের কোন্‌খানে মিল বলুন তো! সবাই জানে টিউটন ও আংলোসাক্সন হ'ল সত্যি সগোত্র—ফরাসীজাতি হ'ল—

গৃহকর্ত্রী (মসিয়ে পিয়েরের দিকে চাহিয়া) : যেতে দিন হের্ হুফেন্‌বাখ্‌স্। আসুন এই চুল্লীর কাছে—যে শীত—তাও ভালো কয়লা মেলে না—আপনিও আসুন এদিকে হের্ চট্টোপাধ্যায়—আপনি আবার গরম দেশের লোক, আগুনের কাছ ঘেষে বসুন। না না অসুবিধা হবে কেন? আসুন এসে বসুন—।

হুফেন বাখ্‌স্ : (স্থান করিয়া) ও আপনি বুঝি ইন্দার্ থেকে আসছেন?

গৃহকর্ত্রী : হ্যাঁ। সেখানে এখনো জিনিষপত্র কী যে সস্তা, জানেন হের্ হুফেনবাখ্‌স্? না হের্ চট্টোপাধ্যায়?

চট্টোপাধ্যায় (শ্যামবর্ণ যুবক—সুশ্রী সপ্রতিভ) : তা হবে ফ্রাউ ক্লুটকে! আমি আমাদের দেশের বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখি না। তবে শুনেছি টাকা দিলে সেখানেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়।

গৃহকর্ত্রী (সাশ্চর্যে) : অ্যাঁ! বলেন কি? wunderbar (আশ্চর্য্য)!

হুফেনবাখ্‌স : আহা, এখন যদি আমরা আপনাদের সোনার দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারতাম মাইন হের্! সেই তাজমহল, রয়াল বেঙ্গল টাইগার আর গ্যান্‌ঢির দেশ!—যেখানে Alles, Alles—(স-ব, স-ব) পাওয়া যায়—মায় সূর্যদেব পর্যন্ত—যেখানে কয়লার কেরামতির পথ মেরে দিয়েছেন ঐ সদয় অগ্নিদেব। আহ্!

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) : আমাদের চারণ কবিও গেয়েছেন বটে : "এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে না কো তুমি"—কিন্তু সাহেব কবি

যে আবার ঘাড় নাড়েন : "উঁহুঃ—এ শুধু distance lendsenchant-ment to the view."

হুফেনবাখ্‌স্ : কী হিসেবে, বলবেন একটু খুলে ?

চট্টোপাধ্যায় : ঐ সূর্যদেবের কথাই ধরুন না কেন। আপনারা মেঘের দেশে থেকে তাঁকে চোখে দেখেন নি—কাজেই বাঁশি শুনেই গদ্‌গদকণ্ঠে ডাক ছাড়েন : Die Sonne ueber Alles (সূর্য সবার সেরা)—গান বাঁধেন :

কে তুমি মধুর মনচোরা
স্নিগ্ধ অমল আলোঝোরা !

কিন্তু অলডাস হাক্‌সলি বলেছেন বেশ—শেলি জানতেন না যে তাঁর স্কাইলার্ক শুধু গানই গেয়ে চলেন না নোংরা কাজগুলোও করেন। আমাদের দেশের সূর্য দেশটাকে যেভাবে হাপর ক'রে দাঁড় করান যদি জানতেন মাইন হের্ !

গৃহকর্ত্রী : ভাল কথা হের হুফেনবাখ্‌স্, আপনার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি, ক্ষমা। তাঁকে নিয়ে এলেন না ? এ ভারি অন্যায় কিন্তু। সুন্দরী স্ত্রীকে কি এম্‌নি করেই একচেটে তৈজস করে রাখতে হয় ! আমরা না হয় তাঁকে একটিবার দেখেও চক্ষু সার্থক করতাম !

হুফেনবাখ্‌স্ : না না গ্নেদিগে ফ্রাউ। আমার স্ত্রীকে আমি একচেটে ভাবে ভোগ করি, এ অপবাদ আমাকে শত্রুতেও দিতে পারে না। তাঁর সঙ্গে বাড়িতে আমার কালে-ভাদ্রে দেখা হয়। সর্বদাই তাঁর সর্বত্র নিমন্ত্রণ—সকলেই খালি তাঁকে চায়। তাঁর—হাসছেন যে মাইন হের্ ! (স্রাভিন্‌স্কির দিকে দৃষ্টিপাত)

স্ত্রাভিন্স্কি : (রুষ যুবক, দেখিতে খুবই সাধারণ, সর্বদাই সহাস্ত-বদন) এটা হচ্ছে সব স্বামীরই অনুযোগ, বিশেষতঃ যদি স্ত্রী সুন্দরী হয় !

হুফেনবাখ্‌স্ : ফরিয়াদি স্বামী ব'লেই চার্জটা মিথ্যা মনে কর্ব্বেন না হের স্ত্রা—ভীর—

স্ত্রাভিন্স্কি : ভিন্স্কি।

হুফেনবাখ্‌স্ : হাঁ হাঁ ভুলে যাই, নামের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি-শক্তিটা মোটেই অসাধারণ নয়, ক্ষমা। কিন্তু যা বল্‌ছিলাম—হের স্ত্রাভিন্স্কি। রমণী যদি রত্ন হয় তাহ'লে তিনি আবেগের চেয়ে বেগই দেন বেশি। বিশেষতঃ আমাদের এই পোড়া জর্মন দেশে। শুধু বেগই নয় মনস্তাপও বটে। সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীকে কেমন যেন লোকে বেমালুম ভুলে যায় মাইন্ হের্ ! সকলে যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করে, তখন অনেক সময়ে আমাদের দুজনকেই করে বটে, কিন্তু সেটা প্রায়ই শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে, ঠাট বজায় রাখতে, মুখ্য উদ্দেশ্য— 'তিনি'। 'ইনি' যেন হসন্তের মতনই পড়ে থাকেন অবজ্ঞার অতল তলে। সকলে ব্যবহার করেন যেন ইনিই কর্তা। অর্থাৎ থিওরিতে—কারণ কাজে ঠিক্ উল্‌টো, সর্বত্রই তিনি। অথচ এ কথা মুখে প্রকাশ ক'রে বলারও পথ রইল না। কারণ কোন্ ইনি লজ্জার মাথা খেয়ে বলবেন বলুন যে সকলে চান তাঁর তিনি-কে—বিদুষীকে—বিদূষককে কেউ না।

গৃহকর্ত্রী (হাসিয়া) : একেবারে অতটা ?—কেউ না ?

রুফেনবাখ্‌স্ : ক্ষমা, গ্রেদিগে ফ্রাউ—আপনার কথা অবশ্য আলাদা। আপনার মন-মুখ যে এক, এ কথা বোধ হয় আপনার শত্রুও অস্বীকার কর্বে না। তবে কি জানেন গ্রেদিগে ফ্রাউ, ইংরাজীতে

বলে—exception proves the rule : আপনার মধ্যে সব তাতেই একটা না একটা কিছু অসাধারণত্ব আছে।

ফ্রয়লাইন নাশা (স্পানিশ তরুণী, সুন্দরী—brunette, মুখে চোখে বেশ একটা সতেজ বুদ্ধির আভা আছে, খুব নব্যা) : আপনার সবিদ্রূপ কমপ্লিমেণ্ট দেওয়ার ধারণটার মধ্যে কিন্তু বিশেষ অসাধারণত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে না হের হুফেনবাখ্স্। বরং এটা একটু বেশি সাধারণ ও এমন কি স্বচ্ছ ব'লেই ভ্রম হয়। ক্ষমা, গ্নেদিগে ফ্রাউ—আমি আপনার সম্বন্ধে কোনও সমালোচনা করছি না।

হুফেনবাখ্স্ (ঈষৎ অপ্রসন্ন) : এ ধরণের কথা বলবার আপনার—থামিয়া—আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন ফ্রয়লাইন, যে আমি ঠিক আর পাঁচজনেরই মতন লৌকিক—কপট ? এ-ও তো হতে পারে যে আমি সত্যিই কেতাদুরস্ত চাটুবাণীতে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া য়ুরোপের মতন আমি বিশ্বাস করি না যে নারী অবলা। তাই, কথায় কথায় বাজে কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে তাদের দুরবস্থার ক্ষতিপূরণ করতে হবে এ আমি আদৌ মানি না। (গৃহকর্ত্রীকে) কারণ, বুঝলেন কি না গ্নেদিগে ফ্রাউ, আজকালকার দিনে স্ত্রী-পুরুষের অবস্থা স্রেফ্ উল্‌টে গেছে। স্ত্রীই আজকাল পুরুষের পিঠ-চাপ্‌ড়ে কথা বলে। তাই আমার মনে হয় যে, আজকাল বরং পুরুষকেই কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে আকাশে তুলে দেওয়া উচিত—যদি তাতে সে কিছু অন্তত সান্ত্বনা পায়। কি বলেন হের্ স্রাভিনস্কি ?

স্রাভিন্স্কি : হাঁ, আপনি যা বল্‌ছেন, সবই প্রায় অনবদ্য। তবে কি জানেন, আমরা অনেক দিন ধরে একচেটে প্রভুত্ব করে এসেছি,—আজ চাকা একটু ঘুরে গেছে, এই আর কি ? আর কিছুই নয়। কি বলেন হের্ চট্টোপাধ্যায় ?

চট্টোপাধ্যায়: আপনাদের দেশে চাকাটা যে অবশেষে একটু ঘুরেছে, এটাকে খুব মন্দ বলে মনে করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য; যেহেতু এতে দায়ে ঠেক্‌তে ত—আমরাই। নয় কি? তবে হয়েছে কি, আমাদের চাকা এখনো পর্যন্ত ঘোরে নি। কাজেকাজেই অন্তত পক্ষে আপনাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করার সময়ে এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থা একটু ভাল ভেবে যৎকিঞ্চিৎ গর্ব বোধ করি। তবে—(সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া) আমাদের আত্মপ্রসাদ ভোগ করার যুগেরও বোধ হচ্ছে যেন নাভিশ্বাস উঠল ব'লে।

ফ্রাউ হ্বেলষ্টেনক্র্যাফট্ (৩০।৩২ বছরের জর্মন-মহিলা, ঈষৎ স্থূলকায়া, খুবই লৌকিকতা-দক্ষ, এতক্ষণ কথা কন নি, কারণ সুযোগ পান নি) আচ্ছা হের্ খট্টো—

চট্টোপাধ্যায়: ক্ষমা, গ্নেদিগে ফ্রাউ, আমার নাম খট্টো নয়—চট্টো—পাধ্যায়।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফট্ (একটু অপ্রতিভভাবে) হাঁ—হাঁ, হের্ চট্টোপাধ্যায়—ক্ষমা—আপনাদের প্রাচ্য নামগুলো উচ্চারণ করা এত শক্ত।

চট্টোপাধ্যায় (তৎক্ষণাৎ) বলেন কি! বেহদ্দ সোজা। অর্থাৎ আমাদের কাছে; বুঝলেন কিনা ফ্রাউ ভোল্ বিভোল্—

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফট্: হ্বোলষ্টেনক্র্যাফট্।

চট্টোপাধ্যায়: হাঁ হাঁ ঠিক্। ক্ষমা, ফ্রাউ বুলষ্টোনকারাফ্ আপনাদের নামগুলিতে ব্যঞ্জনবর্ণের গলাগলি এতই নিরেট যে নিরীহ বিদেশীর পক্ষে তা উচ্চারণ করাটা অনেক সময়ে প্রায় রুগ্নের পক্ষে জিমন্যাষ্টিক করার মতনই শক্ত হয়ে ওঠে।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট্‌ (অপ্রতিভ ভাবে) তা বটে তা বটে। কিন্তু আমাদের নামটা হচ্ছে—

গৃহকর্ত্রী (তাড়াতাড়ি) ওটা কি রকম জানেন ফ্রাউ হ্বোলষ্টেন- ক্র্যাফ্‌ট্‌? সকলেই নিজেদের দেশের ছাড়া অন্য সব দেশের নাম উচ্চারণ করতে বেগ পেয়ে থাকেন—এ তো হ'য়েই থাকে।

চট্টোপাধ্যায়। (নিতান্ত ভালোমানুষি চালে) আজ্ঞে, ইংরাজিতে বলে না—the spirit is willing but alas the flesh—

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট্‌ (নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে) কিন্তু হের্‌ চট্টোপাধ্যায়, ইংরিজি নাম হচ্ছে সব চেয়ে দাঁতভাঙা—

(তিনি লক্ষ্য করেন নি যে, সে পার্টিতে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন।)

মিষ্টার ফরেষ্টার (ইংরাজ, বয়স ৪২।৪৩, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, কেউ সম্বোধন না করলে নিজে থেকে কথা কইতে পারেন না, এতক্ষণ চুপ ক'রে অন্য সকলের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ নামের মহিমা আক্রান্ত দেখে ভগ্নধৈর্য) আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি গ্নেডিগ ফ্রায়্‌ (মহীয়সী এ আকস্মিক সম্বোধনে একটু চমকালেন)—রুষ নামের কাছে কিন্তু আমাদের নাম আইস ক্রীম। একজন মহাপুরুষ বলেছেন 'রুষ নাম উচ্চারণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বার তিনেক হেঁচে একটা স্কি উচ্চারণ করা।' কি বলেন ফ্রয়লাইন নাশা?

গৃহকর্ত্রী (ব্যস্তভাবে ফরেষ্টারকে জনান্তিক): এখানে একজন রুষ ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন।

মিষ্টার ফরেষ্টার (আরো সম্ভ্রান্ত ঔদাসীন্যের সুরে) : কী যায় আসে? সত্য সব সময়েই সত্য এবং পুনরুক্তি করা চলে।

নাশা : খুবই প্রাজ্ঞের ম'ত কথা বৈকি—কেবল হয়েছে কি, এ জগতটা এমনই পাঁচমিশেলি যে সে সত্যকে শুধু ইংরেজি চষমার মধ্যে দিয়েই দেখে না। তাছাড়া কি জানেন হের ফরেষ্টার, আমার মনে হয় রুষ নাম তত অদ্ভুত নয়, যত অদ্ভুত—

স্লাভিন্‌স্কি : স্পানিশ নাম।

গৃহকর্ত্রী : (আরও বিব্রতভাবে স্লাভিন্‌স্কিকে জনান্তিকে) ফ্রয়লাইন নাশা নিজে স্পানিশ যে!

হের স্লাভিন্‌স্কি : সহস্র ক্ষমা ফ্রয়লাইন, আপনার রূপ দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি ইতালিয়ান।

নাশা (সহাস্তে) কিন্তু অনুতাপটা ঠিক কী জন্তে হের্ স্লাভিন্‌স্কি?—আমার রূপজ্যোতির জন্তে, না যে দেশে ফাশিস্ত রাজা আমাকে সে দেশিনী ভাবার জন্তে?

হের স্লাভিন্‌স্কি (আরও অপ্রস্তুত এবং রক্তিম) : না, তা—মানে ওসব নয়—তবে কি জানেন ফ্রয়লাইন, এরূপ বলাটা ঠিক্ আদব কায়দা মাফিক হয় নি।

চট্টোপাধ্যায় : মাফ করবেন হের্ স্লাভিন্‌স্কি, সমাজে পদেপদে এমন আদবকায়দার তাঁবেদারি করার নামই কি বাক্‌বৈদগ্ধ্য?

ফরেষ্টার : Excuse me Mr. Chat—Chat—Chatto—but perhaps you don't now—

মিঃ চট্টোপাধ্যায়: I plead guilty to not being omniscient Mr knowall—but as you know all there is to know—you should know I am not Chatto—but Chattopadhya.

মিঃ ফরেষ্টার : মাফ করবেন মিষ্টার চট্টোপাধ্যায়—আমি শুধু বলছিলাম আদবকায়দা না মান্‌লে কি চলে? মানুষ অসভ্য অবস্থায়

আদবকায়দায় অনভিজ্ঞ থাকে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে, refinementএর মানেই হচ্ছে আদবকায়দা।

নাশা: মাফ করবেন মিস্টার ফরেষ্টার। আমার ত মনে হয় সত্যকার refinement বস্তুটি আদবকায়দা বা *etiquette*এর চেয়ে একটু মহত্তর জিনিষ। প্রতি পদে অপরের অসুবিধা ভাবা বা একগুঁয়ে ভাবে নিজের মত ছাড়া অপর সকলের মতকেই ভ্রান্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা না-পাওয়া—এই সবই বোধ হয় প্রকৃত refinement.

মিষ্টার ফরেষ্টার (একটু অবজ্ঞার সঙ্গে) তবে কি আমাদের কর্ত্তব্য আদবকায়দাবিহীন অজ্ঞ boor (চাষা) হওয়া—যা আমাদের গুহাবাসী পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন?

ফ্রয়লাইন নাশা: আদবকায়দার কোনও দাম নেই এ কথা আমি বলিনি মিস্টার ফরেষ্টার। আমি বলতে চাই যে আসল refiinement না থাকলে, শুধু প্রাণহীন আদবকায়দাকে নিয়ে ঘর করাটা একটু বিড়ম্বনাই হয়ে দাঁড়ায়—যদিও য়ুরোপে সামাজিকতায় এ কথা লোকে প্রায়ই ভুলে ব'সে থাকে।

গৃহকর্ত্রী (উষ্মায় শঙ্কিত): আহা—এ আলোচনায় ফল কি নাশা? মিষ্টার ফরেষ্টার তার চেয়ে ফ্রয়লাইন নাশার কাছ থেকে স্পেন দেশের কাহিনী শোনা যাক্। আহা! অপূর্ব সুন্দর স্পেনে আমি কখনও যাইনি। আপনি গিয়েছেন কি?

মিষ্টার ফরেষ্টার: না—আমাদের ইংলণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নেই।

গৃহকর্ত্রী (কথার মোড় ফেরাতে): আচ্ছা নাশা, শুনেছি, তোমাদের দেশ ভারি চমৎকার, সেখানে জিনিষপত্রও না কি অসম্ভব রকম সস্তা।

নাশা (সবিদ্রূপ) আচ্ছা বলুন না গ্রেদিগে ফ্রাউ, পার্টি প্রভৃতিতে

কোনও serious বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াটা কি সামাজিক আদবকায়দার দিক দিয়ে একটা মস্ত অপরাধ ?

গৃহকর্ত্রী। (একটু অপ্রস্তুত) : না, তা ঠিক্ নয়—তবে—

নাশা : নয় কেন ?—আমি তো কেবলই দেখি যে কোনও serious প্রসঙ্গের অবতারণা করলেই আপনি আলোচনার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেন।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফট্ (গৃহকর্ত্রীর সাহায্যার্থে) : তার কারণ কি বুঝতে পারেন না ফ্রয়লাইন—

নাশা : আর একটা কথা, গ্নেদিগে ফ্রাউ, পার্টি প্রভৃতিতে বুঝি weather বা জিনিষপত্রের দাম নিয়ে আলোচনা করাই শ্রেষ্ঠ আদব-কায়দার পরাকাষ্ঠা ?

গৃহকর্ত্রী : (অপ্রতিভ) না—তা—না—তা—না—ফ্রয়লাইন। তবে তোমাদের দেশে বিদেশীরা বড় একটা বেড়াতে যায় না, তাই জিজ্ঞাসা—জানতে চাচ্ছিলাম স্পেনের matador এর কথা।

মিঃ ফরেষ্টার (জনান্তিকে হের হুফেনবাখ্স্কে) : মেয়েটা ত ভারি মুখফোঁড় ! আর কথাও কি তেম্‌নি চাষাড়ে !

হের হুফেনবাখ্স্ (করুণভাবে মাথা নাড়িয়া) : আমি ত গোড়াতেই বলেছি মাইন্ হের্ যে, সে দিন গত। সে দিন আর নেই যে আমরা স্ত্রীদের উপর লেক্‌চার ঝাড়ব। আপনাদের ভাষায় বলে না টেবিল ঘুরে গেছে ?—এ হচ্ছে ঠিক তাই, বুঝলেন কি না মাইন্ হের্ ? নারীর সে কোমলতার, কম্রতার ও শীলতার দিন আজ শুধু পৌরাণিক কাহিনীর মাইন্ হের্।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফট্ (জনান্তিকে হের স্ত্রাভিন্স্কিকে) : সমাজে দিন দিন হ'ল কি ! ভদ্রতা কি এযুগে সবাই ভুলে গেল ? নৈলে একটা

সেদিনকার দুগ্ধপোষ্যা কি না এই ভাবে জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা কয়! আমাদের সময়ে কিন্তু—

স্লাভিন্স্কি : হাঁ ঠিক তা-না—তবে কি জানেন গ্রেদিগে ফ্রাউ, সময় পরিবর্তনশীল, এও বুঝলেন না? আচ্ছা মসিয় পিয়ের্, আপনাদের সমাজে এ সম্বন্ধে লোকের মত কি?

মসিয় পিয়ের (ফরাসী, ৪০।৪৫ বৎসর বয়স, খুব স্বদেশভক্ত; জনান্তিকে) : আমাদের দেশে? এ রকম অসামাজিক বোলচাল! বলেন কি মসিয়!! আমি ত আমাদের পারিতে (Parisএ) এরূপ ঘোরতর অভদ্রতা কোনও পুরুষের কাছেও কল্পনা করতে পারি না—মেয়েদের কথা ত ছেড়েই দিন। (আরোও মৃদু স্বরে) আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্যগণ্য লোকের ওখানে বড় বড় পার্টিতে সবই ধরাবাঁধা, নেস্ পা? * আমাদের সমাজে পার্টি প্রভৃতিতে পোষাক-পরিচ্ছদ, আস্‌বাব-পত্র, গাড়ি-ঘোড়া, ঘোড়দৌড়, নাচগান প্রভৃতি গোটাকতক বিষয় ছাড়া কোনও বিষয়ে কারুর কথা কইবারই জো নেই, নেস্ পা!

স্লাভিন্স্কি (একটু সন্দিগ্ধভাবে জনান্তিকে) : বলেন কি! কিন্তু—এতটা বাঁধাবাঁধি—

পিয়ের (জনান্তিকে) : নইলে যে চলে না মসিয়, নেস্ পা? এ রকম একটা ধরাবাঁধা নিয়ম থাকলে কি আর আজ আমাদের এই এঁচড়ে পাকা মেয়েটির বক্তৃতা শুনতে হয়? আমাদের সুসভ্য পারি সমাজে কোনও মেয়ে কোনও সামান্য দস্তুর ভঙ্গ কর্লেও ভদ্র সমাজে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড কারখানা, নেস্ পা! (একটু পরে) আচ্ছা মাদ্‌মোয়াজেল নাশা (মাদ্‌মোয়াজেলকে এই সময়ে গৃহকর্ত্রী একখানি এল্‌বাম

---

* n'est ce pas = নয় কি?

দেখাচ্ছিলেন) ক্ষমা করবেন মাদ্‌মোয়াজেল আপনি ছবি দেখছিলেন আমি লক্ষ্য করি নি।

নাশা : (গৃহকর্ত্রীর এলবাম থেকে উৎসুকভাবে মুখ তুলে) মসিয় পিয়ের, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন ?

পিয়ের : (ততোধিক বিনয় সহকারে) সহস্র ক্ষমা। আপনি ছবি দেখছিলেন, এটা লক্ষ্য না ক'রেই আপনাকে ডেকে ফেলেছিলাম।

নাশা। (সস্মিতমুখে) আপনি বুঝি ফরাসি ? তাই শুনি আদব-কায়দা বিষয়ে কখনও পান থেকে চুণ খসলেই আপনাদের ধনুষ্টঙ্কার হয়। কিন্তু আমার কাছে অত ঘটা করে ক্ষমা চাওয়ার সত্যিই দরকার নেই। কারণ, আপনি বোধ হয় এঁচে নিয়েছেন খানিকটা যে, আমি এ সব সামাজিক নিয়মকানুনকে অলঙ্ঘনীয় মনে করি না।

পিয়ের : (সাড়ম্বর বিনয়ে) এ বিষয়ে আপনি অভ্রান্ত।—দৈনিক। ব্যবহারে প্রতিপদে অত ঘটা করে চলতে হলে ত জীবন দুর্ব্বহ। নেস্ পা, মসিয় শত্তোপাধায় ?

চট্টোপাধ্যায় : D'accard (একমত)—কিন্তু আমি যেন একটু আগেই আপনাকে হের্ স্তাভিনস্কির কাছে একটু অন্যরূপ মত প্রকাশ করতে শুনছিলাম—এমনিই কানে গেল কি না! তবে আপনাদের সুসভ্য ফরাসীদেশে বুঝি ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করাটাই সভ্যতার চূড়ান্ত ব'লে মানা হয় ?

একটা চাপা হাসির ধ্বনি শোনা গেল। কেউ কেউ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তীব্র কটাক্ষপাতও করলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে, অপরকে অপ্রতিভ দেখলে খুসি হওয়াটা স্বাভাবিক হ'লেও, কর্ত্তব্যের খাতিরে একটা ক্রোধের ভান দেখানটাও তাঁদের কর্ত্তব্য ;

যেহেতু কোনও পার্টিতে একজনের পক্ষে অপরকে অপ্রতিভ করাটা য়ুরোপীয় আদব কায়দা অনুসারে গর্হিত।

পিয়ের : কখন্, কখন্, মসিয়ে? নিশ্চয় আপনি ভুল শুনেছেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করব কি না আমি? আমাকে আপনি জানেন না তাই—

নাশা : জানি ব'লেই বলছি আপনার জানা উচিত যে মহাকবি বলেছেন too much protest-এ উল্‌টো উৎপত্তি হয়, এমন কি lady দেরও ক্ষেত্রে—gent দের তো কথাই নেই।

পিয়ের্ (অপ্রতিভ) : ঠিক কী বলতে চাইছেন মাদ্‌মোয়াজেল্?

নাশা : এমন কিছু না—শুধু এই যে আপনাদের সমাজে যদি মতামত হয় আকাশের মতিচ্ছন্ন মেঘদের ম'ত তবে সেই খামখেয়ালি তো হবে জগতের আদবকায়দার আদর্শ—কারণ কে না জানে জগতের শ্রেষ্ঠ বাক্য-বাগীশ হচ্ছেন ফরাসীরাই—যদিও শ্বেতজাতির গুরু দায়িত্ব (white mans burden) এ যুগে নিয়েছেন মিস্টার ফরেস্টাররা কাঁধ বাড়িয়ে।

গৃহকর্ত্রী (ব্যস্ত সমস্ত) : আহা-হা থাক্ থাক্ না ওসব ফালতো কথা—আমি বলি কি হের্ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁদের wunder-choen (আশ্চর্য সুন্দর) দেশের খবর নেওয়া যাক্—সেই Marchen-land (পরীরাজ্য) ভারতবর্ষের কথা।

নাশা : ঠিক্ বলেছেন গ্রেদিগে ফ্রাউ। আপনার এলবামে আমেরিকার অভ্রভেদী নরনিবাস দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এর চেয়ে গুহায় আমরা ছিলাম ভালো। হের চট্টোপাধ্যায়, আপনি জানেন না আমাদের মধ্যে কত লোক ভারতবর্ষকে মনে করে রূপের বাগান—সোণার স্বপন—আকাশ-প্রদীপ। কি বলেন মসিয় পিয়ের?

পিয়ের (রুখিয়া উঠিয়া) : তা বটে কিন্তু তবু একথা মেনে নেওয়া চলে না যে আমেরিকার অভ্রভেদী বাড়িগুলি অসভ্য। ওদের দোষ *এই যে বাইরে থেকে দেখতে কুশ্রী—কিন্তু স্কাইক্র্যাপার ফ্ল্যাটগুলির* ভিতর আরামে ঠাশা, নয় কি হের হুফেনবাখস্!

হুফেনবাখস্ : বটেই তো—কেবল মার্কিন মেয়েরা যা একটু—

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্ট্ (গদ্গদভাবে) : আহা হা! আমেরিকায় যাওয়া আমার কাছে একটা স্বপ্ন, তা ফ্রয়লাইন নাশা যা-ই বলুন না কেন।

নাশা (ঈষৎ বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে) : স্বপ্ন দেখার কি আর বিষয় পেলেন না ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্ট্!

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্ট্ (ঈষৎ রাগতঃ) : কেন, স্বপ্ন-ও দেখতে হবে কি আপনার ফরমাশে নাকি?

গৃহকর্ত্রী (বাধা দিয়া) : আচ্ছা হের্ চট্টোপাধ্যায়, আপনাদের দেশের মেয়েদের গল্প বলুন না শুনি। তাঁরা কি আমাদের দেশের মেয়েদের মতন? আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের চেয়ে তাঁদের মন অনেক বেশি রোমাণ্টিক।

চট্টোপাধ্যায় : আপনার ধারণাটি শুনলে প্রীত হওয়া অবশ্য আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক;—তবু আমাকে ফের বলতে হচ্ছে ফ্রাউ ক্লুটকে যে, এখানেও distance lends enchantment to the view—যদিও আমি বলছি না যে, আমাদের দেশে সুন্দরী নাস্তি!

হুফেনবাখস্ : সুন্দর নিয়ে কি ধুয়ে খাব হের্ চট্টোপাধ্যায়? তাঁরা আমাদের মেয়েদের চেয়ে ভালো কি না সেই কথা বলুন?

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) : ভালো—কি বিষয়ে?

হের হুফেনবাখ্‌স্ (হাসিয়া) : এই ধরুন—বলেই ফেলি—অর্থাৎ ঘরকন্না—বা পাতিব্রত্য ?

চট্টোপাধ্যায় : দেখুন হের হুফেনবাখ্‌স্, আপনার কৌতূহলের জিজ্ঞাস্যটা যত সহজ উত্তরটা ঠিক্ সে-জাতের নয়। প্রথমত এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে হলে, সেটা এত লম্বা হয়ে পড়বে—

নাশা (সাগ্রহে) : পড়ুকগে—আপনি বলুন। না, রসুন—সব আগে খুলে বলুন,—তাঁরা কি অত্যন্ত সুন্দরী ? খু—ব ?

চট্টোপাধ্যায় : আমাকে দেখে যদি বিচার করেন, তবে আপনাদের এ সম্বন্ধে ধারণা নিশ্চয়ই তাঁদের অনুকূল হবে না।

মসিয় পিয়ের (সবিস্ময়ে) : কেন মসিয় ! আপনাদের দেশের রুচিতে কি আপনি দেখতে খারাপ ? আপনি ত একজন পরমসুন্দর পুরুষ। আমাদের চোখের রায়ে।

চট্টোপাধ্যায় (সহাস্যে) : এটা কি সত্যি চোখের রায়—না জিভের সায় ?

পিয়ের (রক্তিম) : কেন, কেন মসিয় ? আপনি কি বলতে চান আপনি দেখতে কুৎসিত ?

চট্টোপাধ্যায় : দেখতে কুৎসিত ও দেখতে পরমসুন্দরের মধ্যে কি দু চারটি স্তর থাকতে পারে না মসিয় ?

নাশা : আচ্ছা হের চট্টোপাধ্যায়, শুনেছি আপনারা সব dreamer ও idealist-এর দল। কিন্তু আপনার কথাবার্তায় দুষ্টুমির গুণে তো ঘাট দেখছি নে। না, আপনাদের দেশে হামেশা ভদ্রলোককে এভাবে অপ্রস্তুত করাই শীলতার পরাকাষ্ঠা ?

চট্টোপাধ্যায় : মাফ করবেন ফ্রয়লাইন—যেহেতু এ বিষয়ে আপনি

নিশ্চয়ই আমার গুরু—যদিও কবিবাক্য জানি—"O woman, thou knowest not thy power!"

(ফ্রয়লাইন নাশা রক্তিমগণ্ড—গৃহকর্ত্রী ছাড়া সকলেই তাতে বিশেষ হৃষ্ট)

হুফেনবাখ্‌স্ : (উজ্জ্বলকণ্ঠে) মাইন্‌ হের্‌! মানছি আপনারা এ যুগেও পারেন সবলাদের অবলা ক'রে রাখতে। আহা, আমাদের যদি ও-বিদ্যাটা জানা থাকৃত! (দীর্ঘশ্বাস)

ফরেস্টার (প্রীতকণ্ঠে) : Bravo—I say. জানেন হের হুফেন-বাখ্‌স্, আপনার দীর্ঘনিশ্বাসে আমার এক বন্ধুর গল্প মনে পড়ল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট। আসামির নামে চার্জ সে স্ত্রীকে bully করে। জরিমানা তো হ'ল যথাযথ। পরে বন্ধু তাকে কোর্টের বাইরে ডাকলেন হাত-ছানি দিয়ে। সে বেচারি কুণ্ঠিতভাবে কাছে আসতেই বন্ধু বললেন : "Nothing to be shy about my friend. Only I wondered when I heard that you bullied your wife—between you and me, what is the secret?

(সকলের হাস্য)

নাশা (ঈষৎ দীপ্ত কণ্ঠে) : সীক্রেটটা যে কী সেটা আমার জর্মন ভগ্নীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরো ভালো জবাব পেতেন মিস্টার ফরেস্টার।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট্‌ (বিরক্তভাবে) : আর যদি আমাদের স্প্যানিশ ভগ্নীদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করি ফ্রয়লাইন?

ফ্রয়লাইন নাশা : (প্রশান্তভাবে) তাহ'লে এই উত্তর পাবেন যে স্ত্রীজাতির কারবার হওয়া উচিত যে শুধু তিন K নিয়ে—এ তাঁরা আজো জানেন না।

চট্টোপাধ্যায় : (সৌৎসুক্যে) কি রকম ?

গৃহকর্ত্রী (ব্যস্তসমস্তভাবে) : যেতে দিন না। আচ্ছা মসিয়ে আপনাদের দেশে কি—

স্রাভিন্‌স্কি : না, না, তিন "K"র ব্যাপারটা না শুনলে চলে ? *

গৃহকর্ত্রী (বাধা দিয়ে) : না—না, ও এমন শোনবার মতন কিছু নয়। ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট্‌, আপনি এ গ্রীষ্মে কোথায় যাচ্ছেন ?

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট (রুষ্টকণ্ঠে) : যাব আর কোন চুলোয় বলুন ? যে খরচ, এক-পা কি নড়বার যো আছে গ্নেদিগে ফ্রাউ ! জিনিষপত্রের দাম ত নয়—যেন সমুদ্রে তুফান—হু হু ক'রে—

নাশা (চট্টোপাধ্যায়কে) : আপনি কিন্তু বেশ লোক। কথাটা চাপা দিলেন। বললেন কই আপনাদের দেশের মেয়েদের অবস্থা ?

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) : বাঃ—বললাম না—এ রকম প্রশ্ন করা যত সহজ, উত্তর দেওয়া তত সহজ নয় ?

নাশা : ওসব ছেঁদো কথা রাখুন—বলতেই হবে তাঁরা দেখতে কেমন ; আপনি ক্রমাগতই এ কথাটা চাপা দিচ্ছেন। অন্তত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ত খুব কঠিন নয় ?

চট্টোপাধ্যায় : নয় ? বলেন কি ? জানেন, আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে গেছেন, ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তাই এরকম প্রশ্নের জবাব দিই কোন্‌ রুচি মঞ্জুর ক'রে বলুন দেখি ?

নাশা : আপনার নিজের। বলুন—দিন এই শাদা প্রশ্নের শাদা উত্তর—আপনার চোখে য়ুরোপীয়ার চেয়ে ভারতীয়াকে বেশী সুন্দরী মনে হয় কি না।

* জার্মানিতে কথায় বলে স্ত্রীলোকের কর্তব্য শুধু Kleider (কাপড় চোপড়), Kuechen (মিষ্টান্ন) ও Kinder (সন্তান) নিয়ে মসগুল থাকা।

মিঃ ফরেস্টার (সরস ভঙ্গিতে) : অন্ততঃ স্প্যানিশ মেয়ের চেয়ে নয়, ফ্রয়লাইন, কেন ভড়কাচ্ছেন?

নাশা : (ফরেস্টারকে) বাঁচলাম, এতক্ষণে ইংরাজি হিউমরের কিছু নমুনা মিলল। মসিয় চট্টোপাধ্যায়, এ সভায় দেখছেন তো জর্মন, ফরাসি, রুষ, ইংরাজি সব সভ্যতারই নমুনার ছড়াছড়ি—মিললনা কেবল আপনাদেরটা।

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) যদি বলি, মিলেছে কিন্তু লক্ষ্য করেন নি, তাহ'লে?

নাশা : অর্থাৎ?—

চট্টোপাধ্যায় : আমাদের সভ্যতা বলে কি জানেন ফ্রয়লাইন? বলে যে সামাজিকতায় সেই সভ্যতার কায়দাই হচ্ছে আসল জিনিষ, যার মধ্যে অত্যুক্তিও নেই, না সত্যের অপলাপ। অথবা বলা যেতে পারে যে, সেই সভ্যতাই হচ্ছে সেরা, যা এত সহজ ও সরল যে, পেখম মেলে ক্রমাগত পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না—সে-সামাজিকতা শোভন নয়, যার মধ্যে মৌখিক অত্যুক্তি—মানে মিথ্যা—সত্যের মজুরি চায় শীলতার ছদ্মবেশে।

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্র্যাফ্‌ট্ : (বিস্মিত ভাবে) মানে?

চট্টোপাধ্যায় : এই যে, সেই সামাজিকতাই আদর্শ হওয়া উচিত, যা সরল অনাড়ম্বর—লোককে পদে পদে জানান দেয় না। যেমন দেহ তখনই সব চেয়ে সুস্থ থাকে, যখন তার অস্তিত্বও আমাদের গোচরের মধ্যে আসে না।

নাশা (হাসিয়া) : সাধু সাধু হের চট্টোপাধ্যায়। জানেন আমাদের একটি স্পানিশ মেয়েলি ছড়ায় বলে :

দেখবি যখন গুছিয়ে বেশি বলছে কেউ
জানবি ওলো, শুধু ফাঁপা কথার ঢেউ।
আকাশ সেধে যে-জল বোবা—সেই নারী :
পুরুষই হায় তোলে তুফান দিক্‌দারি।

অন্তত এ আপনাকে মানতেই হবে যে আপনার এ লেকচারটি ঠিক exampleএর গা ঘেঁষে যায় নি—precept রূপ তুফানই তুলেছে।

চট্টোপধ্যায় (হাসিয়া) : ঘাট মানালেন ফ্রয়লাইন, কবুল করছি। তবে আমাদেরও একটি পুরুষালি গানে আছে "তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো মোর জয়।" কিন্তু হারজিতের কথা রেখে একটি আর্জি পেশ ক'রে ফেলি যাকে বলে দুর্গা ব'লে। করি?

নাশা (তর্জনী তুলিয়া) : করতে পারেন, কেবল সে-আর্জি মুখোষ পরা হুকুম হবে না—এই সর্তে।

চট্টোপাধ্যায় : তথাস্তু। আমি বলছিলাম কি, লেকচার দেওয়ার প্রবৃত্তিটা হাসির মতনই সংক্রামক। সম্প্রতি আমেরিকা ঘুরে এসেছি কি না—যেখানে—একজন ইংরাজ দার্শনিক বলেছেন—"লোকে যাকে ভালোবাসে তার বই পড়ে না—লেকচার শোনে।" নইলে এ ভুল হ'ত না আমার। তাই আর্জিটা এই যে আমার সাড়ম্বর বক্তামিকে আমাদের সভ্যতার একটি খাস প্রবণতা ভাববেন না। রাজি?

নাশা : রাজি—কেবল যদি আপনিও রাজি হন বলতে—আপনাদের সভ্যতার খাস প্রবণতাটি কী। কেবল সাবধান—সত্য কথা চাই—ফেয়ারিটেল না—তাতে হাটে হাঁড়ি ভাঙা হয়, ভাঙা হাঁড়িই সই। কারণ ভারতীয় সভ্যতার খাস প্রবণতাটি আজো বুঝলাম না।

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) : কিন্তু স্পানিশ সভ্যতার খাস প্রবণতা যে নিরীহ বিদেশীকে বিপন্ন করা এটা আমি হাড়ে হাড়েই বুঝলাম।

নাশা (শাসাইয়া) : ফে—র ! ভল্টেয়ারের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দেব কি যে বাণীদেবী মানুষকে কথার পর্দা দিলেন শুধু মনকে পর্দানশীন রাখতে ?

চট্টোপাধ্যায় : না ফ্রয়লাইন। কারণ আমাদের সভ্যতা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে যে "মনের কথা" ব'লে একটি অসম্ভব সোনার পাথর-বাটি গোছের চীজ্ আছে যা সাধনালভ্য।

ফরেস্টার (অসহিষ্ণু) : Come come Mr. Mystifier, what *is* this soul-message of your culture ?

চট্টোপাধ্যায় : Just the reverse of yours Mr. Dogmatiser ! It's tolerance and candour.

গৃহকর্ত্রী (ব্যস্ত) : যেতে দিন হের্ চট্টোপাধ্যায়। বেশ তো বলছিলেন আপনাদের সভ্যতার কথা। দেখুন সবাই উৎসুক হ'য়ে চেয়ে। আমি বিশ্বাস করি প্রাচ্যের কাছে আমাদের নেবার আছে অনেক কিছু। তাই বলুন না—লক্ষ্মীটি—আপনাদের সভ্যতার পরম বাণীটি কি।

চট্টোপাধ্যায় : বাইরের দিকে, না ভিতরের ?

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্রাফ্ট্ : বাইরের—বাইরের। মিস্‌টিক ডুবুরিপনায় আমার হাঁফ লাগে।

চট্টোপাধ্যায় : বাইরের দিকে খুব বেশি বলবার নেই আমাদের—ও-রাজ্যে আপনারা বেশি ভূয়োদর্শী। কারণ জগতকে আপনারা যে ভাবে গোনাগুন্তি ক'রে দেখেছেন—চুটিয়ে, বাজিয়ে, পুড়িয়ে, ভেজে, ছাল ছাড়িয়ে তদন্ত করেছেন, আমরা করিনি। তবু একটা কথা হয়ত বলতে পারি যদি অভয় দেন।

গৃহকর্ত্রী (সোৎসাহে) : নিশ্চয় নিশ্চয়।

চট্টোপাধ্যায় : বাইরেটাকে আপ্রাণ চেষ্টায় দেখা ভালো কেবল

যদি না ভুলি যে সেটা ভিতরের সত্যেরই বিকাশ। মানে—আমাদের সভ্যতা বলে—বাইরেটার যে চেহারা আমাদের দূরবীনে অণুবীনে দাঁড়িপাল্লায় ধরা পড়ে ঠিক সেই চেহারাটাই তার পুরো স্বরূপ নয়—স্বরূপের একটা দিক মাত্র।

ফরেস্টার: Oh, words, words, words! Why won't you come down to the concrete realism Mr. Idealist!

চট্টোপাধ্যায় (সব্যঙ্গে): কারণ—যাকে আপনারা কংক্রীট বলতেন সেটা আজ আর তেমন কংক্রীট নেই মিষ্টার রিয়ালিস্ট্। মনে রাখবেন আপনাদের বিজ্ঞানই আজ জড়কে তর্জমা করল মাত্র গোটা কতক ঢেউয়ের প্রদক্ষিণ লীলায়। (নাশাকে) তাই তো বলছিলাম ফ্রয়লাইন, আমাদের সভ্যতার একটা গভীর বাণী নিশ্চয়ই এই যে বাইরেকে জানতে গেলেও সব আগে জানতে হবে অন্তরকে। নইলে—মানে বাইরের জড়জগৎকে অন্তরের চিন্ময় সত্য থেকে আলাদা ক'রে দেখতে গেলে—আপনারা সবই উল্টো বুঝবেন যেমন বোঝেন ওস্তাদেরা যখন তাঁরা রাগের প্রেরণা বাদ দিয়ে তার ঠাট বিচার করতে ছোটেন—যেমন বোঝেন গড়পড়তা ছান্দসিক যখন তিনি কাব্যপ্রেরণা বাদ দিয়ে শুধু মাত্রাতত্ত্ব শোনেন—যেমন বোঝেন ফ্রয়েডিয়ানরা যখন তাঁরা শুধু দেহের ক্ষুধা দিয়ে গোটা মানুষটার হদিশ পাবার জাঁক করেন।

ফরেস্টার: But Freud, if I understand him rightly—

নাশা (বাধাদিয়া) আর ভিতরের দিক দিয়ে আপনাদের সভ্যতার যে বাণীটি আছে সেটার নাম ধাম?

চট্টোপাধ্যায়: ধাম—আমি শুনেছি—হৃদয়—তবে নাম—ঐ তো মুস্কিল—

গৃহকর্ত্রী : না না বলতেই হবে—নামই তো আসল ?

স্রাভিন্স্কি : ডিটো—we want the name. সকলে (দোয়ার দিলেন) : we want the name of India's inner culture !

ফরেস্টার (সশব্দে) : Hip hip hurrah.

নাশা : আপনি বুঝি বিশ্বাস করেন না এসব অন্দরমহলের কথায় ?

ফরেস্টার : No Fraulein, thank you—no beastly harems for me, thank you—give me the open air and science and sports and—

চট্টোপাধ্যায় : Hypocrisy—the homage that vice pays to virtue.

ফরেস্টার (ক্রুদ্ধ) : সমঝে কথা কইবেন হের্ চট্টো—

চট্টোপাধ্যায় (তাচ্ছিল্যভরে) : মিস্টার ফরেস্টার ! একটা কথা আপনার মতন আংলোইণ্ডিয়ানের মনে রাখা দরকার—যে দুনিয়াটা ঠিক ভারতবর্ষের রেলগাড়ি নয়—যেখানে চর্ম ঈষৎ ফ্যাকাশে হলেই সাতখুন মাফ। অন্তত এটা জর্মনদেশ মনে রাখবেন—যে একা গত যুদ্ধে আপনাদের মতন পাঁচ সাতটা জাতকে ঘাল করেছিল—আমেরিকা না এলে তো পেয়েছিলেন পঞ্চত্ব। এখানেও ফুটুনি ? ভদ্রতার পাট তো কোনোদিনই নেই—কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ছাড়লেন কবে শুনি ?

গৃহকর্ত্রী (ব্যস্ত) : আহা—হা—

স্রাভিন্স্কি : না না গ্নেদিগে ফ্রাউ, মিস্টার ফরেস্টারের নিশ্চয়ই উচিত হের চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া। ভদ্র কথাবার্তায় harem টেনে এনে এ কী বিশ্রী ইঙ্গিত—বিশেষত মেয়েদের সামনে ?

ফরেস্টার (গুম্ হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : Yes, I was wrong—I withdraw what I said.

চট্টোপাধ্যায় : আমাকেও ক্ষমা করবেন হের ফরেস্টার—কারণ রূঢ়তার জবাব রূঢ়তা নয়। আমার দোষ আরও বেশি কেন না আমি বিশ্বাস করি যা আপনারা করেন না।

নাশা : কী সেটা!

চট্টোপাধ্যায় . আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে সমতা—সবতাতেই নির্বিচল থাকা। আপ্তবাক্যটি এই (আবৃত্তি করিলেন) :

He who is never affected by his pain
Nor is athirst for fleeting earthly joys
Beyond the reach of passions and fears and vain
Attachments, such a sage has equipoise *

—কিন্তু ঐ দেখুন ফ্রয়লাইন ফের লেকচার এসে গেল, হয়ত বলবেন—

নাশা : না না বলব না। বলুন—বড় ভালো লাগল শ্লোকটা। একেই কি আপনি বলেন—

চট্টোপাধ্যায় : হ্যাঁ, আমাদের অন্তর্বাণীর একটি তো বটেই। যদিও মুস্কিল এই যে এ-ধরণের ফ্যাশনেব্‌ল্ সালঁ সভায় এ ছন্দের কথা হয়ত তেমনি অবাস্তব শোনায় যেমন শিশুর মুখে—প্রণয়বাণী।

স্লাভিন্‌স্কি : তাহলে বলবেন কি—মেলামেশা সবাই ছেড়ে দেবে?

চট্টোপাধ্যায় (হাঁসিয়া) : এখানে ব'সে এমন কথা বললে সেটা আমার মুখে কেমন শোনাবে জানেন হের স্লাভিনস্কি? যেমন শুনিয়েছিল সেই টেকোর মুখে তার টাকনাশা ওষুধের জয়ধ্বনি।

---

* দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে—(গীতা)

না—আমি মানি যে সব মেলামেশাই মন্দ নয়, কিন্তু ভেবে দেখলে হয়ত মানবেন যে যে-ধরণের মেলামেশা আমরা সচরাচর করে থাকি তাতে প্রায়ই আসল লক্ষ্যটাই থেকে যায় আড়ালে—অলব্ধ। রসুন, বলছি খুলে আরো। (একটু থামিয়া) কি জানেন হের স্লাভিনস্কি, মোটামুটি মেলামেশার লক্ষ্য দুটি এ বললে হয়ত ভুল বলা হবে না, যথা অপরকে জানা আর নিজেকে জানানো। এক কথায়—আত্মপ্রকাশ। কারণ পরকেও আমরা জানি কেবল তখনই যখন তারা আমার অন্তরের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই তো দেখি যে আমার মধ্যেও যে ছন্দ সেই ছন্দই বাইরে। একটি হিন্দি গানে আছে

Lord, Thou hast dyed this marvel world's array
With my heart's hues, yet I seek without Thy play !*

হুফেন্‌বাখস : মানে বাইরের জগৎটা নেই—এইতো ? জানি। কিন্তু এ মামুলি Weltanschauungকে (জীবনদৃষ্টিকে) কিছুতেই এযুগের Zeitgeist (যুগধর্ম) ব'লে মানতে পারা যায় না হের চট্টোপাধ্যায়, ক্ষমা করবেন।

চট্টোপাধ্যায় (হাসিয়া) : সে কি আমি জানি না হের হুফেনবাখস্‌ এ যুগের যুগধর্ম হল বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি, বহির্জগতের উপাদানবৃদ্ধির সিংহনাদ, নানা ইস্‌মের তালঠোকা, ঘণ্টায় কে কত মাইল ছুটতে পারে সেই গজকাঠি দিয়ে সুখের মাপজোপ করা, প্রেরণাহীন গানের বহু পরিবেষণ করছে ব'লে বেতারবার্তাকে বলা ধন্য সঙ্গীত-কমিসরিয়েট্‌ ! তাই তো বলছিলাম ফ্রয়লাইন নাশা, যে এযুগে এদেশে ব'সে এধরণের

---

* মেরে হৃদয়কে রঙ্গমে সারে জহাঁকে অঙ্গকো
তূনে সমায়া—ঔর ময় ফির ঢুঁঢ়তা কিস রঙ্গকো !

কথা বলার ঠিক মানে হয় না। প্রতি বাণীর নিজেকে প্রকাশ করবার একটা ছন্দ আছে—পরিবেশ আছে। কাজেই অন্তর্মুখিতার বাণী নিজেকে প্রচার করতে পারে না এধরণের সভা সমিতিতে, রেডিয়ো গ্রামোফোনে, তর্ক-তুফানে স্বাদেশিকতার বাগ্বাহুল্যে। কথায় শুধু কথাই বাড়ে। তাছাড়া কোনো প্রশ্নেরই শেষ সমাধান তো নেই যখন যুক্তি প্রায় সব সময়েই শাঁকের করাতের মতন—যেতে কাটে, আসতে কাটে।

নাশা: তবে কি বলবেন—মেলামেশা সবই—

চট্টোপাধ্যায়: না তা কেন! ওর মধ্যে কিছু রস তো আছেই নৈলে লোকে এত ঘটা করে পার্টি দেয় কেন—সামাজিকতার জন্যে এত দুঃখই বা সয় কেন! আমি বলতে চেয়েছিলাম শুধু এই কথাটি যে যেভাবে আমরা সমাজে মেলামেশা করি কথাবার্তা কই তাতে শুধু যে খুব বেশি লাভ করি না তাই নয়—অনেক সময়েই লাভের চেয়ে লোকসানের জরিমানাই দেই বেশি। এই দেখুন না এমন সুন্দর সাদ্ধ্য পার্টিতে সবাই কত সাবধানে কথা বলা সত্বেও কত লোকে কত কথায় আঘাত পেল। বাকি সব কথা হল সেই জাতীয় কথা, যা শুনি আমরা শুনতে হয় ব'লেই, তা থেকে কিছু পাই ব'লে না। এসব পার্টি থেকে কেউ কি বেশি কিছু শেখে? এ ওকে বেশি চেনে? নাতো। সে পরিচয় লৌকিকতার আবহাওয়ায় ফুটতে পায় না—সে নিরালার অপেক্ষা রাখে। এসব পার্টিতে পাঁচজন এল গেল দুটো বাজে গান হল কেজো পরচর্চাও, হয়ত বা চলতি দুটো অনাহূত প্রশ্ন উঠল তার রবাহূত উত্তরও দিল হাজিরি—মানে অবশ্য এমন উত্তর যা কেউই কানে তুললনা। ফল হল কী?—না, যারা এসেছিল স্থানিক দিক দিয়ে একটু কাছাকাছি তারা মনের দিক দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদেরকে পরিপাটি

রকম ঢেকে ফিরলও তেম্‌নি পরিপাটি লৌকিক অমায়িকতার নিষ্কলঙ্ক ঘোমটা টেনে। মানে, কেউ নিজেকে অপরের কাছে ধরা দূরে যাক ছোঁওয়াও দিল না। আর দেবে কী ক'রেই বা বলুন! আমাদের কবি বলেছেন

To sing of the deep in deeper notes
I dare not—'tis so vain!
Lest thou make light of it
I'd liefer make light of my pain *

রাগ করবেন না মিষ্টার ফরেস্টার—ভাববেন না যে এই পাপেই আমরা ডুবলাম—এই আত্মাবসাদে বা রহস্যগুণ্ঠনে। (নাশাকে) কারণ ফ্রয়লাইন—সত্যিই যে গভীর কথা গভীর সুরে বলা যায় না এ যুগে যখন সবচেয়ে গভীর সত্যকে বরখাস্ত করতেই মানুষ উঠে প'ড়ে লেগেছে। তাই তো বলছিলাম, সব প্রকাশেরই একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। বাণীর প্রেরণা যেমন ছন্দের নূপুর বিনা মন্ত্রময়ী হয়ে উঠতে পারে না—অন্তরের কথাও তেম্‌নি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না যেখানে তার গভীর সুরটি থিতিয়ে যাবার সময় পায় না। এইজন্যেই আমাদের দেশে বলেছে দুই ভাইয়ের কথা—এল তারা গুরুগৃহ থেকে বহু বৎসর বেদবেদাঙ্গ পাঠ ক'রে। বাপ বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা, ব্রহ্ম কী বলো দেখি? সে অম্‌নি এয়ারোপ্লেনের মতন বেগময়ী ভাষায় আউড়ে চলল বেদবেদাঙ্গ দর্শনাদির কথা। ছোট ভাইটি চুপ ক'রেই আছে। বাবা তাকে বললেন: আর বাবা তুমি? সে অম্‌নি এক

* গভীর সুরে গভীর কথা বলতে আমি তোরে সাহস নাহি পাই
হাল্কা তুমি করো পাছে হাল্কা করি তাই, আপন ব্যথাটাই।

ভাবে চুপ্ ক'রেই রইল। মা ছিলেন এতক্ষণ চুপ ক'রে, আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "বাবা, তুমিই জেনেছ ভগবান্ কী বস্তু—তাঁকে তো মুখে বলা যায় না।"

নাশা: তবে? কী হবে এমন রহস্য নিয়ে যাকে মুখে বলা পর্যন্ত যায় না?

চট্টোপাধ্যায়: তা যদি বলেন তবে তো সব কিছুকেই বাদ দিতে হয় ফ্রয়লাইন! মুখে কোন্ বস্তুর স্বরূপ বলা যায় বলুন? বন্ধুত্ব, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ত্যাগ—এ সবের কোন্‌টার অন্তর্জ্যোতি মুখের বাক্য-ধারায় ঝল্‌কে ওঠে—বলবেন আমাকে?

হুফেনবাখস্: সে কথা সত্য, কিন্তু তবু এ সব প্রবৃত্তিই বলুন বা আপনাদের ভাষায় মায়াই বলুন এদের—ঐ কি বললেন—হ্যাঁ অন্তর্জ্যোতি না?—সে অদ্ভুত জ্যোতি না জানলেও—এদের ক্রিয়া-কলাপ তো বুঝি প্রত্যক্ষ অনুভবে। কিন্তু—

চট্টোপাধ্যায়: রসুন রসুন হের্ হুফেনবাখস্—সত্যিই কি বোঝেন এদের ক্রিয়াকলাপ? কী বলতে চাইছি?—ধরুন, একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। প্রেম। আমরা মুখে এ-বস্তুকে নিয়ে কত উচ্ছ্বাসই না করি—ঘরকন্নার ঘরও একে নিয়ে, কন্না কান্না ধন্না সবই ওকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু এহেন চিরপরিচিতেরই বা কী বুঝি? বলছি—দাঁড়ান—ধরুন এই যে প্রেম, এর ধর্ম তো আনন্দ দেওয়া, নয় কি?

হুফেনবাখস্: বটেই তো।

চট্টোপাধ্যায়: তাহ'লে বলবেন আমাকে ওর তরফ থেকেই বা সব চেয়ে বেশি নিরানন্দ আসে কেন জীবনে? এ অতিথি যখন প্রথম উঁকি মারেন তখন যে-ভরসা দেন তার সিকির সিকিও পূরণ করেন না কেন? যে-প্রেম স্ত্রীকে দিলে সমাজ থাকে সেই একই প্রেম পরস্ত্রীকে

দিলে কেন সমাজ ভাঙে? যে স্নেহ মা নিজের ছেলেকে দেন সেই স্নেহ পরের-মেয়ে তাকে দিলে মা কেন মার পদবি ছেড়ে শাশুড়ির হিংসা-শরশয্যায় শয্যা নেন? যে প্রেম নিজের জাতিকে দিচ্ছেন সে-প্রেম অন্য জাতকে দিতে গেলেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ কেন? প্রতি জাতির স্বজাতি প্রেম কেন বিদেশি-বিদ্বেষের দিকে এত সহজে মোড় নেয়? আর তখন সেই একই প্রেমের ঘটক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা না এনে কেন আনে প্রতিযোগিতা?—জীবন না দিয়ে কেন হানে শক্তিশেল—রাশি রাশি প্রপাগাণ্ডা মিথ্যা কুটিলতা কেন প্রেমের অছিলায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সায় পায়?—না হের্ হুফেন্‌বাখস্—বিজ্ঞান আপনাদের বহির্জগত সম্বন্ধে যতই জ্ঞান দিক অন্তরের যে অতল থেকে চেতনা রচনা করে আলো-আঁধার সুধা-বিষ ফুল-কাঁটা, সে অতলের খুব কম খবরই রাখে। অথচ এই খবর না মিললে অন্য সব কীর্তিকলাপই বৃথা—যদিও এ-খবর রাখলে সে সব কুশলতাই কাজে আসে। আপনাদের বিজ্ঞান বা বুদ্ধি করেছে কি?—না, চেতনাকে বাদ দিয়ে জগতের ছবি বুঝতে চেষ্টা করছে। কিন্তু জগতের যে সমগ্র ছবি তার স্বরূপ সে ছবির মধ্যে চেতনাই যে আনন্দের আনন্দ, আলোর আলো, সত্যের সত্য এ গোড়াকার সত্যটি না মানলে সৃষ্টিলীলার যে ছবি আপনারা আঁকবেন সবই যে হবে তেড়াবেঁকা যেমন কি না শীর্ষাসনে জগৎ দেখা—সবই দেখছি ঠিক্—কেবল ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে এই যা—কাজেই যাকেই যা মনে হচ্ছে সেটার স্বরূপ ঠিক তা নয়।

নাশা: এইই কি আপনাদের—

চট্টোপাধ্যায়: হ্যাঁ এ-ও একটি প্রধান বাণী: এরই নাম—অন্ত-

মুখিতা। আপনারা ভাবেন সভাসমিতি, স্কুল-কলেজ, গুদামঘর, হাঁস-পাতাল এই সবের মধ্যে দিয়েই আসবে মানুষের মুক্তির বাণী। কিন্তু ভারত তা ভাবে না। সে বলে: অন্তর আলো পেলে সেই আলোই বাইরের জগতে আলো ধরে সমাজ গড়ে শিল্প রচে। সে বলে চোখ যাকে দেখতে না পায় অথচ যে চোখের মধ্যে দিয়ে দেখে, তাকেই পেয়ে আগে অমৃত হ'তে হবে—পেতে হবে সেই আলোর উৎসকে যাঁর একটি কিরণকণায় এ জগৎ দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে, যিনি আছেন তমসার পারে—কি না বোধশক্তিহীনতার অমাবস্যা পেরুলে তবে মিলবে পূর্ণিমার দিশা।

স্রাভিন্স্কি: কিন্তু কেবল এভাবে দেখতে গেলে কি একটু ভুলও হয় না হের্ চট্টোপাধ্যায়?

চট্টোপাধ্যায় (চিন্তিত ভাবে): হয় হয়ত—বলতে পারি নে জোর ক'রে। কেন না এ সব প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে হ'লে চাই সেই চরম জ্ঞান—পরম প্রজ্ঞা। কোনো জমির অতি অল্প দূর অবধি দেখে তার পিলপেগাড়ি করতে গেলে সুফল ফলতে পারে কখনো বন্ধুবর?

স্রাভিন্স্কি: কিন্তু বলবেন কি যে য়ুরোপের এ-দেখায় শুধু কুফলই ফলেছে?

চট্টোপাধ্যায়: না তা বলি নে। য়ুরোপ নানান্ জ্ঞানের বাতি জ্বেলেছে একথা অবধারিত। জীবলীলার অনেক জমির জরিপও করেছে বৈকি। কেবল পায়নি এ জমির ঠিক পরিপ্রেক্ষিত—মানচিত্রটার আইডিয়া। আর সেটা পেতে হ'লে যে সাধনার প্রয়োজন, সেটা গোণাগুন্তি মাপজোপ কলকাঠি টেপার সাধনা নয়—এই কথাই বলেছে ভারত। বলেছে যে জীবনের লীলার প্রকাশ বাইরের দিকে হ'লেও তার উৎস অগোচরের নেপথ্যেই নিহিত—যেমন গাছের শিকড়।

গাছকে ফুল দেওয়াতে হ'লে সব আগে চাই শিকড়ের প্রাণকোষে রস জোগানো। জড় সত্যের যে বোধ তারও মূলে এই গভীর চেতনা—তাই তাকে পূরোপূরি না পেলে জড় সত্যকেও পূরোপূরি পাওয়া যাবে না এই কথাই বলেছে ভারত। ব্যবহারিক বুদ্ধি পায় না এ চেতনার হদিশ। তাই এর মগ্নমূল খুঁজতে হবে লৌকিক লীলায় নয়, অলৌকিক অনুভবে। নামতে হবে অচেতনার পাঁকে নয়, উর্ধ্ব চেতনার আকাশে—যে জন্যে গীতায় বলেছে জীবনবৃক্ষের শাখা নিচে মূল আকাশে—ও কী—

ঢং শব্দে সবাই চমকিত—এক গৃহকর্ত্রী ছাড়া। সামনের যবনিকা অপসৃত—দেখা গেল তিনটি অর্ধবিবসনা ক্যাবারে নর্তকী নৃত্যপরা রেডিয়োর জ্যাz সঙ্গীতের সহিত!

ফরেস্টার: How beautiful!

গৃহকর্ত্রী: এ বাজনা বাজছে কোথায় জানেন? নিউয়র্কে। আর এ নর্তকী তিনটিকে আনা হয়েছে বায়না দিয়ে বুদাপেস্ত থেকে হু-শ ক'রে উড়িয়ে—একরাতের জন্যে।

পিয়ের: Vive la science (বিজ্ঞানের জয় হোক)

হুফেনবাখস্: Wunderbar—fablehaft! (আশ্চর্য—অদ্ভুত)

স্ত্রাভিনস্কি: কিন্তু এ যে সস্তা জ্যাz!

ফ্রাউ হ্বোলষ্টেনক্রাফট্ (সোৎসাহে): কিন্তু ভাবুন বাজছে কোথায়—সে—ই দূ—র নিউয়র্কে—একেই তো বলি সভ্যতা!

নাশা (চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তাকাইয়া সবিদ্রূপে): কী করবেন হের চট্টোপাধ্যায়? C'est la vie (এই তো জীবন)

হুফেনবাখস (উত্তেজিত): দেখুন দেখুন—কী দৃশ্য—বিজলি

বাতি—আলোর ঝর্ণা—সুন্দরী নর্তকী—Niedlich ! Prachtvoll ! (সুন্দর, অপূর্ব) ওকি—ওকি ! এ আবার কারা ?

তিনটি নায়কের প্রবেশ আরণ্যকের বেশে—নর্তকী ত্রয়ীর সহিত ঝটিকানৃত্য।

সভাসদগণের মধ্যে উত্তেজনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি—নৃত্যের বেগও প্রবর্ধমান—জয়ধ্বনি—করতালি—যবনিকা পতন !

মাদাম কাল্‌ভে

(Madame Emma Calvé)

তিন সপ্তাহ কাটানো গেল দক্ষিণ ফ্রান্সে—যার নাম Cote d' Azur : অনেকের মতে ফ্রান্সের নন্দনকানন। তবে এমন যাযাবরও দেখেছি যাদের কোৎ-দাজুর একেবারেই ভালো লাগে না।—না লাগুক্—একথা মানতেই হবে রাজ্যটির বৈশিষ্ট্য আছে। সাগর আর পাহাড়ের এমন নতুন ধরণের সমাবেশ এত ঘুরেও আমার চোখে কই পড়ে নি তো ! আমার এক খুব প্রিয় চেক বন্ধু ও তাঁর ফরাসি পত্নীর সঙ্গে এখানে হঠাৎ দেখা—রাস্তায়। আর যাব কোথায় ?—তাঁরা আমাকে নিয়ে হৈ হৈ সুরু করলেন মোটরে, দেখালেন এ রাজ্যের নানা স্থান, বর্ণনা করলেন এর কত কী ঐতিহাসিক জাঁকজমক, ভাগ্যে ভুলে গেছি সে সব খবর—নৈলে হয়ত লিখেই ফেলতাম ঘটা ক'রে—লোককে এই ধাপ্পা দেবার সদুদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিকতার নাড়ী-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে। তবে সে যাই হোক এদের সঙ্গে মোটরযানে গিয়েছিলাম মণ্টেকার্লো। স্থানে স্থানে সুন্দর বটে।

প্রতি নিসর্গশোভারই থাকে একটা না একটা বৈশিষ্ট্য—এবিষয়ে প্রকৃতিদেবী একেবারেই অতি-প্রাকৃত নন—পূরোমাত্রায়ই মানবী। কোৎদাজুরেরও আছে বৈকি এই বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ক'রে ওর সিন্ধু শৈলের বিচিত্র সমাবেশ—যার কথা উল্লেখ করেছি। সত্যিই অপরূপ এই থাকে-থাকে-নেমে-আসা ঢেউ-খেলানো গিরিমালার সাগরাভিসার যুগে যুগে জলই হয়ে এসেছে যেন স্থলের অভিসারিকা—এখানে উল্টো—স্থল নেমে এল জলের অধরতৃষ্ণায়। স্থানে স্থানে ঠিক যেন মনে হয় গৈরিকাভ তপস্বী হাত পেতে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্চলা বিলাসিনীর কাছে। আর এদিকে ওদিকে লালচে রঙের স্নিগ্ধ আরামকুটীরগুলি ঠায় চেয়ে। আরো ভালো লাগে এখানকার নন্দননিলয়গুলির সংলগ্ন ঘাসের গালিচা, প্রতি গৃহস্বামী কত যত্ন ক'রেই যে এই টুকরো টুকরো আসনগুলি পেতে রাখেন ফুলের কেয়ারি করা বাগানে! আমরা হাল আমলে বড্ড শুনি কটেজ ইন্‌ডস্ট্রির কথা। এখানে যেন প্রতি কুটীরের ইন্‌ডস্ট্রির একটা প্রবণতা রয়েছে বাগান-জোগানোর। প্রতি নাগরিক তার বাড়িবাগান নিয়ে রচল যেন কুটীরশিল্প—ফলে খুচরো জোগান-দেওয়ায় গড়ে উঠল বিরতিহীন রূপাবাস—সমুদ্রের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে। যেখানেই যাও দেখবে এই এক মেজাজের, সমরুচির সহযোগ। সবাই মিলে যেন প্রকৃতিদেবীকে সাধছে তাঁর একটি বিশেষ মূর্তি প্রকাশ ক'রে ধরতে। আমাদের দেশের নাগরিকদের রুচি ও কল্পনা এদিকে কত পেছিয়ে?

তবে এ বিষয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের তুলনা করতে যাওয়াও ভুল। বসবাসের বিলাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ভারত পেল কবে? একদিকে বিদেশীদের আক্রমণ, অপর দিকে মায়াবাদ—যাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন বড় চমৎকার তাঁর Life Divineএর উজ্জ্বল ভাষায়:

"It is this revolt of Spirit against Matter that for two thousand years, since Buddhism, disturbed the balance of the old Aryan world, has dominated increasingly the Indian mind. Not that the sense of the cosmic illusion is the whole of Indian thought ; there are other philosophical statements, other religious aspirations. Nor has some attempt at an adjustment been wanting even from the most extreme plilosophies. But all have lived in the shadow of the great Refusal and the final end of life is the garb of the ascetic."

অনস্বীকার্য ! এদের সঙ্গে যখন মিশি তখন আরো যেন বুঝি একথা। আমরা—মানে আমাদের অনেকে—কেমন যেন মিশ খাইনা এদের ভোগবাদের সঙ্গে। এত সাজানো-গোজানো, এত প্রসাধন, এত নিখুঁৎ বাগানবিলাস এ যেন আমাদের ধাতে নেই। আমরা যখন এসবে দীক্ষা নিই তখনো এদের সঙ্গে আমাদের কেমন যেন একটা বৈসাদৃশ্য থেকে যায়, যেটা মূলগত—যেমন মূলগত হঠাৎনবাবের (upstart) বাবুয়ানার সঙ্গে বংশানুক্রমিক জমিদারের বাবুয়ানা। এ-জীবনটাকে যতই মেনে চলি না কেন—সেটা আমরা মানি যেন মুখে—জীবনকে অস্থিমজ্জায় শুষে নিতে পারলাম কই এদের ম'ত ? জীবনাতীতের বাঁশি থেকে থেকে বাজেই বাজে আমাদের প্রাণে। তখন মনে হয় এ-সবই ছায়াবাজি। কী এ ? পারলৌকিকতা ? নাম যা ইচ্ছে দেওয়া হোক আসে যায় না। না হয় ধ'রেই নিলাম যে other-worldlinessটা বড় সুবহ হয় না এ ওয়র্লডে। কিন্তু এই যে অসামঞ্জস্য, এই যে বেবনতি,—এরই মধ্যে যদি থাকে এক মহত্তর

সামঞ্জস্যের বাণী? মার্ক্সের ডায়ালেকটিকাল দর্শন বলছে, একটা সমাজবিধি প্রথম দানা বাঁধে—তার পরে ক্রমে ওঠে সে-বিধির প্রতিবাদ (antithesis)—কিন্তু এ-প্রতিবাদ দরকার ছিল চরম সমন্বয়ের (synthesis) জন্যে। পারলৌকিকতাকে বলতেই হবে ঐহিকতার প্রতিবাদ। কিন্তু যদি শুধু ঐহিকতাই কায়েম হ'য়ে থাকত—যদি জড়বাদই হ'ত জ্ঞানের শিখরবাণী তাহ'লে মানুষের আশা থাকত কোথায়? বড় পরিণতির জন্যেই তো চাই বড় দুঃখ, বড় গ্লানি। এদের ঐহিকতার আত্মমগ্ন সুখবাদ যদি জীবনের পরম দিশা দিত তাহ'লে য়ুরোপ আজ এ গাঢ়ঘন অশান্তির কেন্দ্র হ'ত কি?

যেমন ধরা যাক এদের মণ্টেকার্লো। এখানে—সবাই জানেন—য়ুরোপের বিলাসি-জীবনের একটি চরম দৃশ্য দেখা যায়। সমাজের জাঁতাকল থেকে যারা বেরিয়ে এল—যারা অপরের টাকায় বাবুগিরি করবার সময়ে ভুলেও ভাবে না যে কারুর কাছ থেকে কিছু নিলে তাকে কিছু ফেরৎ দিতে হয়—যারা শুধু ভোগকেই একান্ত ক'রে মেনে নিয়েছে—রাষ্ট্র সমাজের অনুমোদনে—তারা এখানে এসে বারুণী বিলাসিনী ও জুয়া এই তিন মোহে কি ভাবে জীবন ঢেলে দিচ্ছে সেটা দেখবার বিষয়। এরা পেশাদার বিলাসী। মানে, এছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই এদের নেই—চার্বাকের উপর ফরাসি প্রত্যয় করলে যা হয় তারি জয়ধ্বনি এখানে। অথচ কী অসুখী এরা! ভালো বংশের ছেলে মেয়েও অনেক চোখে পড়ল। কিন্তু মুখে তাদের কী দুশ্চিন্তা! চোখের নিচে কালি—অপরূপ বেশভূষা এ কালিতে আরো কালো মেড়ে দিয়েছে যেন। হাঁফিয়ে ওঠে মন। মনে হয়—নাগরিক জীবনের অত্যধিক অলসতার উত্তর কি এই ধরণের লম্পটতা, অসংযম ও উত্তেজনাবিলাস? তবে যখন প্রতি সভ্যতার পতন সুরু হয় তখন

হয়ত এই ভাবেই ভাঙন ধরে—সব চেয়ে সৌখিন মাটিই আগে ধ্বসে পড়ে। কিম্বা বলা যায়—কাঠের ঘুন ধরে তো তার সব চেয়ে নরম গোপন জায়গাতেই। বাইরের যে-অংশ আলো হাওয়া পায় সে অংশ বেশি বলিষ্ঠ সেখানে ভাঙচুরের সাড়া পৌছতে সময় নেয়—কিন্তু তবু ভিতরের ঘুনকে যদি না নিরস্ত করা যায় তবে কাঠের বলিষ্ঠতম অংশও হবে সর্বাঙ্গীণ ধ্বংসপথের যাত্রী। গ্রীক সভ্যতারও এম্‌নিই ভাঙন ধরেছিল পেলোপলিসান যুদ্ধের পর থেকে। দৈহিক শ্রমে শ্রেষ্ঠ গ্রীক লজ্জা পেত। তারা হয়ে উঠেছিল দার্শনিকের নামে বাক্‌বিলাসী, শিল্পীর নামে শ্রমবিমুখ, স্টোইকের নামে হৃদয়হীন, সৌকুমার্যের নামে মেরুদণ্ডহীন জীব। অতিলালিত্য প্রতি জাতির পুষ্পভূষণ—কিন্তু ভিতরে কঠিনতার উপাদান থাকা চাই—নইলে কোনো সভ্যতাই ধোপে টেঁকে না। য়ুরোপের মাথাওয়ালা বিলাসীদের অনুভব-দৈন্যের দৃশ্য দেখে ভয় হয় বুঝি এত উঁচু ইমারত টিঁকবেনা—এ-বৈদগ্ধ্য যে বড় বেশি মাটিছাড়া। তাই হয়ত মানুষের লীলাভূমি আজ এমন টলমলায়মান। কি বলতে চাইছি বোঝাতে একটা দৃষ্টান্ত দেই—

সেদিন এখানে ফুলরণোৎসব হ'য়ে গেল (Bataille des Fleurs), বেশ লাগল। কতরকম ফুলের বেশ প'রেই না সমুদ্রতীরে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, গাড়ি ক'রে ফুল ছুড়তে ছুড়তে চ'লে গেল! কতরকম হাসাহাসিই না চলল, দর্শক ও পুষ্প-নটনটীদের মধ্যে! কতরকম বাহনই না বিবিধ ফুলসজ্জায় সেজে ছুটল! বৎসরে তিনবার ক'রে নাকি এখানকার প্রকাশ্য রাজপথ এরূপ অজস্র পুষ্পশকটে সরগরম হ'য়ে থাকে। দেখতে ভারি সুন্দর! এদের জাতীয় জীবনের একটা সুন্দর অভিব্যক্তি বৈ কি। কোনো শকটে বা ফুলের মরাল, কোনো শকটে বা ফুলের ময়ূর, কোনও

শকটে বা ফুলের নক্ররাজ, কোনো শকটে বা ফুলের তিমিমাছ। খরচ এতে নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু উৎসবের দিন ত মানুষ ব্যয়-সঙ্কোচ করে না। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ সসীম, দিনগত-পাপক্ষয়ী, বৃত্তিভোজী। সে-দিন সে যে দেবতার পূজারী! তা ছাড়া মহোৎসবেই তো জাতীয়-জীবনের উদ্বৃত্তের গৌরব। জীবনের আনন্দ-লোকে সুন্দরের তর্পণেই তো আমরা মনুষ্যত্বের দৈন্য ছাপিয়ে উঠি।

তবু এত আতিশয্য এত ভিড় ভালো লাগে না যেন। কোথায় যেন মনে হয় এসবের মধ্যেই বড় বেশি গোছালো নাটুকেপনা। কোথায় যেন খচ খচ ক'রে বাজে এতে এদের এভাবে মেতে উঠতে দেখে। বিশেষ ক'রে এযুগের অশান্ত ধ্বনিমত্ততায়। উৎসব-আনন্দের মুখরতা অসহ্য হ'য়ে ওঠে, যদি তা নিত্যকর্ম হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার একটি ফরাসি বান্ধবী সেদিন বলছিলেন যে, তিনি নীস আর সহ্য করতে পারছেন না—যাবেন কাছের একটি ছোট্ট সহরে।—নাম গ্রাস। সেখানে অজস্র ফুল; ফুলের নির্যাস নিয়ে নানাপ্রকার সুগন্ধি সেখান-কার নানান্ কারখানায় তৈরি হয়।

একদিন তাঁর সঙ্গে মোটরে যাওয়া গেল গ্রাস-এ। ফুলের শহর বটে। একটি সুগন্ধির কারখানায় প্রবেশ করা গেল, বেশ লাগল। কিন্তু এখানেও দেখা গেল ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি। সৌখিন ইন্দ্রিয়বিলাসের কী অদ্ভুত সূক্ষ্মতাসাধনী প্রতিভা ভেবে আশ্চর্য হ'তে হয় বটে, কিন্তু অলূডাস হাক্সলির অক্ষেপ মনে পড়ে: "He writes nicely, don't you think?...How disastrous when a man knows how to say the wrong things in the right way... how few great stylists have ever said any of the right things! That's one of the troubles about education...

the best that has been thought and said. Very nice. But best in which way? Alas, only in form. The content is generally deplorable!"

এদেরও হয়েছে তাই। এখানকার সুগন্ধি চালান যায় বিদেশে। কিন্তু সেজন্যে কী খাটুনিটাই যে এরা খাটে! উঃ! যেন কারিগরদের রক্ত জল না করলে সুগন্ধের ছিটেফোঁটাও মিলতে পারে না। তবে এ নিয়ে আক্ষেপেই বা ফল কি? যে-কোনো আনন্দসামগ্রীকে পণ্য করলে তার তো এম্‌নি ব্যভিচারই হবে। মা সন্তানের দিকে স্নেহভরে চেয়ে—এ-চাহনিকেও এরা পণ্য করল বাজারদরের লোভে! তীব্র আলোর সম্মুখে ধরছে মা-কে—বলছে "শিশুকে আদর করো—আমরা জাঁকিয়ে দেখাব কাকে বলে রিয়ালিস্টিক মাতৃস্নেহ।" প্রণয়ি-প্রণয়িনীর চুম্বন সম্বন্ধেও ঐ কথা। সেদিন সত্যিই একটি পত্রিকায় ছবি ছাপিয়েছে চুম্বনবদ্ধ একটি দম্পতীর (?) আর তলায় বড় বড় হরফে লেখা "Rehearsing a kiss for the celluloid. Before a kiss is finally caught by the film camera, the actors and actresses must pass through an elabrote rehearsal. Picture above shows a pair of film-actors rehearsing a kiss."

এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন এই টকি নিয়ে। তিনি বললেন, এই যে ক্রমাগত মহলা দিয়ে চুম্বন করা—কোনো না কোনো সময়ে চুম্বনটি হ'য়ে উঠবে ঠিক খাঁটি—authentic চুম্বন—আর অম্‌নি ক্লিক—বোতাম টেপা caught by the camera: একই প্রণয়বাণী উচ্চারণ করবেন বার বার—করতে করতে একবার সেই বাণীতে প্রেম জেগে উঠবে অম্‌নি ক্লিক্—বোতাম টেপা—caught by the

camera : মা শিশুকে করবেন তাঁর একই স্বর্গীয় আদর হাজার বার—প্রত্যেক বারই ডিরেক্টরদের শ্যেনদৃষ্টির সাম্‌নে—হঠাৎ একবার তাঁরা টের পাবেন যে আদরটা ঠিক সাঁচ্চা মাতৃসম্ভব হ'ল—অম্‌নি ক্লিক্—বোতাম টেপা—caught by the camera. ঠাট্টা?—না, বন্ধু "প্রগতিশীল" ঠাট্টার ঠ জানেন না। তাঁর সত্যিই আছে জ্বলন্ত ব্যাকুল বিশ্বাস যে এভাবে প্রথম শ্রেণীর জীবন্ত টকি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। মনে পড়ে বিলাসিনী বলেছিল তার প্রণয়ী বিল্বমঙ্গলকে : "যে-আকুলতা যে-ভালোবাসা যে-তদ্‌গতচিত্ততা তুমি আমায় দাও তার সিকিও যদি ভগবানকে দিতে—তাঁকে পেতে।" ইংরাজিতে বলে—alas, zeal, worthy of a better cause? উৎসাহ—বুঝি, কিন্তু টকি-তে?

অথচ এর উপায়ই বা কী? আমার সুকুমারমতি অনেক বন্ধু-বান্ধবীকেও তর্ক করতে শুনি রোজই যে এভাবে-তোলা টকিতে তাঁরা গভীর আনন্দ পান। মানুষের প্রতি পবিত্র অন্তরঙ্গ আবেগ উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিকেও বণিক আজ তার বাজারদর হিসেব ক'ষে দেখবেই, টাকার টাঁকশালে ঢালাই করবেই আর্টের অছিলায়! তবু যখন সুকুমারমতি মানুষও এতে vulgarity দেখতে পায় না তখন কী আর বলা যাবে কৃত্তিবাসের পয়ার ছাড়া : "শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথায় বাঁধবি তাগা।"

তবু এ সম্পর্কে একটা কথা বড় বেশি মনে হয় বিশেষ ক'রে এই টকির যুগে। কারণ যান্ত্রিক নিখুঁতিয়ানায় টকি নিশ্চয়ই উঠেছে গৌরবের (?) শিখরে। কথাটা এই :

সব সভ্যতারই একটা মস্ত কর্তব্য হ'ল নিজের আনন্দ নিজে সৃজন করার ক্ষমতাকে জীবন্ত রাখা। গ্রীক সভ্যতায় সক্রেটিস প্রমুখ তর্ক-প্রমোদীরা বুদ্ধির আলো কি ভাবে জ্বালিয়ে রাখতেন সবাই জানেন।

তার পরে ইতালিয়ান ও ফরাসি রেনেসাঁসে ঘরে ঘরে অভিজাত শিল্পানুরাগিণীরা (dames de salons) গুণী জ্ঞানীকে নিয়ে কী চাঁদের হাট বসাতেন সে-ও সর্বজনবিদিত। এমন কি আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতায়ও গল্পের আসর, ডিবেট, গানের বৈঠক, ক্লাব প্রভৃতি সভায় সভ্যরা এখনো আনন্দ শুধু যে চান তাই নয়, নিজেরাও জোগান দেন কম-বেশি। আমাদের আমোদ প্রমোদে—কথকতা যাত্রা জলশায় গ্রহীতা ও স্রষ্টার মধ্যে সীমারেখা এত স্পষ্টাঙ্কিত ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে—বোধ করি জীবন সংগ্রামের দরুণই—হয় এই যে আমোদ প্রমোদের কপালেও পড়ে রসের-জোগানদারদের, গানের কন্‌ট্রাক্‌টরদের, হাসির-রসদদারদের ছাপ—শীলমোহর। তাঁরা বলেন: "হে বিলাসী, বিলাসিনী! আর ভয় নেই—আমি এনেছি—যন্ত্রের চরম '—টকি—সর্বাধার:

আলোর মশাল নিয়ে হাতে নেই নেই আর ভয়,
গানের নাচের হাসির তুফান সবেই আমার জয়।
এই মশালের দীপ্তিঋণে জ্বলবে ভোরের বাতি,
আশাহীনের মিলবে আশা—সাথীহীনের সাথী।
যা কিছু চাস দেব জোগান—ভরা আমার ঝুলি:
রঙে রসে রূপে রাগে করছে কোলাকুলি।
সুরের উৎস যন্ত্র আমার, রূপের উৎস ছবি,
যেমন গানের দিবি হুকুম আমার তাঁবের কবি
করবে তামিল—অর্কেস্ট্রায় যেমন দাপাদাপি
চাইবি তোরা—মিলবে, চম্‌কে উঠবি সবাই কাঁপি'।
নৃত্য?—সেও আমার কাছেই মিলবে, মোহিনীরা
যতটুকু চাইবি নেচেই হবেন সুগম্ভীরা।

হুকুম মতন হেসেই আবার হুকুম মতন কেঁদে
হাসিয়ে তোদের ফেব কাঁদাবেন--আর তাঁদেরও সেধে
মন জোগাতে হবে না ভাই,—ধর্না দেবেন তাঁরাই।
সত্যযুগের রীতি হবে এম্‌নি ধ্রুবধারাই।
মিথ্যে কেন শ্রম আর তাই ?—আমার টিকিট কিনে
বারেক শুধু বোস্‌ চেয়ারে—মন নেবে তোর জিনে
গাইয়ে আমার বাজিয়ে আমার নর্তকী রূপসী :
ডাকছি তোরে মুগ্ধ ওরে, থাক্‌ তোরা সব বসি'
অকম্মারা পারিস নে যে কিছুই, "টকি" আমি
সর্বনিপুণ, তাই জোগাব সবই দিবসযামী
তোরা শুধু মাশুলটি দে—বাকি ভার সব আমার
করবি না কি জয়ধ্বনি এমন উদার দাতার ?"

জানি এর উত্তর কী। যুগ বদ্‌লাচ্ছে—কাজেই সেকেলে রুচি একালে অচল। কিন্তু এযুগও তো বদলাতে পারে। এ তো একটা যুক্তি নয় যে যা কিছু হাল আমলের তা-ই ভালো।

কিন্তু এ যুক্তিতর্কেরও কথা নয়। যে-সভ্যতায় আনন্দ পাবার সর্ত এই ধরণের নির্লজ্জ বেনেবৃত্তি যার একমাত্র লক্ষ্য টাকা প্লাস্‌ উত্তেজনা (আর্ট তো একটা অজুহাত—rationlisation) সে-যুগের অধোগতি সুদূর নয়। যতই আর্টের যুক্তি দাও না কেন, হৃদয়ের গভীর গোপন পবিত্রতা লজ্জায় মুখ ঢাকবেই যখন অর্থলব্ধ উদ্ভাবনী প্রতিভা হাজার বাতি জ্বালিয়ে মাকে হুকুম করবে তার শিশুকে আদর করতে—হায়রে, যেন সে-আদরে মাতৃস্নেহের আসল ছন্দটি ফুটতে পারে কখনো! যখন মা জানে যে তার স্নেহের উপরেও লুব্ধ বণিকের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি—সে-স্নেহের ছবি বাজারে কাটবে ব'লে! তবে

য়ুরোপীয় সভ্যতার অনেক কিছুই তো এম্‌নি পণ্যদোষদুষ্ট লালসা-পঙ্কিল। হয়ত এই পথে রসাতলে নেবে তবে তার জাগবে ফের হারানো গগনস্মৃতি। সাধে কি ঋষি কবি খেদ করেছেন :

We dwindle down beneath the skies
And from ourselves we pass away :
The paradise of memories
Grows ever fainter day by day :
The shepherd stars have sunk within,
The world's great night will soon begin

আকাশের তলে ধীরে ধীরে যাই মিলায়ে
বিদায় লই যে আপনারই কাছে হায়
ধরণীর স্মৃতিদল ঝরে আলো হারায়ে
দিনে দিনে !—তা'রা ঝরা পথে কোথা যায় !
অন্তরে নিভে আসে ধ্রুবতারা গহনা
ধরণীর মহারাত্রির বুঝি সূচনা !

* * * *

নীসের বহির্জীবনের একটি অধ্যায় লেখার মতন। ব্যাপারটা এই :

এখানে সেদিন এক কাউণ্টেসের সালঁতে (Salon) আমাদের গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া গেল—গানও করা গেল। ভারতীয় সঙ্গীতের মহিমা এ সব দেশের সঙ্গীতজ্ঞ লোকেরা যে অনেকটা বুঝবেন রোমাঁ রোলাঁর এ কথাটা অনেকটা সত্য মনে হ'ল। কারণ বেশ বোঝা গেল যে, নানারকম লোকের কাছ থেকে যে সমাদর মিলল, তার জন্যে দায়ী আমি নই—দায়ী আমাদের সঙ্গীতের একটা বিশিষ্টতা।

হয়ত এত নূতন ধরণের ব'লেই এরা এতটা চম্‌কে যায়। কিন্তু হেতু যাই হোক্‌, এরা বুঝতে শিখছে যে, আমাদের সঙ্গীতটা নিতান্ত কেওকেটা নয়। অথচ আমাদের দেশে আমরা আজও বুঝিনি আমাদের এহেন আনন্দ-সম্পদের মূল্য। এম্‌নিই হয়।

কাউণ্টেস বললেন ভারতীয় সঙ্গীত তাঁকে একটা ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যায়। একজন মস্ত ফরাসি গায়িকা বললেন (এঁর কথাই বলার মত— যথাস্থানে আসছে) আমাদের সঙ্গীত সেদিন শুনে অবধি তিনি কেবলই গাইতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু এত কঠিন!

আর একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে সেদিন আলাপ হ'ল। তাঁর তরুণী কন্যার সঙ্গে তার পরদিন সমুদ্রতীরে দেখা। তিনি বললেন, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত তিনি রাত্রে স্বপ্নে শুনেছেন। প্রথম দিন যখন মেয়ের মা উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন, তখন ভেবেছিলাম—বুঝি বা লৌকিকতা। কিন্তু পরদিন যখন মেয়ে নিজে থেকেই আমাদের সঙ্গীত স্বপ্নে শোনার কথা বললেন, তখন মনটা সত্যই খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

কিন্তু ভারি জানতে ইচ্ছে হয়, আমাদের সঙ্গীতে এদের চিত্ততারে ঠিক্‌ কিরকম অনুরণন তোলে! সময়ে সময়ে ললিতকলার রকমারি আবেদনের কথা ভাবতে অবাক লাগে! কারণ আমাদের মর্মলোকের যে রুদ্ধ দুয়ার আমাদের সুরের ঝর্নায় খুলে যায়, এদের মর্মলোকের ঠিক সে দুয়ারটি তো আমাদের গীতিমূর্ছনায় খুলতে পারে না! কিন্তু তবু একটা না একটা জায়গায় যে এদের চিত্রপটে আমাদের সুরের তুলি রং ফলায়, এ তো নিশ্চিত! অথচ কোথায় এ রহস্যের চাবি? একই রং দুজনের চোখে, দুজন তাকে দুরকম দেখল অথচ এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির ভেদের মধ্যে মিলও তো রয়েছে! নইলে আমার-দেখা আমার-শোনা জিনিষকে তোমার কাছে বর্ণনা

করবার মানে হ'ত কি? তাই যেমন শিল্পের একটা গোড়াকার কথা হ'ল স্বাতন্ত্র্যবিলাস, তেমনি আর একটা (এবং আরো বড়) কথা হ'ল ঐক্যবোধ। একই অনুভব, একই ভালোবাসা প্রতি লোকের কাছে আলাদা হবেই তার সত্তার গড়ন অনুসারে, অথচ তবু বলব এই স্বাতন্ত্র্যেরই তলে তলে ব'য়ে চলেছে এক গভীর আনন্দবোধের অন্তঃশীলা প্রবাহিনী, যার ঢেউয়ের এক আঁজলাও যদি অপরকে দিতে পারি তার তৃষ্ণার কিছু উপশম হবেই। না যদি হ'ত তাহ'লে বড় কাব্য বড় সঙ্গীত বড় ছবি বিশ্বের বাঞ্ছিত হ'য়ে উঠত না। যাক্।

* * * *

কাউণ্টসের ওখানে কাল ছিল সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ। এখানে সমবেত হয়েছিলেন বিবিধ অতিথি—বাংলাভাষায় যাকে বলে বৈশ্ব মানবিক। কথাবার্তাটা মিইয়ে যেত নিশ্চয়ই। কেবল পূর্বোল্লিখিতা গায়িকার অভ্যুদয়ে এক অভিনব সুর বেজে উঠল—যে-সুর এহেন নীরস ফ্যাশনের পার্টিতে বেজে ওঠার কথা নয়। এসূত্রে যেন নতুন ক'রে শিখলাম এই সত্যটি যে পাথরের ফাটলেও সবুজ লতাপাতা ফুল যখন নিজের ঠাঁই ক'রে নেয় তখন সে স্বয়ংসিদ্ধই হ'য়ে ওঠে, পাষাণের পরিবেশ হাজার ঊষর হ'লেও একটি তৃণের এজেহারে সে-নীরসতা হয় নামঞ্জুর। তাই এ কথাবার্তার একটা বিবরণী দিলামই বা।

কাউণ্টেসের মাতৃভূমি সুইডেন। বয়স প্রায় ষাট। শুভ্র কেশ, সৌম্য আনন। বোঝা যায় এক সময়ে পরমাসুন্দরী ছিলেন। প্রতি ভঙ্গিমায় তাঁর সৌকুমার্য সম্ভ্রম ও সুষমা যেন ঝ'রে পড়তে থাকে। তাঁর স্বামী একজন রুষ অভিজাত। তাঁর দুই কন্যার একজন থাকেন আলজিরিয়ায়, অপরা পারিসে অভিনেত্রী। কাউণ্টেস নিজে

বিবেকানন্দের শিষ্যা। প্রায়ই তাঁর ওখানে স্বামিজির নানা রচনা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ ক'রে পড়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম আলোচনাও চলে। কাল টেবিলে আমরা আটজন ভোজনে ব'সে :— কাউন্টেস, ফরাসী গায়িকা, কাউন্টেসের কন্যা, তাঁর সেক্রেটারি, একটি ইংরাজ মহিলা, একজন দার্শনিক ফরাসি ইঞ্জিনিয়র, এক বাক্‌চতুর তরুণ ও আমি।

আমাদের টেবিলে চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়ের অফুরন্ত সরঞ্জাম দেখে হৃষ্টরোমা বাক্‌চতুর বললেন: "ক্যাথলিকরা অতি ইন্দ্রিয়-বিলাসী" (Les catholiques sont fort sensuels) অথ ঘন ঘন হস্তোৎক্ষেপ।

ফরাসি গায়িকা (ঘোরতর আপত্তি—তথা ততোধিক হস্তোৎক্ষেপ সহকারে : মসিয়ের জানা উচিত যে আমি ক্যাথলিক।

(বিস্ময়শঙ্কান্বিতা ইংরাজ মহিলাটি আমার কানে কানে জনান্তিকে বললেন: "বাচাল লোকটি ক্যাথলিকদের মাঝখানে ব'সে বাগাড়ম্বর ক'রে কী বাহাদুরিই না করছেন—ম'রে যাই !")

বাক্‌চতুর (স্কন্ধ কুঞ্চিত ক'রে) : তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। আমি সাধারণ ভাবে কথা বলছি। আমি নিজেও ক্যাথলিক।

গায়িকার রাগ একটু পড়ল: ক্যাথলিকরা বড় অসহিষ্ণু মানি, কিন্তু—ইন্দ্রিয়বিলাসী ! সে কি !! (তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা গেল—রফা।)

বাক্‌চতুর কিন্তু স্বভাবে যুদ্ধংদেহি : সত্য হচ্ছে সত্য। (আবার হস্তোৎক্ষেপ। তাঁর প্লেটটি হঠাৎ তাঁর হাতে লেগে ভূমিশয্যা নেয় আর কি !)

কাউন্টেস-দুহিতা (এবার রুখে উঠে) : তা যদি বলেন মসিয়ে, এ-জগতে ইন্দ্রিয়বিলাসী নয় কে ?

বাক্‌চতুর (বিজ্ঞভাবে) : ঢুঁড়লে মেলে মাদাম—যেমন বৌদ্ধরা।

কাউণ্টেস : বরং বৈদান্তিক বলুন।

সেক্রেটারি : একই কথা।

ইংরাজ মহিলা আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না : আপনি একবার বুঝিয়ে দিন তো মসিয়ে রায় যে, বৈদান্তিক হচ্ছে বৈদান্তিক, আর বৌদ্ধ হচ্ছে বৌদ্ধ।

আমি তো আর নেই! আমি! যে আজো জানে না বেদান্ত গায়ে দেয়, না বৌদ্ধধর্ম পেতে শোয়! ইংরাজ মহিলা উৎসাহ দিয়ে বললেন : "মা ভৈঃ! বলুন না যে, বৈদান্তিকরা মনে করে জগতের উদ্ভব অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়" (সাম্‌নের বোতল থেকে আর একটু Vin blanc [শ্বেত মদ্য] গড়িয়ে লওন)

মহিলা কাহিল করলেন আমাকে। জ্বলন্ত উৎসাহের সঙ্গে মদ্য-মাংসের রসানে দর্শনশাস্ত্রের গবেষণাটা একটু যেন কেমন কেমন না?

গায়িকা : বৌদ্ধরা তো তাহ'লে মানুষ মন্দ নয়! অন্তত তারা নম্র, বলে-জানিনে। য়ুয়োপে আজ সর্ব্বজ্ঞ নয় কে? (অথ বাক্-চতুরের দিকে সাবলীল কটাক্ষ করণ ও তাঁর রক্তিম হওন—যদিও সে ক্ষণতরে।

বাক্‌চতুর : যে জানে সে বলবে না—জানে?—কী বিপদ! য়ুরোপ তো আমেরিকা নয়!

কাউণ্টেস (বিপন্নকণ্ঠে) : মসিয়ে! আপনার কন্নুইবর্তিনী আমেরিকার New Thought-এর চারণী। তিনি আপনার সঙ্গে বোধহয় সম্পূর্ণ একমত হবেন না যে আমেরিকা কিছুই জানে না।

বাকচতুর : শুনি আপনার 'সাগা'! কী বস্তু এই নয়া-মার্কিনিসম্?

প্রচারিণী (সাভিমানে) : আপনাকে শোনাব কি না আমি?—সব-শোন্তাকে?

বাকচতুর : ক্ষমা !—কিন্তু কি জানেন ?—আমেরিকা সম্বন্ধে তো য়ুরোপের সভ্য মানুষের বেশি কিছু জানবার ইচ্ছা হওয়ার কথা নয়।

প্রচারিণী : তবু এইটুকু জেনে রাখুন যে, বহু আমেরিকান মহিলা এই আন্দোলনে উঠে প'ড়ে লেগেছেন।

বাক্চতুর (গম্ভীরভাবে) : আমেরিকান মহিলারা কোন্ কাজে না উঠে প'ড়ে লাগেন বলবেন আমাকে ?—শিশুজাতির স্বভাবই তো এই ওঠা এই পড়া।

প্রচারিণী (শাসিয়ে) : তবে শুনুন। স্বয়ং কাইসারলিং ব'লেছেন আমাদের আমেরিকার এই নব তন্ত্রই হচ্ছে ভবিষ্য যুগের ধর্ম।

বাক্চতুর (ভ্রূধনুষ্টঙ্কার সহ) : বটে ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাইসারলিং মহাশয়ের কথা কথামৃত হ'ল কবে থেকে ?

প্রচারিণী (আরক্ত) : আমার কাছে যা বললেন—আশা করি আর কারো কাছে বলবেন না।

বাক্চতুর : কি সম্বন্ধে ? কাইসারলিঙের কথামৃত সম্বন্ধে, না আমেরিকানদের ওঠাপড়া ?

প্রচারিণী (শূন্যপ্রায় পাত্রে আরও একটু শ্বেত সোমরস গড়িয়ে) : আমি আমেরিকানদের ভালোবাসি। তারা মস্ত জাতি।

বাক্চতুর : কিসে ?—ডলার স্তূপীকরণে ?

কাউণ্টেস (বাধা দিয়ে) : অতটা বাড়াবাড়ি নাই বা করলেন মসিয়ে ! আমেরিকার কৃতিত্ব কি কিছুই নেই বলেন আপনি ?

বাক্চতুর : নেই ? বাঃ ! নৈলে অভ্রভেদী খাঁচা গড়ল কে ? খৃশ্চিয়ান আরোগ্যপন্থা দেখালো কে ?—তবে আর্টে বা বিজ্ঞানে নয়।

ইঞ্জিনিয়র : বিজ্ঞানে কিছু করেছে তারা—

গায়িকা : আর্টেও করবে।

বাক্‌চতুর: করবে কি না জানি নে, কিন্তু আজ অবধি কিছু করেছে কি? আপনি তো অনেক দিন আমেরিকায় ছিলেন, তাদের মধ্যে সৃষ্টিপ্রতিভার ছিটেফোঁটাও দেখেছেন কি?

গায়িকা (বিব্রত): তাদের উৎসাহ অপর্যাপ্ত।

বাক্‌চতুর: শিশুর উৎসাহে পর্যাপ্তি থাকে কবে? আর আমেরিকার উৎসাহ নেই কিসে বলুন মাদাম? Y. M. C. A, Ku Klux Klan, লিঞ্চিং, ঢাকপেটানো, হলিউড, জ্যাক জনসন, মেরি পিকফোর্ড, বেদান্ত, বার্টরাণ্ড রাসেল, গান্ধি, মুসোলিনি, নিগ্রো স্পিরিচুয়াল, বীটোভন্‌—সবতাতেই ও-জাতের উৎসাহ সমান জ্বলন্ত, পক্ষপাতিতা সমান নিরপেক্ষ।

গায়িকা: একটু অবিচার হ'য়ে পড়েছে মসিয়ে! অন্তত আমেরিকান মেয়েদের গানে ঔৎসুক্য আশ্চর্য!

বাক্‌চতুর: Sans doute (অবধারিত)। আপনি কি দেখেন নি শিশুর জোঁকেও যে-ঔৎসুক্য প্রজাপতিতেও তাই?—আমি ওঁদের ঔৎসুক্যের কথা জানতে চাইনি—তবে যদি আমাকে জানান সঙ্গীতে ওঁদের এই ঔৎসুক্য-প্রতিভা ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিশক্তি আছে তাহ'লে আমি আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

কাউণ্টেস: আপনি কি বলতে চান তাঁরা সঙ্গীতে কখনই সৃষ্টি করতে পারবেন না?

বাক্‌চতুর (অম্লান বদনে): তাঁদের সে-আবহাওয়া কোথায় কাউণ্টেস? কবে কে শুনেছে ডলারের বাগানে আর্টের কুঁড়ি শিউরে ওঠে?

(এ-ঘটনার কয়েক মাস পরেই আমি ভিয়েনাতে নিমন্ত্রিত হই ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সেখানকার বিখ্যাত Urania Hall-এ বক্তৃতা

দিতে। সেখানে ওদের গীতিরসিকেরা একদিন আমাকে সন্ধ্যাভোজে নিমন্ত্রণ করেন এক মস্ত অভিজাতের বাড়ি। সেখানে ছিলেন এক বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান বেহালাবাদক। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি শুনে হেসে কেঁদে বললেন তাঁর শোকাবহ-হাস্যকর অভিজ্ঞতার কথা।

নিউয়র্কে তো গেছেন বন্ধু কত আকাশ কুসুম মনে ছ'কে নিয়ে। প্রথম রাত। যা ভিড়! সামনের দিকে এক কোটিপতি ব্যাবিট্‌ ব'সে। বাজনা শেষ হ'লে ইনি গ্রীন রুমে ফুলের তোড়া হাতে এসে বললেন: "Mein Herr! I bought a ticket for ten dollars, you have played worth twenty!")

গায়িকা: তা না হ'তে পারে—কিন্তু সে ডলার দিয়ে তারা ভালো ভালো সঙ্গীতকারের গানও তো শোনে।

বাক্‌চতুর: ইংরাজিতে একটা কথা বলে শুনেছেন কি মাদাম? সময় করা বধ?

গায়িকা (ঈষৎ ক্ষুব্ধ): কিন্তু তাদের ইন্‌টারেস্ট্‌ আর উৎসাহ—

বাক্‌চতুর (বাধা দিয়ে): আমেরিকান মেয়েদের ইন্‌টারেস্ট—আমেরিকান মেয়েদের উৎসাহ—স্বাধীনতা—স্বাবলম্বন!—মাদাম, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা প্রাণ পালাপালা হয়েছে আমার—ক্ষ্যামা দিন এবার। বলব তবে? সেদিন বিরাট নেগ্রেস্কো হোটেলে তিনটি আশ্চর্য আমেরিকান উৎসাহিনীর সঙ্গে দেখা। তাদের মোটর-চালক ভারি ভদ্রলোক। বললে ces trois belles dames sans merci (নিষ্করুণা অপ্সরীত্রয়ী) পারি থেকে নীস ছুটে এসেছেন উর্ধ্বশ্বাসে—একটানা—না থেমে! পথে কিছুই দেখেননি শোনেননি শুধু বলেছেন আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই!—দুদণ্ড দুধারের অপরূপ দৃশ্যের দিকে একটিবার তাকা ছাই—কিন্তু তাকায় তো চোখ না

মাদাম! তাকায় যে তার নাম মন। মনমোহিনীদের উড়ুক্ষু মন চায় শুধু মোহিনী নেশা—গতির উত্তেজ। তাই মরি-বাঁচি ক'রে একটানা হাজার মাইল ছুটে নেগ্রোস্কায় পৌঁছে সটাং কিমোনো প'রে পাইপ ধরিয়ে তবে আপদ শাস্তি, উৎসাহেরও ক্ষান্তি।

কাউন্টেস: কিন্তু সব আমেরিকান মেয়েই কি এইরকম বলতে চান না কি?

বাক্‌চতুর: অন্যরকম হবে কোত্থেকে বলুন দেখি? সত্য কাল্‌চারের প্রতি শ্রদ্ধা—ও কি ইয়াঙ্কির ধাতে হবার জো আছে মাদাম? চড়ুইকে গান শেখালেই কি সে বুলবুল হয় রাতারাতি?

প্রচারিণী (ইঞ্জিনিয়রকে): আপনারা তো বেশ দিব্যি মুখ বুঁজে আলাপের নামে শুনে যাচ্ছেন এই সব প্রলাপ!

ইঞ্জিনিয়র দার্শনিক: মসিয়ে একটু তপ্ত জিভের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে যে মাদাম—করি কী বলুন দেখি?

প্রচারিণী (রাগতঃ): সত্যি! যথা?

ইঞ্জিনিয়র দার্শনিক: বিজ্ঞানে একটা জাত অল্পদিনে কিছু গ'ড়ে তুলতে পারে বটে—কিন্তু ললিতকলায়, দর্শনে ও সত্য কাল্‌চারে বনেদি বংশগৌরবের দামটা বড় বেশি যে মাদাম, উপায় কী বলুন! এ সৃষ্টি অধৈর্যেরও কাজ নয়, নিছক্ ইন্‌টারেস্ট উৎসাহেরও না—এজন্য চাই ট্রাডিশন, অবসর, প্রশান্তি আর আত্মসম্ভ্রম।

কাউন্টেসদুহিতা: আপনি কি বলতে চান ঠিক বুঝলাম না।

দার্শনিক: দেখুন, জগতে যে যে জাতিই এ সব দিকে সৃষ্টি করেছে, ভেবে দেখেছেন কি, তাদের সে সৃষ্টি করতে কতদিন ধ'রে সভ্যতার অবসরের জাবর কাটতে হয়েছে?

কাউণ্টেস: তার মানে?

দার্শনিক: য়ুরোপের মনীষীরা যে জ্ঞান, দর্শন, ললিতকলার চর্চায় দিনের পর দিন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন, ডলার-উপাসক আমেরিকানরা কি সেটা বুঝতে পারে মনে করেন?

বাক্‌চতুর (সোৎসাহে): আমিও তো এই কথাই বলছিলাম—বলুন মসিয়ে বলুন। কী হবে ফাঁপা ভক্তির বেলুনে? সেটা যত শীঘ্র ফুটো ক'রে দেওয়া যায় ততই ভালো।

দার্শনিক: ভেবে দেখুন, জগতে যারাই এতটা বড় সভ্যতার সৃষ্টি করেছে, তারা কতদিনের সাধনার ফলে সেটা পেরেছে। ধরুন ভারত, চীন, মিশর, বাবিলন, গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্মনি ও রাশিয়ার ইতিহাস। প্রতি জাতির মধ্যেই সত্য ললিতসৃষ্টি বা নিঃস্বার্থ জ্ঞানের আদর হ'তে কত দেরি হয়েছে ক'ষে দেখুন তো! আমেরিকাও তাই কিছু এখনি-এখনি সত্য সভ্যতার দাম দিতে শিখতে পারে না মাদাম, রাগ করবেন না,—তা সে যতই কেন না Now Thought আন্দোলনে ডুব-সাঁতার কাটুক বা যতই কাইজারলিঙের সার্টিফিকেটের ঢেউয়ে পাল তুলে চলুক। আমি জাতে ফরাসি মাদাম, বনেদি ঘরের মর্ম তো বুঝি—হাড়ে হাড়ে।

গায়িকা: বনেদি ঘরের কথা বলতে মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের কথা। হাঁ, বনেদি ঘরের মধ্যে একটা মস্ত মহিমা আছে বটে—মানতেই হবে।

আমি ইতিপূর্বে শুনেছিলাম যে, ইনি স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত ভক্ত, ও জীবনে একটি কঠিন পরীক্ষার সময়ে সে মহাপ্রাণ মানুষটির কাছ থেকে কম আলো পান নি। তাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললাম:

"বলুন না তাঁর গল্প। শুনেছি আপনার নষ্ট কণ্ঠস্বর নাকি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—সত্যি ?"

গায়িকা (হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গাঢ়স্বরে) : তিনি ছিলেন অলোকসামান্য মানুষ। মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন ভাষায় ?

কাউণ্টেসদুহিতা : তাঁর সঙ্গে আপনার তো আমেরিকাতেই আলাপ—না ?

গায়িকা (আর্দ্রস্বরে) : হাঁ। কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে জাহাজে জাহাজে মাসতিনেক ঘুরেছিলাম। অবিস্মরণীয় সে তিন মাস আমার জীবনে।

আমি : কী সূত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় প্রথম ?

গায়িকা : সে সময়ে আমি বড় মনঃকষ্টে রয়েছি। আমার স্বামী ও মেয়ে পর পর মারা যান, ও আরও নানা রকম উপসর্গ ছিল। সেই সঙ্কট সময়ে হঠাৎ একদিন আমার একটি বন্ধু বললেন—'চলো তোমাকে একজন হিন্দু মহাত্মার কাছে নিয়ে যাই, তিনি হয়ত তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু গেলাম। ভাবলাম, দেখাই যাক্ না।

(সুর একটু নামিয়ে নিয়ে)

সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটা চেয়ারে। তিনি মাটিতে ব'সেছিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটল।

ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। কে এ অসভ্য ! আমি এতবড় এক-জন গায়িকা ! আমাকে কি না এতক্ষণ অপেক্ষা করায় !......

হঠাৎ স্বামীজি ব'লে উঠ্‌লেন : 'ব্যস্ত হয়ো না—আমি ধ্যান ক'রে

দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক্ কোনখানে ব্যথা ও কী প্রয়োজন। মুখে তোমার কাছে সবটুকু তো জানা যেতে পারে না।'

ভারি চম্‌কে গেলাম। খানিক বাদে স্বামীজি আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন ঢের কথা বললেন, যা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।

আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার!

তারপর তাঁর সঙ্গে কত জায়গায়ই না ঘুরেছি। আমার শত হৃদয়-ক্ষত কেমন যেন মুহূর্তে সেরে গেল তাঁর উপদেশে! তাঁর কথাই সর্বদা শুনতাম, তাঁর মাতৃসম্বোধনে হ'তাম মুগ্ধ—যদিও আমি তখন ছেলেমানুষ।

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এল।

কাউণ্টেস (আর্দ্রস্বরে): হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করাটা কী সুন্দর!

গায়িকা: কিন্তু এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি, মসিয়ে রায়,—ভাবতেও লজ্জা হয়—ধিক্কার দিতে সাধ যায় মানুষের মনুষ্যত্বকে। কী ক'রে পারে তারা! তাঁর সেই তিন মাসের সাহচর্যে উপদেশে আমি যা পেয়েছি, সারা জীবনেও পাইনি। য়ুরোপে আমেরিকায় এমন কত আর্তকেই যে তিনি আলো দেখিয়েছেন!······

ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাতা গায়িকা এমা কাল্ভে। সবাই জানেন—ওদের দেশে অপেরা গায়িকাদেরই নাম সবচেয়ে বেশি যেমন আমাদের দেশে ধ্রুপদীদের। মানে শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকাল স্বরশিল্পী বলতে বোঝায় অপেরা গায়ক গায়িকা। তাই এঁর নাম ওদেশে এখনো এত বেশি যে যদিও ইনি জন্মেছেন সেই কবে—রবীন্দ্র-নাথের জন্ম-সালে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু বছর কয়েক আগেও (প্রায়

৭৫ বৎসর বয়সে) আমেরিকায় ফের গিয়েছিলেন ও তেম্‌নি জয়ধ্বনির পুষ্পবৃষ্টি কুড়িয়ে এনেছেন। এঁর গুরু বিশ্ববিখ্যাতা Baronne *Marchesi যিনি জগতের সর্বত্র গান ক'রে এসেছেন সম্রাজ্ঞীর মতন।* কিন্তু শিষ্যার বিদ্যা ছিল গুরুমারা—তাই মাদাম কালভে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বিখ্যাত ফরাসি সুরকার মাস্‌নে (Massenet) এঁর অপ্সরোলাঞ্ছিনী কণ্ঠসুষমায় মুগ্ধ হ'য়ে এঁকে তাঁর Sappho, Herodiade প্রভৃতি বিখ্যাত অপেরায় শ্রেষ্ঠ গায়কী ভূমিকা দেন। মাত্র কুড়িবৎসর বয়সে ব্রুসেল্‌সে ইনি প্রথম অপেরায় নামেন—তাও বাঘা অপেরায়—গেটের ফাউস্টে—মার্গারেটের ভূমিকায়। তারপর দিনদুনিয়ায় কোথায় ইনি না গেছেন! রাণী নিরুপমাদেবীর একটি কবিতার ভাষায় এঁর সম্বন্ধে সত্যিই বলা যায় যে এঁর "ত্রিভুবন আছিল মুঠায়।" কারণও ছিল বুঝতে পারি। আমার সঙ্গে এঁর দেখা ১৯২৭ সালে—অর্থাৎ তখন এঁর বয়স পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখনও তাঁকে দেখলে সুন্দরী মনে হ'ত। ওঁর অল্পবয়সের চেহারা ছবিতেই দেখেছি। ঈষৎ গর্বিতা—কিন্তু পরমাসুন্দরী তো বটেই।

স্বামীজির বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বোধহয় তিনজন : নিবেদিতা, মিস্ ম্যাকলাউড আর ইনি—মাদাম কাল্‌ভে। স্বামীজির সঙ্গে পরে ইনি ভারতেও এসেছিলেন ও বেলুড়ে ছিলেন শুনেছি। এঁর কাছে শুনতাম স্বামীজির সঙ্গীতপ্রতিভার কথা।

এ তো গেল এঁর বাইরের দিকটার কথা। কিন্তু সেদিনকার সন্ধ্যাটা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে তার আন্তর গৌরবে। বিদেশে বিভূঁয়ে হঠাৎ এভাবে একজন এত বড় সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীর মনের পরশ পাব এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এতটা ঘনিষ্ঠতা কখনই হ'ত না যদি না আমাদের সঙ্গীত তাঁকে গভীর ভাবে

স্পর্শ ক'রে থাকত। আমাকে তিনি বার বার বলতেন: "কী অপূর্ব তোমাদের সঙ্গীত দিলীপ!"

কিন্তু আরো অভাবনীয় ছিল আমার কাছে এ ভক্তিমতীর ভক্তি। ভক্তি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি এ সে ভক্তি নয়। যে-ভক্তির পরশমণি আমাদের সত্তার প্রবণতার মোড় ফিরিয়ে দেয় সেই ভক্তি ছিল এঁর অন্তরে তাঁর দেবগুরুর প্রতি।

আজকের যুগ শ্রদ্ধা ভক্তির যুগ নয়—এ হ'ল "ইস্‌মের" যুগ। তাই একথা কল্পনা করা শক্ত, বটেই তো, কিন্তু তবু এ-ভক্তির অসামান্যতার কিছু আইডিয়া পাওয়া যাবে যদি একটু দরদ দিয়ে ভাবি স্বামীজির স্পর্শে এঁর জীবন কীভাবে বদ্‌লে গিয়েছিল। যেখানে ছিল আত্মধিক্কার—এসেছিল আত্মপ্রত্যয়। যেখানে ছিল জড়বাদ—এসেছিল আধ্যাত্মিকতার প্রতি আস্থা। যেখানে ছিল ভোগলালসা—এসেছিল অনাসক্তি। উনি কত দুঃখই যে পেয়েছিলেন জীবনে। বিশেষ ক'রে হৃদয়াবেগের দুঃখ। স্বামীজির কাছে যখন গিয়েছিলেন তখন তাঁর জীবনে এসে গেছে অবিশ্বাস (হায়রে যশমান!) চারদিকেই আঁধার এসেছে ঘনিয়ে। কিন্তু তবু সেই একটিবারের দেখায় গুরুশিষ্যার পরস্পরকে চিনে নেওয়া চিরদিনের তরে—সে-পরিচয় যে জন্মজন্মান্তরের—তাই না কালো হ'য়ে এল আলো, কাঁটা—ফুল। স্বামীজি তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন সে কবে—কিন্তু আজও সেকথা বলতে এঁর চোখ দুটি জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে বলতে বলতে যে জীবনে বাঁচার অর্থ তিনিই দিয়েছিলেন দীনা শিষ্যাকে। স্থূলহস্তাবলেপ এঁর স্মৃতিমন্দিরে স্বামীজির প্রতিমাকে এতটুকুও ম্লান করতে পারে নি। কী বিপ্লবই না এই রিক্ত সন্ন্যাসী ঘটিয়ে গিয়েছিল এই ধনাঢ্যা প্রতিভাময়ী তিলোত্তমার জীবনে!

তবু লোকে বলে মির‍্যাক্লের যুগ গত! আরো একটা কথা মনে হয়: য়ুরোপ থেকে হাল আমলে কয়েকটা বুলির আমদানি হয়েছে—যাকে মাদাম কালভের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় cliché—তাদের একটা হচ্ছে এই যে নরপূজা গুরুবাদ পৌত্তলিকতা এই সবই না কি ভারতের অধোগতির মূল! হায়রে, যে অনুভবগরিমা হৃদয়ের মন্দিরে কালজয়ী বহ্নিদ্যুতি জ্বালিয়ে রেখে যায় চিরদিনের জন্যে—যার স্পর্শে একটা জীবনের মূল বনেদের মধ্যে ধরে ভাঙন, গতিধারা যায় বদ্‌লে, খাদে ধরে কাঁচাসোনার রঙ, নিম্নমুখী মন মুহূর্তে দেখতে শেখে ঊর্ধ্বের স্বপ্ন, তাকে পূজা করার নাম কুসংস্কার—আর পদে পদে নিজের অন্ধতা অজ্ঞতা গ্লানিকুটিল জীবনের বাঁকা বিদ্রোহকে স্বকীয়তা ব'লে বরণ করার নাম মনুষ্যত্ব—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য! হবে!

* মাদাম কালভে বলেছিলেন আরো যে স্বামীজি তাঁর এম্‌নিতর কত অজ্ঞান ধারণার আঁধার নিত্যনিয়ত দূর করতেন তাঁর তাপস দীপ্তির রুদ্রবাণে। মনে পড়ে তাঁর আর এক মহীয়সী শিষ্যাকে স্বামীজির তেজোদীপ্ত তিরস্কার:

"You do not yet understand India! We, Indians, are Man-worshippers after all! Our God is man...... you may always say the Image is God: the error you have to avoid is to think God the Image."

("তোমরা আজও বুঝলে না ভারতকে। আমরা মনেপ্রাণে নরপূজক—সত্যিই। আমাদের ঈশ্বরও মানুষ আমাদের কাছে!...... প্রতিমাকে তুমি ঈশ্বর বলবে না কেন? নিশ্চয় বলবে: কেবল উল্টো বুঝো না—ঈশ্বরকে ভেবো না প্রতিমা।)

---

*My Master As I Saw Him—Nivedita.

পল রিশার

(Paul Richard)

"অন্তর-অতলে রাজে যে-সুন্দর, তারে বিনা আর
যুগে যুগে দেশে দেশে প্রার্থনীয় কী আছে ধরার ?"*

পূর্ব প্রবন্ধে আমার চেক বন্ধু ও তাঁর ফরাসী পত্নীর কথা উল্লেখ করেছি। এঁদের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় আমার বহুদিনের। ১৯২২ সালে সুইস্ লুগানোয় মহিলাদের আন্তর্জাতিক সভায় আমি নিমন্ত্রিত হই এ কথাও বলেছি ("দুহামেল" প্রবন্ধে) যেখানে রাসেলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই সভায় এঁরাও ছিলেন সভাসদ—আহুত। বন্ধুর নাম ভ্লাদিমির ভানেক—ইনি ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধে চেকো-স্লোভাকিয়ার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করেন। ফলে চেক জাতি স্বাধীন হবার পরে পান খুব ভালো চাকরি—ভাইস কন্সাল—পারিসে। কিন্তু সেটা পরে। ১৯২২ সালে বন্ধু প্রাগেই কাজ করতেন। তাঁর পত্নী মার্থা সে সময়ে নানারকম কাজ করতেন—রেড ক্রস রে, শান্তিসভা রে, নানা সামাজিক কাজ রে—কত কি। এঁরা মনে প্রাণে যাকে বলে আইডিয়ালিস্ট। বান্ধবী মার্থা ছিলেন খুব বড় ঘরের মেয়ে কাউন্টেস না মার্কুইস না ঐ ধরণের কি

---

* "Que cherche l'homme, si ce n'est le Dieu que dé̀jà il porte en lui-même ?" (Paul Richard—তাঁর L'Éther Vivant পুস্তকের ভূমিকা।)

শুনেছিলাম অবশ্য অপরের কাছে—তিনি নিজে এবিষয়ে কিছু বলতেন না, কারণ হয়ত এই যে তিনি বিদেশী ভ্লাদিমিরকে বিবাহ করেন প্রেমে প'ড়ে। ১৯২২শে আমরা তিনজনে একসঙ্গে ভেনিসে ছিলাম—পরে প্রাগে সঙ্গীতসভা করতে আহূত হ'য়ে এঁদেরই অতিথি হই। এঁদেরই আনুকূল্যে চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট মাসারিকের রাজবাড়িতে যাওয়া ঘটেছিল। ভারতে আমি যখন ফিরি ১৯২২শের শেষাশেষি তখন উভয়েই আমাকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ পত্র লিখতেন ও পরেও বরাবরই লিখে এসেছেন। ওদেশে এমন বন্ধু কমই মিলেছে। (ওদেশে কেন, এদেশেও এহেন দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ক'টাই বা হয়?)

১৯২৭শে মার্চ মাসে মার্সেল্‌সে নেমে ঠিক করি আগে নীসে যাব তারপর পারিসে—এই বন্ধুদম্পতির কাছে। নীসে একদিন সমুদ্রতীরে একাই বেড়িয়ে ফিরছি দার্শনিক ঢঙে, উদাস ভাবে—এমন সময়ে কাঁধে কার হাত ঠেকল। চম্‌কে ফিরতেই দেখি—বন্ধু ভ্লাদিমির, অদূরে গাড়িতে স্মিতমুখী মার্থা।

ছিলাম অন্য একটা হোটেলে,—উঠে এলাম তাঁদের হোটেলে। মার্থা তখন পারিসে আইন পড়ছে ও ক'ষে প'ড়ে পাশও করেছে কয়েকটা পরীক্ষা। ফাইনাল্‌ বুঝি তখনো বাকি ডেমক্লেসের তরোয়ালের মতন ঝুলছে মাথার উপরে। বন্ধুকেও ও-ই জোর ক'রে পড়াচ্ছে—যদিও বন্ধু আইন পড়তে একেবারেই নারাজ, কি করেন স্ত্রী এগিয়ে যায় এই ভয়েই ভালোছেলেমি—পিছু নেওয়া। মার্থা যে-উচ্চাশিনী—স্বামী আইনে ভালোরকম পাশ করলে রাজনৈতিক কাজে পদোন্নতি হওয়া অবধারিত কাজেই উভয়ে পরিণত বয়সে পুনর্মূষিক—বি-এল-এ স্নের সুরু। প্রশংসা না ক'রে উপায় আছে?—ওদের জাতটাই এম্‌নি—

কিছু না ক'রে থাকতে পারে না। কর্মিষ্ঠ তো বটেই, তার উপর দূরদৃষ্টি এদের অস্থিমজ্জায়। রাসেল সভ্যতার সংজ্ঞা দিয়েছেন Foresight: এরা সভ্য, বটেই তো। সংজ্ঞার সঙ্গে বাস্তব মিলে গেছে—মাপে মাপে dovetailing থাকে বলে।

এহেন দম্পতির ওখানে পল রিশারের অভ্যুদয়।

এখন আগে যেতে সুরু করতে হয়।

১৯২০ সালে পল রিশারের একটি বই প্রকাশিত হয়—ইংরাজিতে। তাতে শেষ অধ্যায়ের শিরোনামা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ১৯১৯ এ টোকিয়োর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলরিশার যে বক্তৃতা দেন এটি তারই ইংরাজি তর্জমা। এ অভিভাষণে রিশার বলেছিলেন যে চীনের বুদ্ধি, জাপানের সূক্ষ্মবোধ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই ত্রিবেণী সঙ্গমে জগতে বইবে এক নব আলোকধারা—যে-ধারায় জেগে উঠবে নীট্‌শের অহংস্ফীত অতিমানব না—"এশিয়ার দেবমানব, করুণার অবতার—নবজগতের স্রষ্টা।" "তাই"—বলছেন রিশার—"তোমরা দীক্ষা নাও এই ভাবিকালের দীক্ষায়—কারণ এশিয়ার মহামানবদের আবির্ভাব আসন্ন। এই যে দিব্য অবতার, এসেছে তারা যাদের খুঁজেছি আমি সারা জীবন—আর তাদের মুকুটমণি—শ্রীঅরবিন্দ অনাগতকালের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সেদিন এল ব'লে যখন তিনি তাঁর ধ্যানাসন ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন দিনের পূর্ণ আলোয় জগদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করতে।"

মুগ্ধকরী এ-ভক্তি। কিন্তু পলরিশারের মধ্যে শুধু ভক্তিই না, ছিল আরো অনেক কিছু। ছিল প্রতিভা, ছিল অন্তর্মুখিতা, ছিল বুদ্ধির অসামান্য ধারণাশক্তি, ছিল ব্যক্তিরূপের আকর্ষণ, ছিল দীপ্তিময় কান্তি। এ-দীপ্তি তাঁর লেখায়ও ফুটত। যথা—

"প্রাণলীলায় মাটি আলো হাওয়ার সাম্রাজ্যে মানুষ আর সব প্রাণীরই সরিক—কেবল বহ্নিসম্পদে সে একেশ্বর—অগ্নিরাজ।"

(Car si l'homme partage avec tous tes ètres l'empire de la terre, de l'eau, de l'air, lui seul est gardien de la flamme, maître du feu···Les Dieux [দেবগণ])

"যদি তিনি কিম্বা তাঁর কোনো অবতার এ দ্বন্দ্বের রাজ্যে নামেন তাহ'লে আস্তিক, নাস্তিক, আধ্যাত্মিক বস্তুতান্ত্রিকের শোরগোলের মধ্যে তাঁকে চিনে নেব কোন্ অভিজ্ঞানে!

"না, তাঁর অপরিসীম সহিষ্ণুতার অভিজ্ঞানে। তিনি কাউকেই ভর্ৎসনা করবেন না তো, বলবেন সবাইকেই:

'ওরে, তোরা কেন পরস্পরকে দূষিস তোদের ভেদের জন্যে? একটা ছোট্ট ইমারৎ তুলতে কত রকম মালমশলা লাগে বল দেখি? আর তোরা মনে করিস যে পরম সত্যের প্রাসাদ গড়া যাবে বিসদৃশ উপকরণের সহযোগ বিনা? এ সৃষ্টিতে যখন প্রতি উপাদান তার নিজের যথাস্থান খুঁজে পাবে তখন দেখবি তাদের মধ্যে কোনোই কলহ নেই।" ‡

এহেন মনীষীর দেখা পেয়েছিলাম নীসে। কিন্তু দেখে মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের ব্যক্তিরূপের শক্তি তাঁর লেখার চেয়েও বেশি। কথা বলার কী আশ্চর্য ক্ষমতা। ভঙ্গির কতরকম সুষমা! আর সর্বোপরি—কী রসিকতা! বাঙ্‌নৈপুণ্যে ফরাসি জাতি জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু এরকম রসিকতা ওদের মধ্যেও বিরল। দুএকটা দৃষ্টান্ত দেই।

পলরিশার মুখে মুখে ছোট ছোট এপিগ্রাম জাতীয় প্রবচন রচতেন। প্রকৃতিকে আস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মতনই ভাগবত, ভক্ত এমন কি ভগবানকে নিয়েও হাসাহাসি করতে তাঁর বাধত না। অথ

ভক্তকে নিয়ে—Dimanche : jour ou Dieu s'étant reposé, ses fidéles l'en remercient.

রবিবারে প্রভু লভিলা বিরাম—হ'ল না সেদিনে নূতন সৃষ্টি :
তাই তো সেদিনে করিলা ভক্ত অঝোরে ধন্যবাদের বৃষ্টি।

ভাগবত বিবেককে নিয়ে :

La conscience est un juge intägre qui ne tourmente que les bons et qui laisse courir les mauvais.

বিবেক যে ন্যায়পরায়ণ কাজি—করে দংশন শুধু সুজনে,
দুর্জনে দেয় নিষ্কৃতি—তাই চিরজয় তার ভুবন ভনে।

ভগবান্‌কে নিয়ে :

Par ennui Dieu créa le monde, par honte depuis il se cache.

বেকার কর্তা ঝোঁকের মাথায় সহসা করি' এ জগত সৃষ্টি
সরমে হলেন পর্দানসীন—কেমনে সহেন লোকের দৃষ্টি ?

বাঁশি-শোনার অন্তরীক্ষ' থেকে এবার চোখে-দেখার মর্তভূমিতে অবতরণ করার সময় এল।

নীসে এসে খবর পেলাম তিনি ওখানে।

খবর দিলাম।

পরদিনই সন্ধ্যাবেলা তাঁর আবির্ভাব সটাং আমাদের হোটেলে। আমরা একবারও ভাবিনি যে না ব'লে ক'য়ে তিনি সোজা আমাদের ওখানে এভাবে হানা দেবেন। তখন আমরা (ত্রয়ী) হোটেলের ভোজনাগারে। তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালাম বন্ধুবান্ধবীর প্রশস্ত ঘরে।

দিন কয়েক গল্পের কী তোড়ই যে ছুটল! ভাগ্যে কিছু কিছু *টুকে রেখেছিলাম!* তবু ব'লে রাখা ভালো ডায়ারি থেকে যে সব নমুনা এখানে দিচ্ছি সে সব খুবই অসম্পূর্ণ হবে। কারণ পল রিশারের কথা রোলাঁ। রাসেল জাতীয় নয়—ধারেই তিনি বেশি কাটেন ভারে নয়। এবিষয়ে তিনি অনেকটা রবীন্দ্রপন্থীই বলতে হবে।

মার্থা অল্প কথাবার্তা ক'য়েই কিন্তু তাঁকে বেশ চিনেছিল। বলেছিল লোকটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ভাবুক সবই ঠিক কিন্তু বিপদে পড়লে সে কখনো ওঁর কাছে যাবে না। ভ্লাদিমির ওকে তিরস্কার করত স্ত্রীজাতি বড় চট্ ক'রে বিচার করে ব'লে, কিন্তু বলা বাহুল্য সেটা ওদেশ—ভর্তার কথায় ভার্যার মত একচুলও বদলাত না।

কিন্তু সে যাই হোক আমাদের মধ্যে গল্প খুব জমজমাট হ'ত রোজই। কারণ ভ্লাদিমির স্বল্পভাষী হ'লেও মার্থা ছিল খুবই গল্পালাপিনী। পল রিশারের বক্তব্য শুষে নিতে ওরও আগ্রহের কমতি ছিল না। আর বলাই বেশি এমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী রসিকা শ্রোত্রী পেয়ে পল রিশার দুঃখিত হননি। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর মিল গোড়ায়। বাস্তবিক আমরা তিনজনায় প্রায়ই বলাবলি করতাম এই দুটি মনস্বীর মধ্যে গুণাগুণের মিল কী আশ্চর্য! অগুণের বিশ্লেষণ করা শোভন নয় তাই গুণের কথাই বলি। উভয়েই দেহে রূপবান্, মনে মনস্বী, প্রাণে রসিক, হৃদয়ে সুকুমার। উভয়েই কল্পনায় সূক্ষ্মচারী, ঝোঁকে কবি অথচ বুদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক, বিশ্লেষণপরায়ণ; ভিতরে অত্যন্ত অভিমানী অথচ বাইরে অদ্ভুত সংযমী; ভিতরে স্বপ্নালু অথচ বাইরে তীক্ষ্ণদর্শী। উভয়েই চিন্তায় নবপন্থী, জীবনযাপনে সৌন্দর্যপন্থী, আলাপে রসাল, হাস্যপরিহাসে চমৎকার, ভাবে দার্শনিক, বিলাসে নিত্যনূতন, উচ্ছ্বাসে মুগ্ধকর, স্বভাবে রমণীরমণ, প্রতিভায়

অনন্যতন্ত্র। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ পল রিশারের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন? জাপানে কবি লিখেছিলেন:

"When I met Monsieur Richard in Japan,I became more reassured in my mind about the higher era of civilization than when I read about the big schemes *which the politicians are formulating for ushering* the age of peace *into the* world .....when *gigantic* forces of destruction were holding orgies of fury, I saw this solitary young Frenchman, unknown to fame,......face beaming with the lights of the New Dawn and his voice vibrating with the message of New Life, and I felt sure that the great To-morrow has abready come, though not registered in the calender of the statesmen."

কেবল রিশার ছিলেন পূর্ণভাবে আত্মসচেতন। তাই হয়ত সময়ে সময়ে আত্মগ্লানিতে তাঁর হৃদয় আসত ছেয়ে। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে। জিজ্ঞাসা করলাম রবীন্দ্রনাথকে জানেন কিনা।

রিশার: বিলক্ষণ! শান্তিনিকেতনে তো ছিলামই, তাঁর সঙ্গে পরে জাপানেও দেখা শুনো হ'ত।

মার্থা: কেমন লাগল তাঁকে?

রিশার: কবি বটে। গন্ধর্ব। রূপদেব। কেবল—কি জানো? জীবনে কুরূপ কুশ্রীর সংস্পর্শে বড় বেশি আসেন নি যে।

দিলীপ: মন্দ কি?

রিশার: থাকতে পরলে মন্দ কি? তবে জীবনের তামসের দিকটার, আসুরিক দিকটার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে জগতে বলীয়ান্

হওয়া যায় না এই যা। বোধকরি এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ কর্মজগতে এত দুর্বল—চরিত্রের প্রভাব ওঁর কই ?

দিলীপ: কর্মজগতে সবল বলতে আপনি কী বোঝেন একটু বলবেন খুলে ? মানে, আপনার মতে সবল মানুষ কে কে! দু একটা নমুনা দিলেনই বা।

রিশার: কেন, গান্ধি—অরবিন্দ ?

ভ্লাদিমির: গান্ধি সম্বন্ধে ঠিক কী মনে হয় আপনার বলুন না।

রিশার: আমেদাবাদে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই বাধত। শক্তিমান্ পুরুষ বৈ কি মান্‌তেই হবে। মনে আছে সময়ে সময়ে অত মিলে মিশেও ধাঁধা লাগত। তাঁকে যেন ঠিক চিনতে পারিনি মনে হ'ত। খটকাও লাগত বৈ কি: ভাবতাম, সত্যিই কি এই কৌপীনধারী কৃশকায় ক্ষীণবল মানুষটিই আজ ভারতের একছত্র অধীশ্বর! কিন্তু—

মার্থা: কী ?

রিশার: গান্ধির নেই কল্পনা। বড একরোখা, সংকীর্ণ। ঐখানে রবীন্দ্রনাথ জিতেছেন।

ভাদিমির: একরোখা বলতে কী বুঝছেন বলবেন ?

রিশার (হেসে): শুনুন তবে একটা কথা বলি চুপি চুপি। যখন ননকোঅপরেশন বইছে খুব জোর, তখন অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে একদিন আমাকে বললেন—দেখে নিও গান্ধি তাঁর একরোখা অহিংস'র আইডিয়ার পায়ে দেশকে বলি দেবেন।

মার্থা (খুশি): একথাটা আমার খুব মনে ধরেছে।

দিলীপ: কিন্তু আপনার মতটা কী একটু প্রাঞ্জল ক'রে বলার সময় এল।

রিশার : আসল কথাটা এই যে আসুরিক আখড়ায় আধ্যাত্মিক হ'তে যাওয়াটা যেমন খাপছাড়া,আধ্যাত্মিক আখড়ায় আসুরিক হওয়ার বেলায়ও ঠিক তেম্‌নি, বুঝলে না? দুটো ক্ষেত্র আলাদা, আলাদা ক'রে দেখলে হয়ত আর একটু পরিষ্কার হবে আমার বক্তব্য। পেরেক মাটিতে বসাতে গেলে হাতুড়িই সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয়—নয় কি? সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি খাটাতে *যাওয়াটাকে বোকামি ছাড়া কী বলা যাবে? কিন্তু একজন বুদ্ধিমান* মানুষকে দিয়ে জোর খাটিয়ে কাজ হাসিল ক'রে নেওয়ার চেয়ে বেশি সহজ হচ্ছে তার বুদ্ধির কাছে আপীল জানিয়ে তাকে কর্মী ক'রে তোলা, যেহেতু সেটা হচ্ছে মনঃশক্তির এলাকা। তাই গান্ধিকে আমি বলতাম জীবনে শিবই তো একমাত্র শক্তিধর নন, রুদ্রও রয়েছেন নিজের সহজ প্রতিষ্ঠায়, তাঁকে নেই বললেই তো আর তিনি উবে যাবেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রটাই হ'ল আসুরিক, ওখানে বাঘে কুমীরে লড়াই, শেয়ালে শেয়ালে কোলাকুলি, ওখানে ধম্মো! রামঃ।

দিলীপ : কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন না যে আসুরিক জগতেও আসুরিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিকতাই অনেক সময়ে বেশি কাজ দেয়?

রিশার : করি। কেবল বলি যে এ শক্তির ফল রাতারাতি ফলে না, হাতে হাতে দেখানো যায় না।

মার্থা : মানে?

রিশার : জগতে খৃষ্ট প্রমুখ হাজার হাজার খ্যাত ও অখ্যাতনামা মার্টার প্রাণ দিলেন কেন? হত্যাকারীর অত্যাচার রাতারাতি কমবে ব'লে কি? তাঁরা এতটা অদূরদর্শী ছিলেন না। অথচ অত্যাচার কম্‌ল না ব'লেই বলা যায় না যে তাঁদের বৃথা প্রাণ দেওয়াই সার। সত্যের জন্যে লড়াইয়ে তাঁরা যে নিজেকে আহুতি

দিলেন তার যজ্ঞতেজ জমা হ'য়ে রইল না কি মানুষের বুকে? কিন্তু যখন জমা হ'তে থাকে তখন কাজ হয় না। আগে বারুদপর্ব—পরে —অনেক পরে লঙ্কাকাণ্ড—এই আর কি। এই হিসেবে দেখতে গেলে অহিংসার শক্তিও একটা প্রত্যক্ষ শক্তি বলতে হবেই তো।

দিলীপ: তাহ'লে মহাত্মাজিকে দুষছিলেন কেন?

রিশার: দুষি নি ঠিক। আমি বলতে চেয়েছিলাম—গান্ধি তাঁর অহিংসার কাজ যেভাবে হবে ভাবছেন জৈবলীলায় সেভাবে কাজ হয় না—হ'তে পারে না। তাছাড়া গান্ধির অহিংসার মূল দীক্ষাটাই ভুল। তিনি ভাবেন ওর শক্তির ফল প্রত্যক্ষ হবে দেখতে দেখতে। কিন্তু ধরো তিনি যদি বলতেন প্রকাশ্যে যে তিনি অহিংসাব্রতী হয়েছেন রাতারাতি দেশোদ্ধার করতে না—ভবিষ্যতে এর তেজঃশক্তি জমিয়ে রাখতে—যাতে ভাবিকালে একদিন সে জ্ব'লে ওঠে—তাহ'লে কি লোকে তাঁর অহিংস অসহযোগে দলে দলে সাড়া দিত মনে করো? মানুষ—অন্তত পনের আনা মানুষ—চায় নগদ বিদায়। কবে কোন সুদূরে আজকের কর্মবীজের ফসল ফলবে ভেবে সে বীজ বুনতে এগোয় না।

তাই আমি যখন একবার গান্ধি ও তিলকের তুলনা ক'রে বলে-ছিলাম যে তিলক যেমন দেশের জন্যে তাঁর আইডিয়াকে ছাড়তে রাজি ছিলেন, গান্ধি তেমনি আইডিয়ার জন্যে দেশকে ছাড়তে রাজি—তখন অনেকেই মুখ ভার করেছিলেন।

দিলীপ (হেসে): কেন?

রিশার (হেসে): উল্টো বুঝে—আর কেন? লোকে ভাবল আমি এ-তুলনা করছি কোনো দুরভিসন্ধিবশে—দুজনের একজনকে ছোট করতে চেয়ে—যদিও কাকে যে ঠিক ছোট করলাম ওরা ঠাউরে

উঠতে পারে নি ব'লে কী ভাবে রাগ করা উচিত তাও ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু সে যাহোক্, আমি সত্যিই তুলনা করবার কুমৎলবে কথাটা বলিনি। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম দুজনেই বড়, ব্যথা বরণ করার দিক থেকে।

ভ্লাদিমির : কি রকম?

রিশার : তিলকের ম'ত স্বভাবদার্শনিকের কাছে আইডিয়ার দাম খুব বেশি এ কথাটা আগে বেশ ছ'কে নিন মনে। তাহ'লে বুঝতে পারবেন সেই আইডিয়াকেও দেশের জন্যে ছাড়তে তাঁকে কত বেজেছিল—কেন না পলিটিক্সে পদে পদে আইডিয়াকে ছেড়ে রফায় আসতে হয়—নৈলে ও-আখড়ায় কাজ করা অসম্ভব। তেম্‌নি যে-গান্ধি দেশের জন্যে হাজারবার জেলে গেছেন—পরিবার ধন গৃহ সুখ স্বাস্থ্য কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি—চৌরিচৌরার একটা তুচ্ছ দাঙ্গার জন্যে অহিংসার আইডিয়ার খাতিরে সেই দেশকেও তাঁর ছাড়তে হ'ল—এ-ই কি কম ব্যথা ভাবেন? তবে অপরের ব্যথা আমরা কতটুকু কল্পনা করি বলুন! মানুষের ধর্ম দরদ নয়—বিচার।

(খানিকক্ষণ নিশ্চুপ)

দিলীপ : আর অরবিন্দর সম্বন্ধে?

রিশার : সারা দুনিয়াটা ঘুরেও অমনটি আর চোখে পড়ল না।

মার্থা : কি রকম? কি রকম?

রিশার : আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি মাদাম যে অরবিন্দ আজ একবার যদি বেরোন তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে, তাহ'লে তিনি শক্তির উদ্বেলতায় অভ্রভেদিতায় দেখতে দেখতে সবাইকে ছাড়িয়ে হবেন দেশের মাথা। কিন্তু এত বড় প্রতিষ্ঠা এত বড় প্রলোভন যে তিনি হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললেন—আর ঠেললেন

এমন একটা আদর্শের জন্যে যা বলতে মনে হয় পাগলামি, শুনতে মনে হয় হেঁয়ালি—এইখানেই তাঁর মহিমা ও চুম্বক।

দিলীপ : কিন্তু আমাদের দেশে কত যোগী বৈরাগীই তো এমন সর্বত্যাগী দেখা যায়।

রিশার : যায়। কেবল মনে রেখো তারা যদি ত্যাগী না হ'ত তাহ'লেই যে মস্ত ভোগী হ'তে পারত এ কথা সত্য নয়—হোমরাও-চোমরাও হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অরবিন্দ কী না হ'তে পারতেন? তিনি একাধারে কবি, সমালোচক, দার্শনিক, দেশনায়ক, ধ্যানী, কর্মী, স্বপনী, ত্যাগী। এতবড় বিরাট আধার আর আমার চোখে পড়ে নি এবং জগতটাকে আমি নিতান্ত কম দেখিনি নেড়ে চেড়ে। তাছাড়া আমি হাড়ে হাড়ে জানি দেহের মনের প্রাণের সমস্ত শক্তি একটা সুদূর আদর্শের জন্যে একমুখী রাখা কী প্রাণান্তিক কষ্ট। এ সম্ভব হয় কেবল তাঁর পক্ষে যিনি নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ বশে এনেছেন। এ মুখের কথা নয়।

মার্থা : তা তো বুঝলাম। কিন্তু তাঁর এই সুদূর আদর্শটি কিসের?

রিশার : মানুষকে আর মানুষ থাকলে চলবে না। তার মানুষী শক্তির লীলা খেলা চলেছে বহুদিন—এর কাজও ফুরিয়েছে তার মানবতার বিকাশে। এখন তাকে হ'তে হবে অতিমানব—বা দেবতা যে নামই দাও।

মার্থা : যে নামই দিই?

রিশার : মানে—নাম নিয়ে কথা নয়। কথা হচ্ছে যে জগতে যে-শক্তি এতদিন মানুষকে চালিয়েছে তার চেয়ে উর্ধ্বতর স্তরের শক্তির অবতরণ চাই যে তাকে আজ চালাবে তার যাত্রাপথে।

মার্থা : কিন্তু এ কি সম্ভব ?

রিশার (হেসে) : সম্ভব ? এ না-হওয়াই অসম্ভব। প্রকৃতির যে-অব্যর্থ তাড়নায় ধাতু উদ্ভিদ পশু শেষটায় মানুষের কোঠায় এসে ভিড়লো—সেই তাড়নাই আজ জীবের বিশ্রামের অন্তরায়। কাজেই তাকে এগুতেই হবে উপায় নেই—যতক্ষণ না সে এর পরের পান্থশালায় পৌছয়। তারই নাম অতিমানব বা divinisation বা মানবী প্রকৃতির রূপান্তর।

ভ্লাদিমির : এ-রূপান্তরের ফল কী দাঁড়াবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রিশার : একটা নতুন শক্তির খেলা সুরু হবে জীবনের ক্রমবিকাশে। এ-খেলা অনেকদিন ধ'রে বন্ধ আছে পাকা খেলোয়াড়ের অভাবে। সেই খেলোয়াড়কেই আজ গ'ড়ে তোলার পালা। সেই জন্যেই শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা। তাই আবার বলি শুনুন : যে-শক্তি জড়কে উন্নীত করল উদ্ভিদের আচ্ছন্ন বোধের স্তরে, উদ্ভিদকে নিয়ে এল পশুর প্রাণস্তরে, পশুকে টেনে তুলল মনঃশক্তিমন্ত মানুষের স্তরে, সেই শক্তিই আজ মানুষকে তুলবে অতিমানবের কোঠায়—সেখানকার বাসিন্দা মানুষ থেকে হবে ঢের উঁচু—যত উঁচু মানুষ আজ পাশবিক স্তর থেকে।

মার্থা (আশ্চর্য) : কিন্তু এ কি সত্যিই সম্ভব ?

রিশার : শুধু সম্ভব বললে কিছুই বলা হবে না মাদাম, বলতে কি—জগতে আজ যে এত যুদ্ধবিগ্রহ-হাহাকার-অশান্তি-বিপ্লবের ভূমিকম্প এ সবই হ'ল আসলে সেই অতিমানবেরই সূচনা। অন্যভাষায়, আজকের মানুষের যন্ত্রণা হ'ল প্রকৃতির প্রসববেদনা অতিমানবের জন্মের জন্যে।

ভ্লাদিমির : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে মসিয়ে রিশার !

রিশার: মনে আছে ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ সুরু হবার মাস দুই আগে অরবিন্দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে জগতে সব বিকাশের পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে—মানুষ যাপন করছে যেন এক অজ্ঞাতবাস—কারাজীবন। আমি বললাম: "তাহ'লে উপায়?" অরবিন্দ বললেন: "যুদ্ধ, শ্মশান, হাহাকার ধ্বংস—নৈলে নতুন সৃষ্টি হবে না।" আমিও ব'লে উঠলাম: "ঠিক্, যুদ্ধই তো চাই।" দুমাস বাদেই কেঁপে উঠল মেদিনী মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে।

মার্থা (ক্লিষ্ট কণ্ঠে): কিন্তু এতে কি ভালো হ'ল মসিয়ে? য়ুরোপের হাহাকারে যে সভ্যতা যায় যায়!

রিশার: কিন্তু ওদিকে যে এশিয়া উঠল ব'লে সেটা ভুলছেন কেন? রুষ চীন একজোট হচ্ছে: ভাবুন তো এর সম্ভাবনা।

ভ্লাদিমির: কিন্তু এতেই কি ফল ভালো হবে মনে করেন?

রিশার: আপনারা জগতের মানচিত্রে একটা একটা জাতকে আলাদা আলাদা ধ'রে খণ্ড খণ্ড ভাবে বুঝতে চাইছেন কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ। কিন্তু এ তো ঠিক্ দেখা—ঠিক বোঝা নয়। দেখতে হবে কোন্ কোন্ শক্তি কী ভাবে নিজের নিজের পরিধি বাড়াচ্ছে। দুনিয়াটার গতিক দেখলে বুঝবেন যে য়ুরোপের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে—l'Europe est condamné—অর্থাৎ একটা বড় সভ্যতার অবসান হ'তে চলেছে।

মার্থা: অবসান?

রিশার: নয়? য়ুরোপে ঘরে ঘরে আজ কী অশান্তি দেখছেন না? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে? সবাই জানে যুদ্ধে ধ্বংস নিশ্চিত—তবু সবাই বাড়াচ্ছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বারুদ বিমান। যদি লক্ষ্য হয়

আকাশ তবে মাটি খুঁড়ে কূপের দিকে এগুনোয় সুফল ফলবে মনে করেন কি ?

ভ্লাদিমির : আমরা কি তাই করছি ?

রিশার : তাছাড়া কী বলুন ? গাছকে ফল দিয়ে বিচার করলে কি অন্য কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব ? গত যুদ্ধের পর দেখছেন কী—বলুন তো ? না, অর্ধেক য়ুরোপ ঝেঁটিয়ে সাফ হ'য়ে গেছে—la moitié d'Europe est balayée—নয় কি ? আর একটা যুদ্ধ বাধলেই বাকিটুকু সাফ হ'য়ে যাবে। তারই তো পথ চেয়ে রয়েছি।

ভ্লাদিমির : পথ চেয়ে ? মানে, এটাই বাঞ্ছনীয় ?

রিশার : বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কথা হচ্ছে মানুষকে চলতে হবে। সে না পারে অতীতের দিকে তাকিয়ে কাল কাটাতে, না পারে বর্তমানকেই আঁকড়ে ধ'রে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করতে। তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে যে ভিতরের ও বাইরের হাজারো শক্তি—সাধ্য কি সে থেমে থাকবে ? তাই পথচলায় তাকে বার বারই উঠতে নামতে হয়। তাছাড়া গহ্বর না থাকলে শিখর-দুরাশী হবার গৌরবই বা কোথায় বলুন তো ! তাই আমি বলি যে যখন য়ুরোপের অধোগতির পালাই এল তখন আর কী হবে তাকে টানা-টানি ক'রে দুদিন জীইয়ে রেখে ? বরং তাকে দাও ঠেলে ঐ গহ্বরেরই মুখে। নৈলে শিখরের পালা আসতে দেরি হবে এই মাত্র—তার অধঃপতন ঠেকানো যাবে না। তবে সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপ বেশ হুড়মুড়িয়ে চলেছে পড়তে—তাই তো ওদিকে এশিয়াও আবার উঠতে শুরু করেছে। অতীত গৌরবকে কোলে ক'রে ব'সে থাকলে তো নিস্তার নেই মনামি !

* * * * *

বলাই বেশি রিশার আসাতে আমাদের আসর বিলক্ষণ সরগরম হ'য়ে উঠল। উনি দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি বড় অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিলেন—যোগাশ্রম স্থাপনা করতে। সেখানে কয়েকজন যোগার্থীও এসেছিল। কিন্তু টেঁকেনি। রিশার বুঝতে পারেননি এহেন আশ্রমের দায়িত্ব, ঠাহর পাননি নিজের শক্তি। তাঁর ব্যক্তিরূপের ও বাক্‌চাতুর্যের মোহে প'ড়ে আসত শিষ্য শিষ্যারা—কিন্তু সব ছেড়ে নির্জনবাস তা আবার অলক্ষ্যের আবাহনে—এ যে কী দুরন্ত সাধনা তার পরিচয় তাঁরা পেলেন দেখতে দেখতে। তবে সেসব কথা যাক্—বলি এখানকারই কথা।

এখানে—নীসে—রিশারের এক শিষ্যার সঙ্গে আলাপ হ'ল। রিশারই তাঁর ওখানে নিয়ে গেলেন আমাকে। শিষ্যার নাম মাদাম ক্রেস্পেল। বড় লাবণ্যময়ী মেয়েটি। অপরূপ সুন্দরী বলা যায় না—কিন্তু মুখখানিতে যেমন মাধুর্য তেম্‌নি কি বুদ্ধির দীপ্তি! আর সবার উপরে একটা আভা যেন থর থর ক'রে কাঁপছে—যার নাম দেওয়া যেতে পারে স্বপ্নবাদ। মেয়েটি রিশারকে ভক্তি করত গভীর-ভাবে। আর সে ভক্তির মূলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 'পরে অটল-শ্রদ্ধা। ওর মার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ইনি থিয়সফিস্ট।

ভারতীয় গান শুনে এঁরা উচ্ছ্বসিত। একদিন সমুদ্রতীরে দেখা মাদাম ক্রেস্পেলের সঙ্গে। বললেন: "তোমাদের সুর কানে কেবলই রণিয়ে উঠছে দিলীপ।" সঙ্গীতের মাধ্যস্থ্যে অন্তরঙ্গতা হয় এম্‌নিই সহজে। পরে পারিসে এসেও ওর সঙ্গে এ-ঘনিষ্ঠতার জের টেনেছিলাম যতদিন সেখানে ছিলাম। সেখানে একদিন কিন্তু বড় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। মানুষের জীবনে কত কীই যে ঘটে! বলিই না কেন ঘটনাটি, কারণ এটি বলার ম'ত।

মাদাম ক্রেস্পেলের ভাবভঙ্গি দেখে কোন দিনও মনে হয় নি ও কখনো উত্তেজিত হ'তে পারে। স্বভাবে এমন শান্ত মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি, বিশেষ ফ্রান্সে। চটুলতা প্রগল্‌ভতার লেশও নেই। এক হিসেবে ও মার্থার চেয়েও সুধীরা। কিন্তু সেদিন একটা কাণ্ড হ'ল। কাণ্ডটা বলতে সামান্য শোনাবে কিন্তু চোখের উপর যারা দেখল তাদের কারুর কাছেই সামান্য মনে হয় নি।

সেদিনও মাদাম ক্রেস্পেল তাঁর স্বামী মসিয়ে ক্রেস্পেল, মাদাম ক্রেস্পেলের মা, পল রিশার ও আরও কয়েকটি ভারতীয় বন্ধুকে আমি quartier Latin-র একটি রেস্তরাঁয় সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছি আমি মাঝে, ডানদিকে মাদাম ক্রেস্পেল, বাঁদিকে তাঁর মা, সামনে—টেবিলের ওধারে মসিয়ে ক্রেস্পেল, আর ভারতীয় বন্ধু কয়জন ছড়িয়ে ব'সে। পল রিশার একটু দেরি ক'রে এসে হাজির। ক্রেস্পেল-জননীর পাশেই বসলেন তিনি। জননী বললেন হঠাৎ (ফরাসি ভাষায়ই অবশ্য): "তোমাকে এত অস্থির মনে হচ্ছে কেন?" —"অস্থির! সে কি?"—"আমাকে সে অস্থিরতার ঢেউ এসে লাগছে যে।" বলতেই রিশার বললেন: "তাহ'লে আমি চললাম।" ব'লেই তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রমণ—কেউ বাধা দেবার আগেই।

আমরা তো অবাক্। মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল: "তুমি ওঁকে কী বললে?—রূঢ় কিছু?" মা-ও অবাক্: "কই, না তো।" একথা সেকথা। হঠাৎ মেয়ে উঠে কাঁদ কাঁদ হয়ে বেরিয়ে গেল। স্বামীও তার পিছু নিলেন।

আমাদের মধ্যে গভীর অস্বস্তি এল ছেয়ে। খানিক বাদে পল রিশার ফিরে এলেন, কিন্তু একা—ক্রেস্পেল দম্পতির দেখা নেই। মুখে তাঁর ঘনঘটা। একটু বাদে স্বামী এসে পল রিশারকে ফিশ ফিশ্ ক'রে

বললেন যে তাঁর শিষ্যা অসম্ভব কাঁদছেন—হিস্‌টিরিয়ার যোগাড়। পল রিশার ও আমরা উঠে গিয়ে তাঁকে সুস্থ ক'রে এক ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিয়ে তবে এই ড্রামার যবনিকাপতন। শান্তিময়ী মেয়ের এইটুকু ঘটনায় অতখানি বিচলিত হওয়া—এ যদি স্বচক্ষে না দেখতাম তো কল্পনাও করতে পারতাম না—বিশেষত এতগুলি সন্থ পরিচিত অতিথির সাম্‌নে। 'Truth is stranger than fiction'—একশোবার।

কিন্তু আশ্চর্য! পল রিশার ফিরে তেমনিই উজ্জ্বল ঢঙে কথাবার্তা চালালেন সমানে। কেবল লক্ষ্য করলাম—থেকে থেকে একটু যেন অন্যমনস্ক মতন হ'য়ে পড়েছিলেন—কিন্তু সেও ক্ষণতরে।

*　　*　　*　　*　　*

ড্রামার রোমান্স ছেড়ে নীসের বাস্তব রাজ্যেই ফিরে আসার সময় হ'ল।

রিশারকে আমরা তিনজনে নিমন্ত্রণ করেছি।

তিনি যথাসময়ে এসে হাজির।

কথা বলবেন ভাবতেই মন খুশি আমাদের। বচনতুব্‌ড়ির কত রকম ফুলই যে কাটবে তাঁর হিল্লোলে কল্লোলে ভাবতেও শিহরণ জাগে যে! তাছাড়া বাস্তবিক ওদেশে ওধরণের আড্ডায় কী যেন একটা বেপরোয়া গতিবেগ আছে। ওদের হাওয়ার গুণ হয়ত। সবই চলে রঙ ফলিয়ে, ঢেউ খেলিয়ে—তর্‌ তর্‌ ক'রে।

*　　*　　*　　*　　*

রিশার নিরামিষাশী। টেবিলে কাঁটা চামচ ধ'রেই ঠাট্টা সুরু। ব্যঙ্গের টার্গেড আমিষ। বার্ণার্ড শর সঙ্গে তিনি একমত—"পশুর শবদেহ" খায় মানুষ কী ক'রে যে—

দিলীপ (কিন্তু কিন্তু ক'রে): কিন্তু আজকাল তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে—

রিশার: ও-ধরণের যুক্তি অচল। প্রাণ থাকা-না-থাকা নিয়ে তো কথা নয়। কথাটা হচ্ছে হননটা হচ্ছে কী ভাবে—স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায়, দায়ে প'ড়ে না গায়ে প'ড়ে? পথ চলতে, হাত নাড়তে, নিশ্বাস নিতে তো প্রত্যহ হাজার জীবাণু আমরা বধ করছি। সেখানে দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে না—কারণ বাঁচতে হবে স্বতঃসিদ্ধ। তাই যেখানে বাঁচা মানে অনিচ্ছায় অজান্তে হত্যা সে হনন গায়ে বাজে না। কিন্তু তাই ব'লে কি এই সিদ্ধান্তই বাহাল হ'ল যে বাঁচতে হ'লে যে-জন্তু হাতের কাছে পাও হত্যা ক'রে ছাল ছাড়িয়ে, পুড়িয়ে, ভেজে খাও? বর্বরতা বলে আর কাকে? শুধু শব নয় পশুর শব?

দিলীপ (ঠাট্টার ভঙ্গিতে): তবে কি বলতে চান যে আমাদের পক্ষে মানুষের শব আহার করাটা বেশি শ্রেয়?

রিশার (তৎক্ষণাৎ): একশোবার। মানে পশুর শব খাওয়ার চেয়ে মানুষের শব খাওয়াটা কম বীভৎস।

মার্থা (ফরাসি স্কন্ধকুঞ্চন সহকারে): এ আপনার বিচিত্র ঠাট্টা।

রিশার (হেসে): ঠাট্টা নয়—যুক্তি।

ভ্লাদিমির: শুনি তার ঝংকারটা।

রিশার (চোখে দুষ্ট চাহনি): যাকে জীবদ্দশায় শ্রদ্ধা করি, আলিঙ্গন করি, চুম্বন করি তার মাংস যদি খেতে যাই তবে ভয়ঙ্কর হ'তে পারে—কিন্তু লজ্জাকর না। কিন্তু যে-জন্তুকে আমরা জীবদ্দশায় চলি এড়িয়ে, পারৎপক্ষে যার ছায়া মাড়াই না, এমন কি যার নামে আমরা মানুষকেও গাল দিই cochon (শূকর) ব'লে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে না যেতে তাকে শুধু গ্রহণ করা নয়, রসনায় মাখামাখি

ক'রে রক্তে চালান ক'রে মজ্জাগত করা—এ-হেন স্বতোবিরোধ এক দেবত্ববিলাসী পশ্বাধমেই সম্ভব। তবে বলে না les extrêmes se touchent? (একই বস্তুর দুই প্রান্তের ছাড়াছাড়ি হ'য়েই গলাগলি হয়)? আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস শেষের সেদিনে পশুরা যখন হানা দেবে l'Homme de Douleur (ব্যথার প্রতিমা = যিশু)-এর দরবারে তখন আমাদের এই নিরপেক্ষতার সাফাইও থাকবে না যে আমরা স্বধর্মে সব্যসাচী—পশুমাংসও খাই—নরমাংসও খাই। (থেমে): আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ব্যথার ব্যথী—তাই প্রতি কশাইখানার পাশ দিয়ে যেতেই টুপি খুলি।

ভ্লাদিমির (হেসে): একথা মান্‌ব যে পশুমাংস খাওয়াটা অসুন্দর।

মার্থা: তা সত্যি। সাধে কি টলষ্টয় বলতেন—পরে এমন দিন আসবেই আসবে যখন মানুষ পশুমাংস খেতে ঠিক্ তেম্‌নি জুগুপ্সা অনুভব করবে যেমন সে আজ করে নরমাংস খেতে।

এম্‌নি নানা সময়ে নানা কথা। একদিন মাদাম ক্রেম্পেলের ওখানে গানের পরে রিশার সঙ্গীত সম্বন্ধে খুব চমৎকার বললেন। সে যে কী মনোজ্ঞ বর্ণনা—দুঃখ এই সেদিনকার বর্ণনায় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের খুঁটিনাটি নিয়ে এত কথা বলেছিলেন যে স্মৃতি থেকে তা পিছ্‌লে গেছে। কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন বড় চমৎকার। বলি যতটা পারি গুছিয়ে, কেন না কথাটি চিন্তনীয়।

রিশার বললেন: "দিলীপ, তোমাদের সঙ্গীত হচ্ছে linear, রেখায়িত—ধারায়িত—কখনো—সরু সূক্ষ্ম শিখর-থেকে-দেখা শুভ্র নদীর ম'ত—চলেছে এঁকে বেঁকে আবেগের নানারঙা জমির উপর দিয়ে—কখনো বা চলেছে কলোচ্ছ্বাসে দুকূলভাঙা প্লাবনে—কখনো বা শান্ত

উষার স্বর্ণনৃত্যে—কখনো বা অশ্রুল সন্ধ্যার উদাস মন্থরভঙ্গে। তোমাদের মেলডি অপূর্ব তার এই রেখার মহিমায়—তার তুলনা নেই নিজের রাজ্যে।

আমি : একথা রোলাঁকে আমিও বার বার বলতাম। তিনিও জানতেন—যেকথা তাঁর একটি চিঠিতেও লিখেছেন—যে, য়ুরোপে মেলডির বিকাশ তেমন হয় নি হার্মনির দরুণ।

রিশার : ঠিক কথা। কিন্তু এ-সম্পর্কে আরো একটা কথা ভাববার আছে যে, কেন হ'ল না এ বিকাশ? ভেবেছ কি?

মার্থা : হার্মনির দিকেই দৃষ্টি প'ড়ে গেল আমাদের?

রিশার : তা তো বটেই, কিন্তু পড়ল কেন মাদাম? পড়ল এই জন্যে যে মানুষ—মানে আমাদের দেশের সুরশিল্পীরা—আবিষ্কার করল যে কণ্ঠ হ'ল প্রকৃতির দান, তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মানুষ চিরদিন চেয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে হারাতে! যন্ত্রের সূক্ষ্ম কাঁপন, ধ্বনিসঙ্গতি, স্বরগ্রামের প্রসার, কলাকারুবৈচিত্র্য, কণ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি। কণ্ঠ চরমউৎকর্ষে উঠেছে তোমাদের দেশে দিলীপ—তাই তোমাদের যন্ত্রসঙ্গীত দীন—কারণ সে কণ্ঠসঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি, নিজের সহজ গৌরবে মহিমান্বিত নয়।

আমি : আপনার একথা খানিকটা সত্য। আমার বেশ মনে আছে কয়েক বৎসর আগে লক্ষ্ণৌয়ে চন্দন চৌবে ব'লে এক আশ্চর্য মধুর ধ্রুপদী আল্লাবন্দে খাঁ ও নাসিরউদ্দিন খাঁ ব'লে দুজন বিখ্যাত মুসলমান গায়কের আলাপ শুনে রেগে আগুন। বললেন আমাকে : "ওদের লজ্জা নেই রায় সাহেব। ওরা ভ্রষ্ট—নৈলে গাইয়ে হ'য়ে কণ্ঠে যন্ত্রের কাজ অনুকরণ করতে যায়? পতিব্রতা মেয়ে বারাঙ্গনার সাজ পরে?—পরতে পারে এখনো? যাদের কণ্ঠ নেই তারা যন্ত্র

বাজাক—যন্ত্র হ'ল সঙ্গীত, গায়কের তাঁবে—কণ্ঠ তাকে চালাবে, তার ইশারায় চলবে না। জানেন তো সঙ্গীত-রত্নাকরে কী বলেছে :

নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ
অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে

নৃত্য বাদ্যকে মেনে চলবে, বাদ্য চলবে কণ্ঠকে কুর্নিশ ক'রে গোলাম হ'য়ে—কিন্তু কণ্ঠই হ'ল শাহানশাহ, সে রাজা হয়ে কিনা অনুকরণ করবে তার বান্দা যন্ত্রকে ?

মার্থা : কথাটা বলেছিলেন কিন্তু চমৎকার।

রিশার : হাঁ—কিন্তু কেবল ঐ রেখায়িত linear মেলডির রাজ্যে মনে রেখো। হার্মনির রাজ্যে আসতেই "টেবিল উল্টে গেল" যাকে বলে। ভায়া, সেখানে কণ্ঠের সাধ্য কী যন্ত্রের কাছাকাছিও আসবে ? তাই যন্ত্রসঙ্গীত—সিম্ফনি—ধ্বনিজগতে আনল একটা নতুন ডাই-মেনশন। তোমাদের সঙ্গীতকে যদি বলি দুই ডাইমেনশনের—হার্মনিকে চলতে হবে তিন ডাইমেন্‌শনে। ধ্বনির কল্লোল এভাবে শোভাযাত্রা রচেনি আর কোনো সঙ্গীতে। হার্মনি এদিক দিয়ে মানুষের একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কীর্তি। আমি মান্‌ব মেলডি অপরূপ—সে পরী দেবদূত সব মেনে নেব—তাকে অভ্যর্থনাও করব অন্তরের আনন্দ-অর্ঘে। কিন্তু হার্মনি হ'ল বিরাট্‌ অতিকায়—টাইটানিক—তার চোখে আকাশের উদারতা—নিশ্বাসে অচিন পারিজাতসৌরভ—হিল্লোলে দৈবীকল্লোল। তাকে দিতেই হবে সম্ভ্রমের প্রণামী।

* * * *

এম্‌নিই ছিল তাঁর বাক্‌শক্তি যে তিনি মুখ খুললে আমাদের কথা কইতে হ'ত না। বহুদিন বাদে ১৯৪০ সালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সে-যুগের বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র দত্তকে দেখে মনে হ'ত পল

রিশারের কথা। বাকনৈপুণ্যে এঁদের মিল আছে—যদিও এছাড়া আর কোনো মিলই নেই। চারুবাবুও মুখ খুললে আর সবাইয়ের কণ্ঠস্বর তেমনি স্তিমিত হ'য়ে আসত সকালবেলায় আলোপদ্ম তার দল মেললে যেমন তারার কুঁড়িরা মুদে আসে। এঁদের মতন আরো দুচারজন "গপ্পে" লোক আমি দেখেছি—কিন্তু তাঁদের বলা যায় আলাপী —রিশার বা চারুবাবুর কথাবার্ত্তাকে নাম দিতে হ'লে বলতে হয় কথকতা। এঁরা সত্যিই কথকতার গাইয়ে—আলাপীরও উপরওয়ালা। পল রিশারেরই ভাষা চুরি ক'রে বলব—কথাবার্তায় আলাপ যদি হয় দুই ডাইমেনশনের, কথকতা হ'ল তিন ডাইমেনশনের। মেলডিপ্রতিভা বিরলতর। তেমনি আলাপীর ম'ত আলাপী লাখে না মিলয় এক, কিন্তু কথকের মতন কথক কোটিতে গোটিক হয়।

পলা রিশারের কথা নির্বাক্ হ'য়ে শুনতে শুনতে একথা আরো মনে হ'ত। এ লোকটি জন্ম-যাযাবর। বলতেন কত ঘটা ক'রে— হিমালয়ে দুবৎসর কেমন একলা ছিলেন; বলতেন মাঝে মাঝে কিভাবে হঠৎ ভালুকের সঙ্গে ভায়রাভাই সম্বন্ধ পাতাতে হ'ত দায়ে প'ড়ে; বলতেন কেমন ক'রে পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও গিয়েছিলেন বসোরায়; পালেষ্টাইন গ্রাস মিসর প্রভৃতি দেশে কীভাবে কপর্দকহীন হ'য়েও কোনোমতে জীবিকার্জন ক'রে পথ চলতেন—এক এক সময়ে যিশুভঙ্গিমায় কাল কি খাবেন না ভেবেই দিন কাটাতে হয়েছে— taking no thought of the morrow—কিন্তু morrow-ই সে ভাবনা ভেবেছে—উপোষ করতে হয়নি কোনোদিন; বলতেন মিসরে তাঁর এক সুখী বন্ধুর কত কথা। তিনি ছিলেন রাজনীতিক— ডিপ্লোমাট, কিন্তু মনটা ছিল তাঁর মিস্টিক ছাঁচে ঢালাই করা। Insouciance (নির্ভাবনা) এর গুপ্তবিদ্যা রিশার তাঁর কাছেই

শেখেন। সুফী বন্ধু কখনো প্ল্যান করতেন না। তিনি ছিলেন জন্ম-যাত্রী—অচিন-পথের-উধাও-পথিক—কখনো ভাবতেন না পাথেয়ের কথা। যুদ্ধের সময়ে তিনি কত বার কত সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অভাবনীয় উপায়ে—প্রাণপক্ষী পদ্মপত্রের উপরে জলবিন্দুর ন্যায় কাঁপত ঝরে-ঝরে-ঝরে নি—কেমন ক'রে এক মহাদুর্যোগে তাঁর এক বন্ধু স্বপ্নে তাঁর আসন্ন সর্বনাশের খবর পেয়ে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক পাঠান—আরো কত কত গল্প—সত্যি সময়ে সময়ে ধাঁধা লাগত আমাদের তিনজনেরই এ কি নীস—না বাগ্‌দাদ?—আমরা কি বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিমন্ত না আরব্যোপন্যাসের মুসাফের যাদের লেন দেন—নির্জলা জিন পরী বেগম সাকীদের সঙ্গে? আর্টের একটা সংজ্ঞা পল রিশার প্রায়ই দিতেন—to create an illusion—এমন ইন্দ্রজাল রচা যার ফলে স্বপ্নকেই মনে হবে সত্য, আর বাস্তবকে মনে হবে ছায়াময়। এ-মাপকাটিতে তাঁর কথকতা ছিল প্রথমশ্রেণীর শিল্পমায়া।

এ তিনি পারতেন কারণ এই অবাস্তবতায় তিনি বিশ্বাস করতেন মনেপ্রাণে। একবার বলেছিলেন মার্থাকে: "জানেন! যা মনে হয় অসম্ভব তা প্রায়ই ঘটে আর যেই ঘটে দেখা যায় অসম্ভবের চেয়ে সম্ভব কিছুই নেই এ-জগতে। তাই এ-অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া স্বভাবস্থা থাকেন প্রাচ্যদেশে—পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদ তাঁর ছায়াময়ী ঝিকিমিকিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় ক'রে দিয়েছেন। য়ুরোপে তাই মানুষ মিস্‌টিক্ নয়—মানে যথার্থ মিস্‌টিক য়ুরোপের মাটিতে গজালেও বাঁচতে পারে না। তারা সর্বদাই সাবধান—ভাবে কালকের জন্যে—বাঁচে নিজের গরজে। প্রাচ্যের দোষ নেই বলি না—কিন্তু এই মিস্‌টিক আবহ সেখানে এখনো আকাশবাতাস ছেয়ে। এ-ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মার্থা : মিস্‌টিক বলতে আপনি নিশানা করছেন কাকে ?

রিশার : যে তার প্রাণের খোরাক সংগ্রহ করে অলক্ষ্যলোক থেকে—অথচ প্রত্যক্ষভাবে।

ভ্লাদিমের : এমন লোক দেখেছেন আপনি ?

রিশার (হেসে) : দেখি নি ?—যদিও তাদেরও সবাই এক জাতের নয়। মিস্‌টিকেরও রকম ফের আছে।

মার্থা : যাদের আপনি দেখেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিস্‌টিক বলেন আপনি কাকে ?—অরবিন্দকে ?

রিশারের মুখের সে-ভাব আমি ভুলব না। তিনি কথা বলছিলেন নির্ঝর ছন্দে—কলস্বরে—হঠাৎ অন্য এক ছন্দ এসে গেল যেন। বললেন : "মিস্‌টিক ?" ব'লে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপরে কেমন যেন হেসে বললেন : "তাঁর সংজ্ঞা হয় না মাদাম। তিনি মিস্‌টিকও বটে, ননও বটে। যোগীই বটে, ননও বটে। আমার কাছে তিনি Shiva—divin (নরদেব)।"

তেমন মিড়ে তাঁকে আর কারুর সম্বন্ধে কথা কইতে দেখি নি। আর একদিন তিনি বলেছিলেন : "মাদাম, আমি জীবনে কিছুই করি নি দেখাবার মতন। কিন্তু জানি আমার পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব ছিল। আমি পারতাম অনেক কিছু কিন্তু এগুই নি এই ভেবে —কী হবে ওসবে ? জীবনের ব্যর্থতা দীনতা দেখে বহুবারই আমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছে—কিন্তু নিজের অক্ষমতা ভেবে নয়। একথা ব'লে প্রমাণ করা যায় না—কিন্তু কাজে ক'রে দেখিয়েই বা কী হবে বলুন ? তবু একথা বলছি এইজন্যে যে আমি বরাবরই জানতাম আমি অসামান্য। আর কখনো কারুর কাছে আমার মাথা নোয় নি—প্রথম নুইল শ্রীঅরবিন্দের কাছে। ওঁকে দেখে আমার

প্রথম ও শেষ মনে হয় যে এ-ই সে-লোক যে বিনা চেষ্টায় পারে আমি যা চেষ্টা ক'রেও পারি না। আর তিনি যা চাইছেন তা এমন চাওয়ার মতন ক'রে কেউ চায় নি কখনো। আজ একথা শুনলে লোকে হয়ত ভাববে আমি পাগল। কিন্তু ভারতবর্ষে বলে—দৈববাণী বেরোয় পাগল ও শিশুরই মুখে—তাই শুনে রাখুন। শ্রীঅরবিন্দকে আমি বুঝতে পারি না—তিনি আমারো বুদ্ধির নাগালের বাইরে। কিন্তু যেটুকু বুঝেছি তাতে একটা বিষয়ে আমার আমার সন্দেহ নেই: যে শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে যে-বিকাশের স্তরে উত্তীর্ণ করতে চাইছেন সে-স্তরে যখন মানুষ পৌঁছবে তখন ফ্রানসিস মণি শঙ্কর খৃষ্ট বুদ্ধকেও সে অতিমানুষ জাতির শিশুরা ভাববে—গড়পড়তা।

ভাদিমির: কিন্তু মানুষ কি অতিমানুষ হবে কোনোদিন সত্যিই।

রিশার: হবে। তবে কয়েকটি সর্ত আছে।

মার্থা: কি?

রিশার: একটা হচ্ছে আমাদের মানবতার গর্ব পরিহার করা। যতদিন মানুষ ভাববে সে জৈবলীলার শ্রেষ্ঠ জীব, ততদিন অতিমানুষের চারাগাছ বাড়তে পারবে না সে-আবহাওয়ায়। তাই সব আগে চাই লজ্জিত হওয়া যে আমরা মানুষ মাত্র: এইটে মনে রাখা যে, প্রকৃতির অভিব্যক্তিতে মানুষ চেতনার একটা পান্থশালা বই আর কিছুই নয়। একে—ছাড়িয়ে যেতে হবে—অতিমানব হবার জন্যেই ভেঙে ফেলতে হবে মানবতার আধার যেমন উড়বার জন্যে পাখী ভেঙে ফেলে ডিমের আধার। রবীন্দ্রনাথ, ওয়েল্‌স্‌, রোলাঁ এঁদের মানবতা বিষয়ে গর্ববাক্য শুনি আর লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা যায়। একমাত্র শ্রীঅরবিন্দকে দেখে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি—এ লজ্জা যে তাঁরও ভেবে গৌরব বোধ করেছি। ছি ছি, ভাবুন তো?

গর্ব করছি কী নিয়ে? না আমরা মানুষ! ধিক্। যখন দেখি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেটুকু—যার জন্যে এখনো তাঁর বাঁচার ওকালতি করা চলে। সেটুকু হচ্ছে অমানুষিক। না না মাদাম (উত্তেজিত) মানুষ শিখুক আগে লজ্জায় অধোবদন হ'তে যে সে মানুষ—আগে হারাতে শিখুক তার যা কিছু আছে—তবে পাবে সে যাতে তার জন্ম-স্বত্ব—তবে হবে সে অতিমানুষ। আর এ যদি সে না শেখে তবে এ-জীবন চিরদিন থাকবে এম্‌নিই—তুচ্ছতার খেলাঘর, বর্বরতার কুরু-ক্ষেত্র c'est un nouveau dieu qu'il faut adorer (আজ এক নতুন ঈশ্বরকে পূজা করতে হবে)

আমি: কি রকম?

রিশার: দেবতা সম্বন্ধে পশুর যে-ধারণা তার সঙ্গে মানুষের ঈশ্বরকল্পনার প্রভেদ নিশ্চয়ই মূলগত। তেম্‌নি ভগবানের সম্বন্ধেও মানুষের আজ যে-ধারণা ভাবিকালের অতিমানুষের ধারণার সঙ্গে তার মিল থাকবে না—থাকতে পারে না। এর কারণও স্পষ্ট। আমরা ভগবানকে দেখি আমাদের মানবিক perfectionএর আইডিয়ায় রঙিয়ে। কিন্তু অতিমানুষের perfectionএর ধারণার সঙ্গে মানবিক perfectionএর ধারণার কি কোনো মিল থাকতে পারে!

মার্থা: কিন্তু মানুষের perfectionএর আইডিয়ারও তো আরো বিকাশ হ'তে পারে?

রিশার: কিন্তু সে-ধারণার মধ্যে তার মানবিকতার উপাধি যে থাকবেই। মানুষ যতক্ষণ মানুষ থাকবে ততক্ষণ তার কল্পনাও তো থাকবেই মানবিক। এটা মনে রাখবেন যে যেমন মর্কট মেজে ঘ'ষেই মানুষ দাঁড়ায়নি তেম্‌নি মানুষকে হাজার মাজলে ঘষলেও অতিমানুষ দাঁড়াবে না। অতিমানুষ হ'ল একটা আলাদা অনুভব, আলাদা ছন্দ

—এককথায় এমন নতুন বিকাশ যা মানুষের কাছে অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। দুঃখ এই যে সে-বিকাশের পথ এখনও খোলে নি।

ভ্লাদিমের: কিন্তু কেমন করে খুলবে সে-পথ?

রিশার: তা কেমন ক'রে বলব? C'est l'inconnu—সে পথ যে অজানার। হয়ত অনেক তামসী রাত্রিই যাপন করতে হবে অন্ধকারে; হয়ত এ-দুরভিসারে বহু তীর্থযাত্রীকে বহু স্খলনের দুঃখই সইতে হবে; হয়ত এ স্বর্গারোহণে দিনের পর দিন বহু বীরেরই দেহ-পাত হবে মধ্যপথে; হয়ত আবার পশুজন্মকেই বরণ করতে হ'তে পারে—যেমন রোলাঁ আজকাল বলছেন—হয়ত চেতনার মানচিত্র থেকে মানুষের খেলাঘরের ছবি একেবারে মুছে যাবে—যাতে সেখানে অতীতের সর্বসংস্কারমুক্ত নব রাজ্যে প্রকৃতি নব নির্মাণের ছক কাটতে পারেন অব্যাহত ভাবে। কে জানে? প্রকৃতি হয়ত মানুষের কাঠামো গ'ড়ে এতই নিরাশ হয়েছেন যে বুঝেছেন, যে আবার ঢেলে না সাজালে তাঁর শক্তির পথ সুগম হবে না। কিম্বা হয়ত দেবতা দেখা দেবেন অজান্তে—কে বলতে পারে? কোন্ পথে মানুষ অতিমানুষ হবে বলতে পারি না। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে এই মন্ত্র-জপ চাই-ই চাই যে "এ নয়, এ নয়—মানুষের মানবিকতার পথে তার মুক্তি নৈব নৈব চ—মানুষ বিধাতার বরপুত্র নয় তাঁর আত্মবিকাশের ঊর্দ্ধপথে একটা সাময়িক পান্থশালার মত—চাই অনাগতের আবাহন, অমানবের আরাধনা—" বলতে হবে: "Je ne crois á rien, mais J'ai confiance"—চলতি কিছুতেই আমার আস্থা নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে।"

* * * *

কিন্তু পল রিশারের কথার মধ্যে থেকে থেকে কেমন যেন একটা বেসুর বেজে উঠত। মনে হ'ত—কী যে ঠিক মনে হ'ত গুছিয়ে বলা

কঠিন—কারণ লোকটির কথাবার্তার মধ্যে যে-দীপ্তি ফুটে উঠত তাকে অস্বীকার করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু তবু বলব—কোথায় যেন এমন একটা বাদীসুরের অভাব ছিল যার জন্মে মন খুশি হ'লেও শিউরে উঠত না।

কয়েকদিন পরেই বুঝেছিলাম—কি অভাব ছিল যখন সেই হারানো সুরটি হঠাৎ জেগে উঠল আচম্‌কা। এই কথাটা ব'লেই এ নিবন্ধের সমাপ্তি টানব।

মানুষের কথায় নানা সময়ে নানা সুরই বেজে ওঠে। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি পুরুষ হ'লেও বহিঃপ্রকৃতি নারীরই বটে—তার হাজারো রূপসজ্জা, হাবভাব, প্রসাধন। তবু এই ভিতরের পুরুষটি যতক্ষণ না সায় দেয় ততক্ষণ বাইরের প্রকৃতির সাজসজ্জা কেমন যেন হাল্কা লাগে—যাকে একটু ঠাঁই বদল করলেই মনে হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, ভোল যাবে সম্পূর্ণ বদ্‌লে। কিন্তু এমন লগ্নও আসে যখন আমাদের অন্তর-পুরুষটি কথা ক'য়ে ওঠে। তখনই আমরা চম্‌কে উঠি—সাড়া দেই, কেন না ডাক শুনি—হৃদয়কে হৃদয়ের ডাক—যা বেজে না উঠলে কথা থেকে যায় শুধুই কথা, সজ্জা থেকে যায় শুধুই সজ্জা—রূপ হ'য়ে ওঠে না অপরূপ।

এই ডাকটি বেজে উঠেছিল নীসে একদিন। পল রিশারের সব কথাই শ্রবণীয়, বটেই তো—কিন্তু আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়েছিল তাঁর এই শেষ দিনের কথা।

তখন রাত বারোটা হবে—চারিদিক নিশুতি—বাইরে থেকে থেকে ভেসে আসছে চাপা সমুদ্রকল্লোল—কখনো বা এক আধটা টুকরো বেহালার রেশ—বা মোটরের শৃঙ্গধ্বনি।

রিশার সেদিন বিষণ্ণ ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ত তাঁর

কোথায় একটা গভীর ব্যর্থতা আছে অথচ তিনি বলতেন কেবলই তেজের কথা, দীপ্তির কথা, অগ্নি-শিখর আকাশ অসীম এই সব। কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাঁর হৃদয় ঘোম্‌টা খুলল। বুঝতে পারলাম লোকটি কেন এমন ভাগ্যহীন। সব থেকেও ওর কিছুই নেই—নেই কেন্দ্রীয় চেতনার বিশ্বাস, নিষ্ঠা, মেরুদণ্ড। তিনি শক্তিসাধক অথচ সাধনার উদ্দেশ্য অহং, প্রতিভাবান্ পুরুষ অথচ প্রতিভার লক্ষ্য সৃষ্টি না—চমক জাগানো, প্রফুল্লকান্তি অথচ অন্তরে অগাধ শূন্যতা—অবসাদ—হতাশা।

সেদিন সব কথার মাঝেই থেকে থেকে ফুটে উঠছিল এই অবসাদ। যেমন যখন বলছিলেন জাপানের কথা। জাপানের কাছে তিনি বড় আশা ক'রেই গিয়েছিলেন। বললেন জাপানের মতন জাত তিনি আর দেখেন নি ওরা শুধু যে সংযমে সিদ্ধ তাই নয়—সংযমের এক নতুন ছন্দ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে—সংযম আর সুমিতি, সুষমা, শ্রী। কী ওদের হাসি, কী ওদের নমস্কার, কী ওদের সুকুমার অনুভূতি!"

মার্থা: ওরা যে সংযমী তা জানি।

রিশারের চোখে ফুটে উঠল একটা গভীর বিষাদ: কিছুই জানেন না মাদাম। ওদের জানা বড় শক্ত।

ভ্লাদিমির: কি রকম?

রিশার: একটা আছে বাইরের সংযম—সেটার খবর শুনে পাওয়া যায়, প'ড়ে পাওয়া যায়, দেখেও পাওয়া যায়। কিন্তু আর একটা সংযম আছে যা ভিতরের—তাকে পেতে হ'লে ভিতরের খবর রাখতে হয়। ওদের যে সংযমের কথা আপনারা শোনেন সে হ'ল ওদের বাইরের মিতাচার, শালীনতা। আমি বলছি ওদের সেই সংযমের কথা যা একেবারেই সুলভ নয়, যার অন্তর্বাণী হচ্ছে—"জগতের দুঃখ

অজস্র—তোমার অধিকার নেই সে দুঃখ বাড়ানো। নিজের ব্যথা তাই অপরের উপর চাপিও না পুষে রেখো--অপরকে তোমার দেয় শুধু আনন্দ সুখ—বেদনা দুঃখ নয়। শুনুন একটা ঘটনা বলি তাহ'লে হয়ত বুঝবেন কি বলতে চাইছি।

জাপানে আমার খুব একটি প্রিয় বন্ধু ছিল। তাদের এক ছেলে—আর কেউ নেই। ছেলে বিদেশে। একদিন সকালে হঠাৎ খবর এল যে মারা গেছে। দম্পতি চোখে অন্ধকার দেখলেন—কারণ ছেলেটি ছিল ওদের চোখের মণি। সেদিন দুপুরে আমার ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। ওরা নিত্য যেমন খাওয়ায় তেম্‌নিই খাওয়াল পরম সমাদরে। কত হাসি গল্প। ভাঙল না সকালে কী খবর এসেছে। সন্ধ্যাবেলা ওরা দুজনেই আত্মহত্যা করল—হারিকিরি ক'রে। পরদিন ছোট্ট একটি চিঠি পেলাম ওদের লেখা। তাতে লেখা ছিল : বন্ধু, আমরা বিদায় নিলাম এজগত থেকে—বাঁচতে আর সাধ নেই। তোমাকে বলি নি—তুমি দুঃখ পাবে ব'লে।' বলতে বলতে রিশারের স্বর গাঢ় হ'য়ে এল।

* * * *

খানিক বাদে রিশারই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন : হয়ত সব জীবনেরই অন্তরালে এম্‌নি ব্যর্থতা—কে জানে ?—আমারও যে কতদিন মনে হয়েছে আত্মহত্যা করার কথা !"

"আত্মহত্যা !" মার্থা চম্‌কে উঠল।

রিশার হাসলেন বিষণ্ণ হাসি : মাদাম, মানুষ মরণকে বড় বেশি ভয় করে। কিন্তু কেন করে বুঝি না বিশেষ যখন জীবনে লক্ষ্যই গেছে হারিয়ে! বাঁচার অধিকার আছে তাদেরই যারা জানুক না জানুক মানে যে জীবনের কোনো একটা লক্ষ্য আছে।

ভ্লাদিমির: কিন্তু কল্পনার—

রিশার: আমার লক্ষ্য নেই বলি না—তবে কি জানেন? আমার জীবনে পথ আছে, নেই শুধু পাথেয়। তা ছাড়া কী একটা ব্যর্থতার অন্ধকার জগদ্দল পাথরের মতন আমার বুকে চেপে ব'সে। আমি বাঁচতে চাই—জীবনে আমার প্রবল আসক্তি ব'লে—শক্তির বিভূতি আমার কাছে লোভনীয় ব'লে—কোনো বড় লক্ষ্যে বিশ্বাস হয়ত আছে কিন্তু পৌঁছবার সাধনা করতে আমি নারাজ। এ ব্যর্থতার প্রতিষেধ কোথায় বলুন? আর তার চেয়ে দুঃখ কার—যার সব থেকেও কিছুই নেই?

আমরা চুপ ক'রে রইলাম।

রিশারই ফের কথা বললেন: তবু দিলীপ, আমি বলব আমি শুধু শক্তিরই উপাসক নই, আমার মধ্যে তার চেয়েও বড় সম্পদ ছিল।

আমি: বড় সম্পদ? কী সেটা?

রিশার: দুর্বল প্রেমের তৃষ্ণা।

মার্থাৎ: দুর্বল—?

রিশার: প্রেমের চেয়ে দুর্বল কে? অথচ সেই জন্যেই কি সে বিশ্বাধিপ নয়? সে কি নিত্য বলে না—আমাকে বাঁচাও—অথচ তাকে বিনাশ করে এমন সাধ্য কার? প্রেমের এই যে ক্ষীণায়ুরূপ আমার অন্তর তৃষিত থাকে এরই জন্যে। রাজ্য তার জগৎ-জোড়া—বটেই তো—অথচ শিশুর মতই সে ক্ষণিক, তারই ম'ত ক্ষীণায়ু, নয় কি! ভগবানকে যখন শক্তিধর ব'লে ভাবি তখন ভুলে যাই তাঁর এ প্রেমের রূপ যে দুর্বল—অবজ্ঞাত অচিহ্নিত—তবু সে চিরজীবী তার দুর্বলতারই বিপুল বলে—যেমন চিরজীবী শিশু। এমন কোন্ তৈমুর সীজর নেপোলিয়ন আছে যে শিশুসৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে

তাদের নির্মূল ক'রে ঘরে ফিরতে পারে মত্তকল্লোলে? পারে না তো? কিন্তু কেন পারে না? কারণ মানুষ একদিকে যেমন চায় শক্তিদর্পে আকাশ ছুঁতে আর একদিকে চায় দুর্বলতার মাটিতে মিশিয়ে যেতে। সে শুধু স্বর্ণরঞ্জিত উদার শিখরমালাই নয়—সে ফুলের কোমল কোলের লাজুক গন্ধও বটে। সে শুধু বীরপদধ্বনিত সিংহনাদ-মুখরিত দিগ্বিজয়ীই নয়—সে প্রণয়পিপাসু নীড়হারা ঘুমকাতুরে পাখিও বটে। সে শুধু দিক্‌প্রসারী তুফানজেতা সিন্ধুনাবিকই নয়—সে মায়ের কোলহারানো আধার ভীরু অবোধ শিশু—একে ওকে তাকে মা ব'লে আঁকড়ে ধরে মা নৈলে তার চলে না ব'লে।

ভগবানকে আমি দেখি এম্‌নিই দুর্বলরূপে। দুর্বলতায়ও তিনিও তো আমাদের আদর্শ—নইলে দুর্বলতায় এত সুধা কেন? সংসারে যা কিছু ম্লান মন্থর সর্বহারা তারই মধ্যে এমন গভীর আনন্দ সার্থকতার আভাস কেন? Our sweetest songs are those which tell of saddest thoughts—কবির এ বাণী বুকে বুকে এমন কাতর সুরে চির আশার বাণী জাগিয়ে তোলে কেন? বিশ্বের লাঞ্ছিত, মূর্চ্ছাহত, পরাভূত, নিরন্ন, অবোধদের জন্যেই প্রেমের অবতারদের যুগ যুগ ধ'রে নিরবসান কান্না কেন?

* * * *

সত্যিই রিশারের সেদিনকার সুর আমার কাছে ছিল অবিস্মরণীয়। বহুদিন পরে পড়ি তাঁর Les Dieux বইটি তার একজায়গায় দেখি তিনি লিখেছেন এই কথাটি আভাষে (অবশ্য এ ভাবধারা শ্রীঅরবিন্দেরই) *

* শ্রীঅরবিন্দের Who কবিতায়:—The hand that sends Jupiter spinning through heaven, spends all its cunning to fashion a curl.

N'est ce point toujours dans les choses faibles, meprisées du monde, guil plait anx suprémes puissances de se revéler ?

> ম্লান বলহীন যারা, সর্বহারা, অনাদৃত ভুবনে সবার
> শক্তিরাজ চান সেথা উদ্ভাসিতে সর্বোত্তম বিভূতি তাঁহার।

* * * *

এক একটা মনের পরশ ঘটে এম্‌নিই আকস্মিক হয়ত পলকের জন্যে। কিন্তু সেই ক্ষণিক ছোঁয়াছুয়ির ফলে কোথা থেকে যে চেতনার মাটিতে কোন্ স্বপ্নের অনুভবের রক্তরাগের বীজ উড়ে এসে পড়ে—কোন্ অচিন অতিথির প্রাণনন্দন থেকে! তখন সে দুলে ওঠে সৃষ্টিতে—গানে, শিল্পে, কাব্যে...বহুদিন পরে এটা যেন উপলব্ধি করেছিলাম ভগবানের বালকভাবে—সৌকুমার্যে—যে পেলব অথচ মৃত্যুঞ্জয়; সহজেই অস্বীকার্য অথচ অপরাজেয়; লাজুক অথচ অনপনেয়:

শিশু—দিগ্বিজয়ী

কথা কও কোন্ সুরে
প্রাণপুরে
বলো দেখি?
স্বপন-সুগন্ধি প্রিয়! কণ্টককান্তারে ভুলিবে কি?
এই কি তোমার রীতি?
না না—কভু নয়,
এ কি হয়?

ঐ অসাঙ্গ বারিধি
গায়
লহরী লীলায় যার গান—
"আয় আয়!"
চিরকল্লোলের তার কোথা অবসান?—
ঐ জ্যোতিকণা
আঁকে যার আলোক-আল্পনা
রজনী বিহানে
অফুরান বর্ণের বিতানে···
ঐ অলিভৃঙ্গ ফিরে ফিরে
গুঞ্জনের গন্ধতীরে
আনে যার সৌরভ-সন্ধান
ঐ পলাতক স্মৃতিরাগমালা
গাঁথি' সীমন্তিনী মেঘবালা
পরে যার চুম্বন-সিন্দুর
গগনের নৃত্যমঞ্চে উচ্ছল ছন্দিত যার দীপালি-নূপুর...
ঐ অমরণ অনির্বাণ
দীপজ্বালে সন্ধ্যার মন্দিরে যার নক্ষত্রকামিনী
যার কলস্বনা আলাপিনী
শিশিরের কানে আনে মিহির মন্ত্রণা-অভিমান...
প্রজাপতি-পাখনায়
ময়ূরের মেখলায়
কুসুমের মখমলে
সে যে স্নেহে চলে।

কোমল কান্ত সে যে...
শ্রীপর্ণা মুরলী তার অন্তরনিকুঞ্জে ওঠে বেজে!
অনুদিন
অবলীন
সে-কুমারী মঞ্জুকায়া
বোনে তার ধ্বনি-আলোছায়া
গহন স্বপ্নলোকে পেলব কলিকা
জ্বালে তার লাজুক দীপিকা
ইন্দ্রজালে
অনন্তের তালে...
আয়তি আশায় সে যে জাগে
আধেক আলিঙ্গনে আধেক বৈরাগে।
অণু হ'তে অণু
তার তন্বী তনু
তবু সে যে অসাঙ্গ, মহান্
রচে তার দুরাশা-বিতান
বৈভবে অপার
অন্ধশূন্যে নীহারিকা,—বিরহে—বিহার
শিশিরে বৈদূর্যমণি
নিথর প্রস্বনী
যাচে তার নিঃস্বতার প্রার্থনে নিয়ত
ঐশ্বর্যের ব্রত—
ব্যবধানে সুকুমার সেতু বিরচিয়া
বেদনাশ্রু-মুকুরে বিম্বিয়া
আনন্দ-চেতনা আয়ুষ্মতী......

পথ তারে ডাকে···ডাকে···কণিকাপাথেয় তার প্রেমে নিরবধি।
শিশু···চিরঞ্জীবী···
কত সাধ...লুকোচুরি কত···বলে : "নিবি ? মোরে নিবি ?
দেখ্, আমি বিনা দামে বিকাতেই চাই,
তবু হায় ফিরে ফিরে যাই...
কেহ যে চাহে না
সরলতা-তরণী বাহে না।"
বলে শিশু : "শিখর-সঞ্চারী আমি
দিবাযামী
মুরছাই তৃণের আঘাতে
হাসিতে ঘুমায়ে—ফিরে জাগি ম্লান, অশ্রুল বিষাদে।
কৃতান্ত কাপালি যবে সুন্দরে হানিতে শেল শক্তিশবাসনে বসে সুখা,
কঙ্কালের অন্ধকারে ধূমায় শ্মশানরক্তচিতা জ্বালামুখী,
সেই দৃপ্ত জয়ধ্বনি-সিংহনাদে হায়
বারিদে বিজলি সম আমি, শিশু, মিলাই ব্যথায়।
আমি যে অনর্থ-ভীরু অর্চনা-অতিথি :
আমি প্রেম-নিধি।
মোর নয়নের তৃষা
অনিমিষা
পথ চেয়ে রয় :
কবে সে-প্রণয়
সেই অমলা মাধুরী
ইন্দুলেখা প্রিয়তমা
দেবে দেখা নিরুপমা

পুষ্পশেজে রচি' নিদ্রাপুরী,
শীকরকণায় নির্মি' তনু
আলোকের আশীর্বাণী রচে যেথা রত্নজলধনু
এই-আছে-এই-নাই…
না শুধালে আমি অন্তরালে স'রে যাই
আদরকাঙাল
এতটুকু ভাঙচুরে লুপ্ত হয় যার লীলাতাল।"
বলে শিশু: "তবু আমি
দিবাযামী
সঙ্গীতের মাঙ্গলিকে স্থবিরে ফিরাই
যৌবনের জোয়ারের গানে।
জনমে জনমে লাঞ্ছনায় অপমানে
আমি সর্বজয়ী,
তাই
জননী করুণাময়ী
আকুলতা-আলোক-মর্মরে
গড়ে জীবনের বালুচরে
অশ্রু হাসি-খেলাঘর—তাসের নিলয়,
ঝটিকায় যে অকুতোভয়,
দহে না শিখায়,
ডোবে না প্লাবনে।

রচি আমি মিড়ের বেদনে
স্মরণের মূর্ছনায়
বুকে বুকে
মিলনের অঙ্গীকার—বিরহ-যৌতুকে।"

বলে শিশু ঃ "যবে দর্পভরে
উচ্চণ্ড অসুর মোরে নির্বাসিত করে
আন্দোলিত অভিযান হ'তে তার
বসুন্ধরায় ছায় নিস্ফুলিঙ্গ অন্ধকার।
শুভব্রত ভাঙে
শুধু মত্ত আস্ফালন রাঙে
ঘনঘোর
যতদিন মোর
অঙ্গঝরা গন্ধরেণু
না বাজায় তার শঙ্খ বেণু
যার অভিসারে
চিরদিন অকূলপাথারে
নীলিমার নিরুদ্দেশে উধাও পথিক
পরম প্রেমিক।"

মরণে বিজয়ী তুমি, জীবনে নির্জিত,
নিরাশ্রয়, কুণ্ঠিত, দলিত
যুগে যুগে···দেশে দেশে
তবু ফিরে এসো গীতিগন্ধবীথিরেশে
ভেসে ভেসে ভালোবেসে
উদ্‌ভ্রান্তির স্রোতে হে নিরালা!
জোনাকি-জ্যোতির্লিপি—রজনী-উজালা

ক্ষণে-ক্ষণে-নির্বাপিত
তবু চির-দীপান্বিত
আনন্দবন্দিত অন্তরের দেবালয়ে
সুষমার অভিষেকে যার বরাভয়ে
নামে
ধরণীর ধূলিধামে
নিত্য
আকাশ-আকুল নৃত্য
অক্ষতির সুরে লয়ে মলয়মৃদঙ্গমহিমায়।

জল্পনা কল্পনা

একটু ভূমিকা আছে। এ-প্রবন্ধটি লেখা ১৯২৭ সালে। তখন আমি ভিয়েনায় বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান লেখক রেনে ফুলপ মিলারের অতিথি। তাঁর স্ত্রী পরে পণ্ডিচেরিতে এসেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নীলিমা নাম দিয়েছিলেন তাঁর গান শুনে। ইনি হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে—বুদাপেস্তের একজন বিখ্যাত অপেরা গায়িকা ছিলেন। ভারতীয় গান ইনি অত্যন্ত ভালবাসতেন—আমাকে জর্মন গানও শিখিয়েছিলেন—শোপ্যাঁর। য়ুরোপে এ-ধরণের লেখক-নায়িকা দম্পতির সঙ্গে আর আমার ভাব হয় নি—বিশেষ ক'রে এমন খ্যাতনামা দম্পতি। ভারতের সংস্কৃতির 'পরে এঁদের উভয়েরই গভীর শ্রদ্ধা। মিলার জায়া প্রায়ই আমাকে নানা পত্রে লেখেন এখনো যে ভারতের ভাবধারায় তাঁর দেহমন যেন স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। রেনে

আমার কাছে প্রায়ই মহাত্মা গান্ধি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নই করতেন ১৯২২ সালে, লুগানোয়। পরে "লেনিন ও গান্ধি" বইটিতে এসব কথা তিনি লিখেও ছিলেন। তিনি আরো অনেক বই লিখেছেন তারমধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে Mind and Face of Bolshevism (ইংরাজি তর্জমা)। এ বইটি লিখতে বন্ধুবরকে রুষদেশে গিয়ে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। আমার আরো ভালো লেগেছিল ওঁর The power and Secret of the Jesuits বইটি পরে। কারণ এবইটিতে বন্ধুবরের আধ্যাত্মিক গভীরবোধের পরিচয় মেলে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই।

"At first, he (Loyola) experienced the most blissful feelings, such as he had never before known; soon however, great chasms opened out before him and he learned such hopeless despair of the soul as is never experienced by those people concerned only with the outer world and experienced that conflict which occurs only in the perilous course of spiritual transformation."

এই গভীরবোধ ছিল ব'লেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার এই মন্ত্রটি আমার কাছে শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন যে অন্তরপুরুষ যদি আগে জাগে তাহ'লেই বিশ্ব জাগবে (আবুল হাফিজ জলন্ধরির গানে):

"সারী ধরণী হয় দুখিয়ারী দুখিয়ারে হৈঁ সব নরনারী
তূ হি উঠা লে সুন্দর মুরলী তূ হী বন্ জা শ্যাম মুরারি
তূ জাগে তো দুনিয়া জাগে জাগ উঠেঁ সব প্রেম পূজারী

গায়েঁ তেরে গীত
বসা লে অপনে মনমে প্রীত।

Her children in gloom thy mother earth mourns
and sighs
Play Beauty's flute like Krishna : thou art He.
If thou wilt wake, *the world*, aquiver, *shall rise*
And mitred priests of love will sing with thee.

দ্রষ্টব্য :—এ প্রবন্ধে আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছই নি য়ুরোপের কয়েকটি সমস্যার কথা তুলেছি মাত্র। আজকের দিনে আমার মনে হয় না বল্‌শেভিস্‌মের ঘাতকতন্ত্রে জগতে অবিচারের আশু উচ্ছেদ হবে—মনে হয় এর ফলে কেবল রক্ততাণ্ডবেরই সৃষ্টি সম্ভব যা হচ্ছেও (ফাশিস্তি তো বলশেভিকিরি উত্তর) বাইরের দুচারটে নীতিবাদ বা বা বুলি কপ্‌চে মানুষকে শুদ্ধিদান করা যায় না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি মানুষের চেতনার রূপান্তর না হ'লে, জীবনে ভগবানের প্রতিষ্ঠা না হ'লে জগতের অগুন্তি আধি-ব্যাধির প্রতিকার হ'তে পারে না—কিন্তু সে সময়ে রুষ জাতিকে আমি অত্যদ্ভূত একটা জাত মনে করতাম—তাই বল্‌শেভিস্‌মকে আদর্শ হিসেবে সমর্থন করবার প্রবণতাই ছিল বেশি। রাশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণে কার না স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে? কিন্তু সে সময়ে আমি বুঝতে পারি নি যে রুষ কর্তৃপক্ষ ঠিক অন্য সব দেশের কর্তৃপক্ষেরই মতন—শক্তিমদ তাঁদেরো তৃষ্ণার জল। কিন্তু সে যাই হোক বার তের বৎসর আগে য়ুরোপের ভাবধারা একটি ভারতীয় মনকে কি ভাবে দুলিয়ে তুলত তার পরিচয় তথা সে সময়ের মানসিক ব্যারোমিটারের ওঠানামা হয়ত অনেকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে

হবে ভেবেই এ সংশয়শীল প্রবন্ধটিও একটু আধটু সংশোধিত করে ছাপালাম। ইতি।

পাঁচ বৎসর বাদে ভিয়েনায় আমার পূর্ব-পরিচিত অস্ট্রিয়ান লেখক বন্ধুরই অতিথি হওয়া গেছে। বন্ধুবর ইতিমধ্যে রুষদেশে গিয়ে দশমাস ছিলেন ও ভীষণ পরিশ্রম করে *Geist und Gesicht des Bolschevismus* ব'লে একটি বিরাট বই লিখে ফেলেছেন। বইখানি সম্প্রতি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে ও ইংলণ্ডে নানা মনীষীর অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। যথা আইনষ্টাইন, ওয়েল্‌স্‌, অয়কেন, লাস্কি, প্রভৃতি। বইখানির মধ্যে রুষদেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ছবি আছে। মোটের উপর ইনি বল্‌শেভিস্‌মের বিরুদ্ধে। ইনি মানুষকে কলে পিষে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে একাকার করার পক্ষপাতী নন যা বল্‌শেভিকরা করছে। বইখানির ভূমিকায় ইনি লিখছেন যে, বল্‌শেভিস্‌ম্‌ সম্বন্ধে ইনি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যেহেতু বল্‌শেভিস্‌ম্‌ বর্তমান জগতের এত বড় একটা ঘটনা যে, ব্যক্তিগত বা দলগত সুবিধা অসুবিধার নিকষে তার যাচাই হ'তে পারে না।

বার্টরাণ্ড রাসেল এর বইখানি প'ড়ে সেদিন ডেলি হেরাল্ডে লিখেছিলেন : "বল্‌শেভিস্‌মের সম্বন্ধে এ রকম চিত্তাকর্ষক বই খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। রুষদেশের মতন যে-সব জাতি যন্ত্র-সভ্যতায় পশ্চাদ্গামী, তাদের পক্ষে হঠাৎ যন্ত্রকে দেবতার মতনই বেদীতে বসিয়ে সাড়ম্বরে পূজা করা স্বাভাবিক। (পাশ্চাত্য সোশ্যালিস্‌ম্‌ চায় মানুষকে যন্ত্রের জাঁতাকলের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দিতে—বল্‌শেভিস্‌ম্‌ চায় মানুষকে বেশি করে যন্ত্রাধীন করতে।) এস্থলে ক্যাপিটালিস্‌মের

বিরুদ্ধাচরণে এই দুই দল সমমতাবলম্বী হ'লেও মূল মনোভাবে এ দুই দলের মধ্যে মস্ত প্রভেদ আছে।"

মুসকিল এই যে, বল্‌শেভিস্‌মের মতন একটা সম্পূর্ণ নতুন আন্দোলন ও *শাসনতন্ত্রকে আমাদের মতন লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে* দেখতে পারাটা যে কত কঠিন সেটা প্রথম দৃষ্টিতে বোঝা যায় না মোটেই। নতুন যে-কোনো আন্দোলনের সম্বন্ধেই এ কথা অল্প বিস্তর খাটে। যথা, য়ুরোপে যান্ত্রিকতার (industrialism) সূচনায় বড় কেউই এ সভ্যতার মধ্যে ত শুধু মন্দ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখেন নি। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে সমস্ত সভ্য জগৎ ফরাসি বিপ্লবের আদর্শবাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকা ও য়ুরোপে দাসপ্রথা নিবারণের আরম্ভের সম্বন্ধেও ঐ কথা। আমাদের দেশে এখনও অনেকেই মনে করেন, প্রতীচ্যের সংস্পর্শ ভারতের পক্ষে অবিমিশ্র অশুভ। এবং এ শ্রেণীর প্রায় সব রকম মনোভাবেরই স্বপক্ষে বুদ্ধিমান্ মানুষ দু'চারটে যুক্তি দাঁড় করাতে পারে—যেহেতু এ জগতে কিছুই তো নিখুঁত নয়। মধ্যযুগে গালিলিওর সময়ে বিজ্ঞানকে মানুষ কি চোখে দেখত আর তাকে কি রকম সব সস্তা যুক্তিবলে বিঁধতে ছুটত, না জানে কে? ধর্ম জগতে শুধু স্বাধীন মত মুখ ফুটে বলার জন্যে যে কত খৃষ্টানের প্রাণ গেছে তারই বা ইয়ত্তা করবে কে? আজ আমরা দূরত্বের শুভ্র ব্যবধানে অনেকটা বুঝতে শিখছি বটে যে, এ-সব আন্দোলনের মধ্যে বেশির ভাগ শুভই ছিল। তাই আজকের দিনে আরো বুঝছি যে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চেষ্টা করলে ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে মানুষ জয়যাত্রা করতে পারে। কিন্তু মধ্য যুগে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত প্রচারের অধিকার, নিষ্কাম বিজ্ঞানচর্চা, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতিকে মানুষ যে শয়তানের শয়তানি বলেই মনে করত এ কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না।

বন্ধুবর এ কথা সম্পূর্ণ মানেন ও স্বীকার করেন যে, এ রকম একটা বিরাট আন্দোলনকে প্রাণপণে চেষ্টা না করলে অনাসক্তভাবে দেখা সম্ভব নয়। কেন না—বইখানির ভূমিকাতে তিনি গোড়াতেই লিখছেন—

What is happening in Russia to-day is far too significant and fateful for our age to be handed over for acceptance or rejection to a caste of politicians whose attitude and verdict depend entirely on tactical considerations, and who will emphasize or ignore its defects and its merits as it suits their interest at the moment."

কাজেই এরূপ একটি ঐতিহাসিক যুগ-প্রবর্তক বিপ্লব ও প্রচেষ্টাকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে চেয়েছি বল্‌লেই সাব্যস্ত হয় না যে, এ-উদ্যমে সফল হয়েছি। তবে ভরসার কথা এই যে, এ-ধরণের মনোভাবের মূলে একটা আশার বাণী আছে যার ভিত হ'ল সত্যনিষ্ঠা। বন্ধুবরের মধ্যে সত্যের প্রতি একটা নিষ্ঠা বরাবর লক্ষ্য করেছি—তা সে সত্য যে রঙ্গমঞ্চেই দেখা দিক না কেন—সুদূর প্রাচ্যে মহাত্মা গান্ধির মধ্যেই হোক, বা কুজ্মটিকাচ্ছন্ন রুষদেশে শক্তিধর লেনিনের মধ্যেই হোক।

লেনিনের সঙ্গে ইনি দুতিনবার দেখা ক'রেছিলেন।

আমাকে বলছিলেন: "লেনিন ও গান্ধি দুজনেই মস্ত মানুষ। কেন না তাঁরা জীবনে যা বিশ্বাস করেন ব্যবহারে তাই অনুসরণ করতে চেষ্টা পান। কিন্তু কি জানেন রায় মহাশয়, এই রকম একটা বাঁধা-ধরা সংকীর্ণ হার্মনি গ'ড়ে তোলার চেয়ে আমি ঢের বড় মনে করি সেই জীবনকে যা হয়ত হার্মনিকে খুঁজে পায় নি, কিন্তু জীবনে দুঃখ ব্যথা ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে চলেছে।

জীবনে হার্মনি পাওয়াটা কি মস্ত জিনিষ নয়, জিজ্ঞাসা করাতে ইনি বললেন : "সাধারণ আটপৌরে মানুষের কোনো কিছুতেই গভীর বিশ্বাস থাকে না। সে অবস্থার চেয়ে হার্মনি অবশ্যই বড়, কিন্তু দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনে এমন অনেক রহস্য আবিষ্কার করে, যা শুধু হার্মনি-তৃপ্ত মানুষের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় না। লেনিন বা গান্ধি কাউকেই আমি এই কারণে ততটা বড় ক'রে দেখতে পারি না, যদিও এঁদের মহত্ব আমি মানি।

যাহোক, বন্ধুবর বল্লেন : "কিন্তু লেনিন মানুষটি এতই মহাপ্রাণ যে, তিনি তাঁর একরোখা সঙ্কীর্ণতাকে খানিকটা ছাপিয়ে উঠেছেন শুধু আত্মোৎসর্গ ক'রে। তাই তিনি ছিলেন ক্যাপিটালিস্মের বিরুদ্ধে ও কৃষকদের স্বপক্ষে—মনেও—আচরণেও। এমন অনাড়ম্বর, দীনবেশী, অসাধারণ শ্রমশীল, বিলাসবিমুখ মানুষ—দেবতার একটা আভাষ দেয় বটে!" ব'লে বললেন : "এ সব বিষয়ে গান্ধি ও লেনিনের মধ্যে একটা মস্ত ও মূলগত সাদৃশ্য আছে যদিও উভয়ের কেউই একথা শুনলে সন্তুষ্ট হবেন না। রুষদেশে এমন কয়েকজন সত্যি মানুষ আছে ব'লেই বল্‌শেভিস্‌ম টিঁকে আছে এখানে।"

আমি বললাম : "কিন্তু অন্যদেশেও এমন বল্‌শেভিকবাদী ত থাকতে পারেন!"

বন্ধুবর হেসে বললেন : "কি জানেন রায় মহাশয়? আমাদের এ য়ুরোপের তথাকথিত বল্‌শেভিকদের সঙ্গে রুষদেশের বল্‌শেভিক সন্ন্যাসীদের তফাৎ—আকাশ পাতাল। একটা উদাহরণ দেই। ধরুন, Upton Sinclair, তিনি একজন মহা ক্রোধন ধনুর্ধর বল্‌শেভিক—বটে তো? কিন্তু পয়সার বেলায় এত নিখুঁৎ হিসেবি যে নিজের বই সব এমন কি প্রকাশকদের দিয়েও ছাপান না। তিনি নিজেই লেখক,

নিজেই প্রকাশক—ক্যাপিটালিস্‌মের আনুকূল্যেই তাঁর ব্যাঙ্কের জমার খাতা এত মোটা—অথচ লোকে ভাবে তিনি কী মহৎ! আমার মনে হয় যে, গড়পড়তা য়ুরোপীয় ভদ্রলোক আজকের দিনে যে ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত, দীনদরিদ্র মানুষের জন্যে সত্যি ব্যথাবোধ করলে সে রকম সুখসর্ব্বস্ব জীবন যাপন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হ'ত—যেমন রুষদেশের অনেক আন্তরিক বল্‌শেভিকদের কাছে আজ হয়েছে। কিন্তু এরা কারা জানেন? এদের অধিকাংশ জারের শাসনে সাইবিরিয়ায় পনর, কুড়ি, বাইশ বৎসর জেল খেটেছে। য়ুরোপের বল্‌শেভিক!" ব'লে একটু হেসে বললেন: "ভারি লাভজনক ব্যবসা রায় মহাশয়!" (আর আমাদের দেশের বল্‌শেভিকদের সম্বন্ধে? বুঝ লোক যে জানো সন্ধান!—না কি?)

কিন্তু এইখানেই যে গোল! এ রকম জীবনে যারা অভ্যস্ত তারা কি প্রথম চেষ্টাতেই বল্‌শেভিস্‌মের মতন এমন একটা মস্ত আন্দোলনকে অনাসক্তভাবে দেখতে পারে? Arm-chair criticism সহজ ও তার মধ্যে হয়ত অনেক সময়ে সত্যও থাকে—কিন্তু এ রকম সমালোচনা কি কোনও বড় আন্দোলনের প্রাণ স্পর্শ করতে পারে সত্যিই? এটা যে কত কঠিন তা রাসেলের মতন মানুষও উপলব্ধি করেছেন। তিনি কর্ণওয়ালে সেদিন আমায় বলছিলেন যে তাঁর Theory and Practice of Bolshevismএ তিনি বল্‌শেভিস্‌মের উপরে একটু অবিচার করেছেন। কেন, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন: "কারণ সে-সময়ে আমি বল্‌শেভিস্‌মকে বড় বেশি কাছ থেকে দেখেছিলাম—যেটা এই কয়েক বৎসরের অতিপাতেই আমার চোখে ধরা প'ড়ে গেছে।" রাসেলের মতন মহাপ্রাণ, তীক্ষ্নদর্শী, সত্যসন্ধী মানুষের পক্ষেও যদি একথা সত্য হয় তবে অন্যে পরে কা

কথা! তাই আমার এক একবার মনে হয়, এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল পন্থা বোধ হয় বল্‌শেভিস্‌মের বিপক্ষে বিশেষ কিছু না বলা—বিশেষত যখন তার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করার সম্ভাবনা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের পক্ষে পনর আনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। পুলিশ কোর্টে সামান্য অভিযোগের ক্ষেত্রেও অভিযুক্তের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা স্বাভাবিক এমন লোককে বিচারক করা হয় না। কিন্তু বল্‌শেভিস্‌মের বিচারক ও মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারক হ'তে আমরা কতই না ব্যগ্র—যখন বল্‌শেভিস্‌মের জয় হ'লে আমাদের লোকসানই হবে ষোল আনা।

সেদিন আমার বন্ধুপত্নীর সঙ্গে রুষ ছায়াচিত্র নির্বাহক জগদ্বিখ্যাত আইসেনষ্টাইনের* "ষ্ট্রাইক" ব'লে একটি চিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। জায়া বললেন "Das ist sin propaganda—gewiss" (এটাতো একটা প্রপাগাণ্ডা—নিশ্চয়ই)। স্বীকার করতে হ'ল যে এদের উদ্দেশ্য প্রপাগাণ্ডাই বটে। কিন্তু তবু জারের সময় শ্রমজীবীদের অবস্থা কি রকম ছিল তার চিত্র দেখে বিচলিত না হ'য়ে থাকাও কঠিন। মনে হ'ল যে, বর্তমান সভ্যতার যতই গুণ থাকুক না কেন—যে-সমাজ শতকরা নব্বই জন মানুষের উৎপীড়নে চোখ বুঁজে থাকে তার মধ্যে কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ আছেই আছে, আর বল্‌শেভিজমের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন—যে-প্রচেষ্টা শতকরা নব্বইজন মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদন ও ভদ্রভাবে বাঁচবার সুযোগ দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করে তার

---

* Potemkin নামক film ইউরোপে একটা তোলপাড় ক'রে দিয়েছে। সব ছায়াচিত্র বিশেষজ্ঞই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে বর্ত্তমান সময়ে রুষ জাতি ছায়াচিত্রে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

মধ্যে অন্তত একটা শুভবাণী থাকা যে সম্ভব এ বোধ হয় খানিকটা সাহস ক'রেই বলা চলে।

এক বন্ধু সেদিন প্যারিসে আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন। তিনি তিন বৎসর রুষদেশে ছিলেন—বল্‌শেভিকদের অভ্যুত্থানের সময়ে। তিনি বলছিলেন যে, কী যে সে অত্যাচার বলবার নয়। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এ অত্যাচার কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঔদাসীন্য ও ক্যাপিট্যালিস্টদের বিরুদ্ধাচরণের সংঘর্ষেই ঘটে নি? য়ুরোপে শ্রমজীবীদের জঘন্য বস্তিগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কী নরক সে! অথচ মানুষের অধিকাংশকেই এভাবে যুথের ঘানিতে বেঁধে তাকে দিয়ে মুনফার তেল বের ক'রে নেওয়ার কাজে শুধু শাসনকর্তারাই তো নন—অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষও কি এ যাবৎ সায় দিয়ে আসেন নি? তবে? বল্‌শেভিকরা যদি আমাদের বলেন "আমরা মধ্যবিত্তের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছি যদি ধ'রেও নিই তাহ'লেও তো সাব্যস্ত হয় না যে, তোমরা শ্রেষ্ঠতর জীব—যেহেতু আমরা যদি শুধু মধ্যবিত্তদের উৎপীড়ন ক'রে থাকি—যাদের সংখ্যা শতকরা কুড়ি—তোমরা চড়াও হয়েছ নিখিল শ্রমিকদের উপর—যাদের সংখ্যা শতকরা আশি।"

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"যারা কাঁচের বাড়িতে বাস করে তাদের অপরের প্রতি ঢিল ছোড়া উচিত নয়।" তাই আমাদের পক্ষে বল্‌শেভিকদের নিষ্ঠুরতায় বেশি উদ্দীপ্ত হওয়াটা শোভনও নয়, নিরাপদও নয়।

তবু মনে সংশয় জাগে—দুদিনেই মানুষের চরিত্রের এ ধরণের কোন মূলগত রূপান্তর ঘটানো সম্ভব কি না। যুগ যুগের জড়তা যাদের অস্থি-মজ্জায় গাঁথা, যুগ যুগের পাশবিকতা যাদের রক্তে, যুগ

যুগের স্বার্থপরতা ও অন্ধতা যাদের স্বভাবে রাজত্ব ক'রে এসেছে,—মাত্র কয়েকজন সংস্কারকের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় তাদের অবসন্ন কল্পনাকে দুদিনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা কি সত্যিই যাবে? অন্তত লেনিন যে খতিয়ে কৃষকদের মধ্যে কম্যুনিজমের মহিমা সম্বন্ধে প্রত্যয় চারিয়ে দিতে পারেন নি—এবং এখনকার মতন আপোষ করলেন সম্পত্তি-বোধের সঙ্গে—এ তো অপ্রতিবাদ্য।

কিন্তু এর উত্তরে ভাববার কথাটা এই যে, মানুষের প্রকৃতির সংস্কারই যে সবচেয়ে বড় জিনিষ সে বিষয়ে মতভেদ নেই বটে—কিন্তু কেমন ক'রে সেটা সাধিত হবে তা নিয়ে মতানৈক্যের না আছে আদি না অন্ত। অথচ দেখা যায় যে অবাধ স্বাধীনতা মস্ত জিনিষ নয়। বর্তমান যুগে সমাজ-ব্যবস্থা দিন দিন এত জটিল হ'য়ে পড়ছে যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও নিত্য নূতন আইন-কানুন মেনে নিতেই হচ্ছে। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে নিত্য নূতন শক্তির সঙ্ঘাত প্রকট হ'য়ে উঠছে। তার সমাধান ও সামঞ্জস্যের ভার আকুল মানুষকে নিত্য-নিয়তই নিতে হচ্ছে। তাই সে দেখে যে, অবাধ স্বাধীনতা বর্তমান সমাজের কাঠামোয় আকাশকুসুম বৈ আর কিছুই নয়। আসল কথা হচ্ছে সামঞ্জস্য, সুষমা—স্বাধীনতার একাকার-করণ নয়।

সেদিন ট্রেণে একজন ফরাসি ভদ্রলোক বলছিলেন "মানুষের বেশি স্বাধীনতা পাওয়াও আবার কিছু নয়। দেখুন না আমরা ফরাসি জাতি বড্ড বেশি স্বাধীন—তাই অন্য জাতি বেশি পরিশ্রম ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে।" ইংলণ্ডেরও সেই অবস্থা। শ্রমিকদল সেখানে ক্রমেই পেছিয়ে যাচ্ছে ফলে শুধু বেকারের বংশ বৃদ্ধি।

ভদ্রলোক আরো বলছিলেন: "বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের এম্‌নি

এম্‌নি দিনে ন' ঘণ্টার জায়গায় ছ' ঘণ্টা খাটালে বাকি তিন ঘণ্টা শুধু শুঁড়িখানায় জনসমাগম বাড়বে বৈ ত নয়? শীতের দেশে দিনে আট ন' ঘণ্টা করে খাটানো কিছু বেশি নয়।" এর উত্তর অবশ্য সহজ যে, অবসর দেওয়াটাই ত সবচেয়ে বড় কথা নয়, অবসরের সদ্ব্যবহারের শিক্ষাটাই সব আগে দরকার।

যাই হোক্, এটা যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, স্বাধীনতা ব'লে হাঁক-ডাক করার আগে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষের চোখ ফোটানো দরকার, তাহ'লে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার কার্যকারিতাও যেমন মানতে হয়—সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে জোর খাটানোর প্রয়োজনীয়তাও তেম্‌নি স্বীকার করতে হয়। আরও এইজন্যে যে, মানুষ দেখেছে যে তার প্রকৃতিকে খারাপ হবার সুযোগ না দিলে তাকে ভালো রাখা বেশি সহজ হয়। যেমন মোড়ে মোড়ে শুঁড়িখানা থাকলে মদ্যপানের প্রবণতা বাড়ানো যায় আর কমালে মদ্যপান কমে, তেম্‌নি এ যুগের মনীষীরা ক্রমাগত এই কথা বলছে যে, বাইরে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করলে তবেই ভিতরের মানুষটাকে বিশেষ বিশেষ ভাবে বদ্‌লানো সম্ভব। কেননা, মানুষের পারিপার্শ্বিক বদ্‌লালে তার মন যে কমবে।

কিন্তু এখানে আবার আর একটা কথা: আজ পর্যন্ত মানুষের অন্তরাত্মার শেষ প্রশ্নের—"ততঃ কিমের" উত্তর কোনো শাসনতন্ত্রেই মেলে নি। অথচ প্রতি সভ্যতার মধ্যেই কয়েকটি মহৎ সত্য দেখা দিয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতায়—ধ্যান ও নিষ্কাম কর্মিষ্ঠতা; খৃষ্টধর্মে—সেবা; বৌদ্ধতন্ত্রে—মৈত্রী; বিজ্ঞানচর্চায়—নিরপেক্ষ জ্ঞান-সাধনা—ইত্যাদি। যাঁরা মহাপ্রাণ মানুষ তাঁরা স্বতই প্রতি সভ্যতার বড় বিকাশগুলিকে বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। তাই

তাঁদের মনে ক্ষোভ হয়ই যদি অনিশ্চিত সুফলের লোভে মানুষ তার বহু সাধনার্জিত ধ্রুব সম্পদ হেলায় হারায়। য়ুরোপে রাসেল প্রমুখ মনস্বীদের সমস্যা যে কোথায় সেটা তাই বল্‌শেভিকদের মতন একগুঁয়ে মানুষ হয়ত ঠিক বোঝে না। তারা ভাবে যে, সত্য কাটা-ছাঁটা, নিতান্ত সহজ, একরোখা। হয়ত নিষ্ঠার স্বভাবই এই যে, সে মানুষের দূরদৃষ্টিকে খানিকটা খর্ব করতে চায় আত্মরক্ষার্থে—অর্থাৎ ভূয়োদর্শী হ'লে মানুষ বেশি কিছু ক'রে উঠতে পারে না ব'লে। কিন্তু তাই ব'লে ত বলা চলে না যে, মুক্তি মিলতে পারে শুধু ঐ অন্ধ নিষ্ঠায়! বস্তুত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ পদে পদে নম্রই হয়—তার সবজান্তা ভাবটা ক'মেই যায়—বাড়ে না কখনো।

তাই বলা চলে বোধ হয় যে, বল্‌শেভিকরা জগতের মুক্তির চরম বারতার খবর পেয়েছ একথা সম্পূর্ণ সত্য হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

অথচ…তবু…একটা কোনো সত্য তারা পেয়েছেই। নইলে জগতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের কাড়ানাকাড়া ও ডামাডোল আজ এমন উগ্র হ'য়ে উঠত না।* আমেরিকায় সাকো ও ভান্‌জেটি বিচারকের অবিচারে প্রাণ দিল আর কোথায় মানুষ মস্কোতে তার জন্য শোকসভা করল! তাই মানতেই হয় যে, সমস্ত জগতের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তারা মানুষকে একটা বৃহত্তর, গভীরতর ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা পেয়েছে। আরো ভাববার কথা বোধ হয় বর্তমানে নব্য চীনে তাদের প্রভাববিস্তার—তা রয়টার যতই কেন

---

* একথা যে যুক্তি হিসাবে অগ্রাহ্য তা পরে বুঝেছিলাম। প্রেমের চেয়ে হিংসায় বেশি সাড়া দেয় সবদেশেরই মানুষ। বলশেভিস্‌মের জয়জয়কারও এইখানেই—তার মূল মন্ত্র class-war ওরফে have-দের বিরুদ্ধে have-not-দের বিদ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা। এ নীতি পপুলার হবে না?

না তার করুন যে বোরোদিন সাংঘাতিক ধূর্ত তথা কপট। শুধু ধূর্ততা কপটতা মিথ্যার জোরে একটা আন্দোলনকে এতদিন ধ'রে উঁচু ক'রে ধ'রে রাখা যায় কি?—শুধু উঁচু ক'রে রাখা নয়—জগতের এক প্রান্ত অবধি সমগ্র জগতের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার বিরুদ্ধে এভাবে যায় কি তাকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করা?

অন্যদিকে এ-ও ঠিক যে, বর্তমানে বুর্জোয়া সভ্যতার অনেকগুলি সুন্দর ফুল বল্‌শেভিক সঙ্ঘবদ্ধতার আবহাওয়ায় ঝ'রে যাবেই। বন্ধু-বরের বইয়ে আছে, রুষদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা কি রকম কবিতা লেখেন। বর্তমান রুষ কবি-মনস্বিবৃন্দ বলছেন:

"Art does not represent life but makes new life. It is not a mirror in the hands of the futile bourgeois but a hammer in the fist of the proletarian."

ব'লে এরা প্রমাণ দিচ্ছেন এই হাতুড়ীপন্থী কাব্যের ধারা কি রকম হবে। দুই একটা নমুনা দেই:—

"Up! Up! ye people, avengers of the world's suffering!

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

Ye workers, now smash to pulp
With your fists that phantom God!
You are master of the fate of the world!
Ye workers! You are free free!
Arise ye people triumph!

Onwards ! Triumph ! March ! march !

*   *   *   *

Dem'ian Bednyi

Your soul !

Steam, compressed air electricity !

So for the alms-givers, the navel-gazers,

Let the axe dance over their bold parts.

*   *   *   *

Maiakovsky.

ওঁরা দু'জনেই নাকি বর্তমান বল্‌শেভিক কাব্য জগতের দু'জন দিক্‌পাল। শেষোক্ত কবির কবিতাটিকে বলা হ'য়েছে নাকি "A great Epic of the Russian Revolution."

এই যে হাতুড়িয়ানা-কাব্য, এর প্রবর্তক অবশ্য রুষ সম্পাদকেরা নন—এ সুর আগে বেজেছিল বিখ্যাত ডি এইচ লরেন্সের পদ্যে। তিনি আরও ধনুর্ধর, গদ্যছন্দেই বললেন :

How beastly the bourgeois is especially the male of the species—You're a d—b—b—p bb—, says the worm turned. Quite ! says the other Cuckoo. এহেন মহাকাব্যকে হোমর-ব্যাস-বাল্মীকি-লাঞ্ছিনী কাব্য/সাধিনী না বললে আবার ওঁরাও বলেন এই-ই তো বুর্জোয়া—মহা ফ্যাশাদ ! এঁদের ভাবটা—

ওরে হলধর ! ক্ষিদে পেলে কেন চেঁচাস্ ?

ওটা বুর্জোয়া যে রে !

ওরে শশধর ! চাঁদ দেখে হাত বাড়াস্ ?

এ বুর্জোয়াটা কে রে ?

ওরে প্রেমেভোর ! কাকে তুই ভালবাসিস্ ?—
বুর্জোয়া মেয়ে মানুষ।
ওরে নেশাখোর ! কোন্ কাব্যেরে মানিস্ ?—
বুর্জোয়া ফেনা ফানুষ ?

লরেন্স ছিলেন থিওরির ক্ষেত্রে একজন গোঁয়ারগোবিন্দ, তাই লিখেছিলেন কাথারিন কার্সোয়েলকে :

"The essence of poetry with us in this age of stark and unlovely actualities is a stark directness, without a shadow of lie, or a shadow of deflection anywhere. Everything can go, but this stark, bare, rocky directness, this alone makes poetry to-day."

অলডাস হক্সলির "Letters of Lawrence" বইটিতে এ-চিঠিখানি প'ড়ে কয়েক বৎসর বাদে আমি শ্রীঅরবিন্দকে এ-লাইন কয়টি উদ্ধৃত ক'রে পাঠাই লরেন্সের "Pansies" নামে কবিতাগুলোর সাথে। প'ড়ে তিনি খুব হেসে লিখেছিলেন (সূর্যমুখীর শেষ গণ্ডছন্দের শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) :

"The other day I opened Lawrence's 'Pansies' once more at random and came upon this :

I can stand Willy Wet-leg
Can't stand him at any price
He's resigned and when you hit him
He lets you hit him twice

Well, well, this is the bare, rocky, direct poetry ?

God help us!...This is the sort of thing to which theories lead a man of genius." *

শ্রীঅরবিন্দ সুন্দর ক'রে দেখিয়েছেন কেন এ-ধরণের আতিশয্য কাব্যে অচল। বলছেন (সূর্যমুখী ৪৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য): "What the modernist metereless verse does is to catch up the movements of prose and try to fit them into varying lengths and variously arranged lengths of verse. Sometimes (অর্থাৎ আধুনিক ছন্দে) something which has its own beauty or power is done—though nothing better or even equal to the best that was done before, but for the most part there is either an easy or a strained ineffectiveness. No footsteps hitting the earth! Footsteps on earth can be a walk, can be prose: the beats on of poetry can on the contrary be a beat of wings."

কিন্তু কাব্য বা রসলোকের শাশ্বত রসিক সমজদারে মানতেই পারেন না এধরণের স্বৈরাচারী ডিক্টেটরশিপ্। ও চলে পশুবলের রাজ্যে। শিল্পের রাজ্যে মানুষের হৃদয় যাতে গভীর আনন্দ পায় তাকে রসকৃষ্ণ স্বয়ং রাখেন—মারে কার সাধ্য? তাই এ ধরণের মল্লভৌমিক দাঁত-কিড়িমিড়ির প্রতিবাদেরও দরকার নেই—এ-উৎপাতকে

* সূর্যমুখীতে লরেন্স সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘতম মন্তব্য দ্রষ্টব্য, অবশ্য এ কবিতাটাই লরেন্সের "একেলে" কবিতার একমাত্র নমুনা নয়—তবে আমার বক্তব্য ছিল এই যে জোরালো ভাষায় বলতে পারলে এধরণের হসনীয় পাগলামিকেও লোকে মনে করে দৈববাণী।

"মারিবে যে (হৃদয়ের) গোকুলেই বাড়িছে সে।" এ-ধরণের হৈচৈ লণ্ডভণ্ডামি মানুষ সয় আজ কাল দুদিন—তাও ঝোঁকের বশে, গায়ের জোরে—তিনদিনের দিন তার মৃত্যু অবধারিত। কারণ গায়ের জোরের শমন জারি করা চলে শুধু বাহুবলীদের কাছে—যারা রসের জগতে আলো আনে না—আনে শুধু বন্ধ্যা তাপ। তাই বল্‌শেভিক কাব্য যতই মুখ খারাপ করুন না কেন, মানুষের স্বভাব কোনোদিনও বেড়্নি, মায়াকভ্‌স্কি বা লরেন্সকে দেবে না শেক্ষপীয়র, দান্তে, শেলি, এস্কাইলাসের স্থান।

এ সম্পর্কে মনে পড়ে আমার রসিক বন্ধু শাহেদ সুরাবর্দির কথা। তিনি রুষদেশে বিপ্লবের সময়ে ছিলেন কয়েক বৎসর। তিনি আমাকে বার্লিনে বলতেন প্রায়ই যে রুষদেশে এই কথাটি শুনতে শুনতে তাঁর মগ্ন চৈতন্যের পাষাণ ফলকে প্রায় খোদাই হ'য়ে গিয়েছিল যে শেক্ষপীয়র একজন তৃতীয় শ্রেণীর বুর্জোয়া কবি।

"আর রবীন্দ্রনাথ ?"

"পঞ্চম শ্রেণী ও ষষ্ঠ শ্রেণীর মাঝামাঝি।"

এটা কিন্তু নিছক কৌতুকের কথাই নয়। এর মধ্যে মস্ত একটা ট্রাজিডিও আছে। মানুষের-হাতে-গড়া সভ্যতায় (অন্তত আজ অবধি) তার শ্রেষ্ঠতম ললিতকলা হ'য়ে এসেছে চিরকালের জন্যেই। যে সভ্যতা বা মনোভাব শুধু একটা নিগূঢ় জ্বালা বা প্রতিশোধ কামনায় মানুষকে বোঝায় যে তার বহুসাধনাবিকশিত পুষ্পশ্রীর অনাদরেই পরমপুরুষার্থ, সে-সভ্যতা বা মনোভাব অন্তত সৌন্দর্য-সাধনার পক্ষে খুব অনুকূল হবে মনে হয় না। হয়ত এ-মনোভাবে অন্নবস্ত্রের কোঠায় মুনফা বাড়তে পারে—কিন্তু তা বাড়লেই যে বাগানের পুষ্পসমৃদ্ধিও বাড়বে এমন কথা জোর ক'রে বলার মধ্যে কি বিপদ্ নেই ?

অনেক চেষ্টায় অনেক সাধনায় অনেক দুস্তর কান্তার-প্রান্তর অতিক্রমের ফলে চিন্তা শিল্পকলা প্রভৃতির সৃষ্টিতে দেখা দেন আরাধ্যা বরদা কিন্তু তখন তাঁকে অসম্মান করলে তিনি ফের মুখ-গা ঢাকা। অন্তত ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই-ই মানুষের আবহমানকালের অভিজ্ঞতা। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার চরম বিকাশ তান্ত্রিক ব্যভিচারে বহুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়; গ্রীক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিতকলা প্রভৃতি রোমক সভ্যতার হৃদয়-হীনতার আওতায় যায় শুকিয়ে; য়ুরোপের নিষ্কাম বিজ্ঞানসন্ধিৎসাকে যুদ্ধের মারণাস্ত্রের কাজে লাগানোর ফলে বিজ্ঞানের কী গ্লানি হয়েছে তাও প্রত্যক্ষ। আরো ঢের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাই মনে শঙ্কা হয়ই, পাছে বলশেভিকদের জয়জয়কার হ'লে জগতে কালিদাস শেক্ষপীয়র, প্রমুখ বিশ্বকবিদের জন্ম অসম্ভব হ'য়ে উঠে!

সেদিন বন্ধুবর বার্লিনের একটি বিখ্যাত উফার ফিল্ম্ দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজকালকার ছায়াচিত্র জগতে প্রতীচ্যে রুষজাতির পরেই নাকি জর্মণ উফারের নাম। কিন্তু রুষ ফিল্মের সঙ্গে উফারের প্রভেদ কী আকাশ-পাতাল!

সঙ্গে মনে পড়ল মনীষী পল রিশারের কথা যে চল্‌তি য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হ'য়ে গেছে। তবে গ্রীক সভ্যতা যেমন য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে নবজন্ম নিয়েছে তেম্‌নি য়ুরোপীয় সভ্যতাও হয়ত রুষ সভ্যতার মধ্যে অম্‌নিই একটা অচিন্তিত উপায়ে নবজন্ম লাভ করবে। কে জানে?

এ স্বপ্নের মধ্যে কতখানি সত্য আছে বলা যায় না, তবে এটা বলা যায় যে, নাট্যকলায়, ছায়াচিত্রে, নব শাসনতন্ত্রের আইডিয়া প্রচারে রুষজাতি একটা অবিসংবাদিত সত্যের নাগাল

পেয়েছে। একটা ঘটনায় ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ল।

উফার ফিল্ম্‌টির পরে হঠাৎ হিণ্ডেনবার্গের প্রপাগাণ্ডা হ'ল। "তিনি যুদ্ধের সময় ৯০,০০০ রুষ সৈন্যকে একেবারে নির্মূল করেছিলেন" (ঘন ঘন হাততালি); "আজীবন যুদ্ধ ছাড়া কিছু জানেন না" (ঘন ঘন হাততালি); "জর্মন জাতি! এক হও, আবার আমরা উঠবই" (ঘন ঘন হাততালি) ইত্যাদি।

বন্ধুবর বললেন: "সুকুমারমতি নর-নারীর পক্ষে উফার ফিল্ম দেখা অকর্তব্য। নইলে আজও অমন নির্লজ্জভাবে ফিল্ম প্রপাগাণ্ডা চলতে পারে যে, ৯০,০০০ মানুষকে যে নিকেশ করল, সকলে মিলে এসো করি তাঁরই জয়ধ্বনি !!"

আমি বললাম: "য়ুরোপ গত যুদ্ধ হ'তে কিছু শিখেছে বলে তো মনে হয় না, রাসেলও সেদিন আমাকে বলেছিলেন, যুদ্ধের পরে জগতে অন্ধ জাতীয়তা যেন আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তীক্ষ্ণ-ধী নর্মান এঞ্জেল তাঁর "পাবলিক মাইণ্ড" বইটিতে লিখেছেন যে, vox populi vox dei—জনসাধারণের বাণী ঐশবাণী তো নয়ই—যদি হয় তবে উল্টোটা।

বন্ধুবর বললেন: "দুঃখ এ নয় দিলীপ যে, যুদ্ধ এ য়ুরোপে আবার বাধবে—কারণ দায়ে ঠেকে, পোড় খেয়ে যুদ্ধকে আজকের দিনে আমরা প্রায় ভূমিকম্প, ঝড়, প্লাবন বর্গীয় প্রাকৃতিক বিপ্লবের মতনই মনে করি—দুঃখ এই যে, মানুষ এত সহজে গত যুদ্ধের নরকযন্ত্রণা ভুলতে পারল! মানুষ ইতিহাস পড়ে কেনই বা? তা থেকে কি শেখে কখনো কিছু?"

য়ুরোপের মহাপ্রাণ মানুষদের হতাশার এই 'আর্তস্বরে দুঃখ হয়।

সত্যিই তো, সমগ্র য়ুরোপ আজ যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী ব'লে ধ'রে নিয়েই চলেছে সেই ব্যাদিত-ব্যাদান অতলস্পর্শী ধ্বংসের মধ্যে যেখানে সব সৌন্দর্যের শ্মশান-সমাধি। আমাদের কল্পের ও প্রলয়ের ধারণা হয়ত একেবারে অর্থহীন না হ'তেও পারে!...

যুদ্ধ ফের হবেই এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ হবে আরও ভয়ঙ্কর—এ-ও জোর ক'রেই বলা যায়। সমগ্র পাশ্চাত্যের চিন্তাকাশে মদমত্ত রণঘনঘটা আর কিসেরই বা সূচনা করে, ধ্বংসের ছাড়া? সেদিন আমেরিকা ঠিক করেছে যে, রণসজ্জায় ঢিলে দেওয়া কিছু নয়, অবিলম্বে নৌবাহিনীতে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হ'তেই হবে। ফ্রান্স সামরিক বিমানযানের প্রসারে বদ্ধপরিকর। ওদিকে জর্মনি তার অসামান্য অধ্যবসায় নিয়ে আবার সামরিকতার প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ করেছে ছায়াচিত্র প্রভৃতিতে। রুষদেশের সেনাবাহিনী নাকি বর্তমান সময়ে ফের এমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে যে সমগ্র য়ুরোপ ওকে ভয় ক'রে চলে। এমন কি চীন যে চীন, সে-ও আফিং-খাওয়া, টিকি-রাখা ও তুড়ি-দেওয়া ত্যাগ ক'রে রুষদেশের সহযোগিতায় পদদাপে বিশ্বকে সচকিত ক'রে তুলল বলে। নব্য তুর্কা পুরাতন সনাতন গতানুগতিকতা ও অন্ধতা ত্যাগ ক'রে নব জাগরণের ব্রত নিল। এসব দেখে শুনে কি কারুর সন্দেহ থাকতে পারে যে, য়ুরোপ অগ্ন্যুৎপাতের গহ্বরমুখে আসীন? কাজেই বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎ নিয়তিবাদীর মতন যুদ্ধকে যদি অবশ্যম্ভাবীই মনে করে তাহ'লে তাকে দোষ দেবে কে?

মুশকিল হচ্ছে এ গোলকধাঁধার মধ্যে পথ খুজে বের করা। নর্মান এঞ্জেল লিখছেন যে, আমাদের হৃদয়াবেগ প্রভৃতি যেন জাহাজের স্টীম আর যুক্তি যেন জাহাজের কম্পাস; কিন্তু কম্পাস ক্ষুদ্র হ'লেও তার উপরেই বিরাট স্টীমশক্তির সুপ্রয়োগ নির্ভর করতে

বাধ্য। অথচ হাল আমলে আমরা শুধু স্টীমই বাড়িয়ে চ'লেছি কম্পাসকে অবহেলা করে—যেহেতু সে নাকি ক্ষুদ্র !"

কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরাই আজকের দিনে ভাবছেন তাঁরাই ক্রমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাধ্য সম্বন্ধে উত্তরোত্তর বিশ্বাস হারিয়ে বসছেন। অর্থাৎ—উপায় কি ? যুদ্ধ যে জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির মতনই প্রকৃতির একটি অন্যতম বিপ্লব। একে রুখবে কোন্ মনীষী ? হায় রে, কেউ কি জানে ?

জাতির সমষ্টি এত গুরুভার হ'য়ে পড়ছে যে, ব্যক্তিগত চেষ্টার শক্তি ক্রমেই কমে আসছে। আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ ভাবুকেরা এই দুর্যোগের গুমট দেখে বড়ই বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। দু'একটি উদাহরণ দেই :

নর্মান এঞ্জেল তাঁর "পাবলিক মাইণ্ড" বইটির শেষে দুঃখ ক'রে লিখছেন : "বস্তুর নিয়ন্ত্রণে ও আবিষ্কারে আমরা অনেকাংশে আপ্তকাম হয়েছি। বাষ্প, বিদ্যুৎ ও ঈথরকে দিয়ে আমরা যা চাই অনেকটা করাতে পারি বৈ কি। কিন্তু আমাদের গণমনের মেজাজ ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে ঠিক তা পারি কি ? সেখানে আমরা শুধু অন্ধ শক্তির হাতের খেলার পুতুল বৈ আর কিছুই তো নই—আর এসব শক্তিরা এমন, যাদের আমরা না পাই দেখতে, না বুঝতে, না বাঁধে রাখতে।"

রাসেল তাঁর Principles of Social Reconstructionএ যে দু'চারটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন তা প্রায় হারিয়ে আজ দেউলে হ'য়ে ব'সে। তিনি নির্ভীক মানুষের মতন অনেকটা এই কথাই বলছেন, যে, চেষ্টা করা গেল কিন্তু পারা গেল না ও না-পারার কারণও আছে এবং এ কারণগুলিকে বুঝতে পারলে হয়ত এখনও আশা করা যেতে পারত ; কিন্তু জীবনের সাক্ষ্য দেখে শুনে মনে হয়

এ কারণগুলিকে বোঝার চেয়ে নরহত্যাই মানুষের বেশি প্রিয় কাজ। তাই ইস্তফা দিতে হ'ল।

কর্ণওয়ালে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, "কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটিতে ফিরে গেলেন না কেন?"

রাসেল একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন: "এক সময়ে আমি য়ুনিভার্সিটির আবহাওয়া ভাল বাসতাম—যখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল যে, অন্ততঃ য়ুনিভার্সিটিতে জ্ঞানের চর্চাটাই মুখ্য। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে দেখা গেল যে, যারা য়ুনিভার্সিটিতে গিয়েছিল তারা গিয়েছিল যুদ্ধ করার সুযোগের দুর্ভিক্ষবশেই। সেই থেকে আর য়ুনিভার্সিটির ছায়া আমি মাড়াই না।"

কথাগুলি তিক্ত—ও অত্যন্ত তিক্তভাবে উচ্চারিত ব'লেই খানিকটা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এসব কথার উল্লেখ করলাম প্রসঙ্গত এই সত্যটি ফলাও করবে যে সমাজের কায়া বিপুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের বলিষ্ঠ ত্বরিৎকর্মারাও কি রকম নিরাশাবাদী হ'য়ে পড়ছেন।

এতে কেউই আনন্দিত হ'তে পারে না। য়ুরোপকে ছোট প্রতিপন্ন করাও কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা (নব্যতন্ত্রীর দল) বেশির ভাগ আজ য়ুরোপেরই মানসপুত্র। তাই য়ুরোপের এ হার-মানা যে আমাদের জয়ঘোষণা এমনতর আশ্বাসের পথও বন্ধ।

কিন্তু তবু মনে হয়—কোথায় য়ুরোপ একটা মস্ত গলদ করে বসেছে মানুষের হৃদয়ে তাঁকে অপমান ক'রে যাঁকে ঋষি বলেছেন, বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "সুহৃদং সর্বভূতানাম্।"

এরই ফলে এল ধর্মের গ্লানি—তাই না স্বৈরাচারী গ্রীক ও

রোমক সভ্যতা ডুবল লোভকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে—হিংসাকে মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত ক'রে। উপনিষদে আছে অধর্ম অনেক সময়েই প্রথম দিকে জয়ী হয়—কিন্তু অন্তিমে তার অকল্যাণে মানুষের শুভ-বুদ্ধিরই হয় অকালমরণ। কিম্বা হয়ত এই-ই সত্য যে, জগতের ব্রাহ্মণ্য ও আভিজাত্য সভ্যতা মানুষকে বরেণ্য করে তুলতে পারে নি ব'লেই তার স্থান নিল ক্ষত্রিয় ও শাসকতন্ত্র; তারাও এ অসাধ্য সাধন করতে না পেরে ডাক দিল বৈশ্য ধর্মের পুরোহিতকে। কিন্তু রোগের নিদান দেখে মনে হচ্ছে, বৈশ্য ক্যাপিটালিস্‌ম্‌ও ডুবল বলে।...এখন এক ভরসা কি ঐ রুষদেশের প্রলেটারিয়াটের অভ্যুদয়, বা শূদ্রধর্ম ?...কিন্তু তারাও পারবে কি ? কে জানে ? (শূদ্র বলতে অবশ্য আমি নিন্দনীয় কিছু বুঝছি না)

কলির গড়ুর

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অকুতোভয়েষু !

উড়তে হঠাৎ ইচ্ছে যদি হয়
ওড়াই ভালো—সায়েব শাস্ত্রে কয় ;
মুহূর্তে তাই ওড়ে সায়েব কলির গরুড়যানে।
কিন্তু সখা, বাংলা অভিধানে
'ওড়া'-র আছে রকম রকম মানে :
যথা, হাতে টাকা থাকলে কাকে
"ওড়া' বলে জানোই তো ভাই রাসলীলার রাগে।

আরেক রকম 'ওড়া' আছে
উড়ু-উড়ু কল্পনাতেই সেটা সাজে
মন্দ লোকে সন্দ করে—বুঝি সেটা নেশাখোরেই জানে।
আমরা একে বলি কিন্তু 'আয়েষ'
(ওর্ফে, রঙিন আবেশ)
কিন্তু এ-ও তোমার অচিন—করো নি তো নেশা :
চিরকেলে পেশা
বই পড়া আর কাজ করা—উঃ, স্বভাবে যে তুমি কেমন ছেলে
কে না জানে ? ফাশ্‌ট্ হওয়ার চাবিকাঠি আঁতুড়ঘরেই পেলে !
তবুও যাই হোক
দিলীপ আহাম্মক
এমন বন্ধু পেয়েও হায় চাইল যখন উড়তে—তখন সে
চাইল এটা 'লিটেরালি' করতে চেয়ে রোমান্স-বরণ যে—
একথাটা হলফ ক'রে
বলতে পারি তারস্বরে—
উড়ুক্কু সাধ হ'লো শুধু ধরতে গগনকে।

সে সময়ে পারিসে দিন দিব্যি হেসে খেলে
কাটছিল স্রেফ আড্ডা দিয়ে
গান আড্ডা দাবা নিয়ে
কে জানে কোন্ ছিদ্রপথে বীরত্বেরি ভূতে হঠাৎ পেলে !
ধাঁ ক'রে তাই গেলাম চ'লে শূন্যচারীর শরণ্য আপিসে।

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে
এলাম যখন ইংলণ্ডের টিকিট নিয়ে
মনে হ'ল পকেট-ঠাশা
হ'ল বুঝি দুঃখনাশা
আকাশের ঐ অনন্ত আশীষে।
দুঃখ কেবল—তরুণ ওষ্ঠে ছিলনাকো গুম্ফ সে নীলাভ
বললাম : "দূর্, সস্তা সুখে কী-ই বা হবে,
তাছাড়া নয় কিছুই তো হায় নিখুঁৎ ভবে—"
বাহাদুরি-না-করার এ-বাহাদুরির দীপ্তি অমিতাভ।
যেমন, প্রেমের পাশাখেলায়
হার যে মানে সে-ই জিতে যায়,
কিম্বা যেমন 'হিউমিলিটি' ক'রেই ভাবি—মর্যাদা বাড়াব।

এম্‌নিধারা আত্মপ্রসাদ-পথ চিনে
'আতাশে-কেস' হাতে [illegible] কিনে দিন
হলাম আসীন গড়ুরযানে অপরিসর সীটেই।
বেঞ্চিমতন—লাগল যখন আড়ষ্ট,
রুখে উঠেই গাইলাম : "এতে কী কষ্ট?
আর কেষ্ট পায় কে—ঘুঘু না চরলে তার ভিটেয়?"
যাহোক পরে বারেক নয়টি যাত্রী সাথীর পানে
নজর হেনেই বুঝলাম যে নজর দেওয়ার নেইকো সেথা মানে :
কি না—চারিধারে আমার
দাড়ি গোঁফের অকূলপাথার,
এমন স্থলে ধ্যানই ভালো ইথে নেইকো আন,
কারণ—না থাক উহ্য সেটা—বুঝ বন্ধু যে জানো সন্ধান।

একটি আমেরিকান সায়েব (জানত না তো কপালে কী আছে!)
সঙ্গীকে তার বললে—এ তার প্রথম চড়া ঐরাবতের গাছে।
সে হাসলে: "বাঃ, এমন থ্রিলে ডাল ভাঙলেও হয় তা উপভোগ।"

"শূয়ার্"—সায়েব বললে কেশে,
রাগবে কেন?—ভালোবেসে।

নয় বরাহ—এটা শুধু উচ্চারণের যমজ গোলযোগ।
যেমন যাকে আমরা বলি জঠর—ওরা তাকেই মাথা বলে:

একই পে আর ট সাজিয়ে
অর্থভেদের ফিকির নিয়ে

জানই তো ভাই একই ধ্বনি দেশে দেশে ক-ত রকম ছলে!

যাহোক গৌরচন্দ্রিকাটি রেখে
প্রথম পর্বে অবতরণ করি শুরু থেকে।

উড়ল গড়ুরযান

রোমাঞ্চিত হ'ল শুধু তনুই না—সেই সাথে মন আর প্রাণ।

"বাঙালি যে ভয়কাতুরে
একথাটা আজকে উড়ে"

সাধলাম আমি শপথ, "করতে হবেই অপ্রমাণ"।

কিন্তু বন্ধু, যা ভাবি—তা-ই এ জীবনে হয় কি?
চিত্তাকাশের নবীন মেঘে রঙিন আভা রয় কি?

হঠাৎ পড়ে বিমান দারুণ—হু হু হু হু হু হু—
চমকে তনুর প্রতি অণু বলে—উহু উহু!
মনই তখন দেয় দিলাশা: "ভয় কি?

মাটির পিছুটান আছে তাই
উর্ধ্ব পানে নিশানা চাই
"বিপদ আছে ব'লেই আমোদ—শৌর্যের হয় ক্ষয় কি ?"
একথাটা বুঝবে তুমি নিশ্চয়
ক্লৈব্য যে নয় মনুষ্যত্ব নেই তিলার্ধ সংশয়।
তাছাড়া, আজ হেথায় হারি—'ট্রাই এগেনে' পারিই পারি, নয় কি ?
কিন্তু নীতিগর্ভ বুলি ছেড়ে দিলে যতই বলো না,
স্বভাব মোদের করেই ছলনা,
গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়—তখন গাছের ডগায় আসন সয় কি ?
এ-ও যেন ঠিক তেম্‌নি হ'ল আমার :
দেখতে দেখতে আশে পাশে সবার
ঘটল যখন সেই দৈহিক দুর্ঘটনা
ঘটলেও যার সোজা ভাষায় করা উচিত নয় রটনা :
অর্থাৎ উর্ধ্বপথে খাদ্য নিঃসারণ
(সারি সারি ঠোঙার ম্যানে হ'ল তখন নির্ধারণ
কারণ এদের প্রথমে তো দেখিনি
"বিমান-পুলক" শোনা কথা—ঠেকে তো ভাই শিখিনি)
তখন ঠোঙা হাতে আমি বুঝেছিলাম
(যদিও মাথাঘোরার সাথে যুঝেছিলাম)
প্রতি মিনিট আকুল হ'য়েই খুঁজেছিলাম
মাটির পরে পা বন্ধু, মাটির পরে পা।
বুঝেছিলাম—কবিত্বে যাই হোক না কেন
কল্পনাতে করি যতই রোখ না কেন

প্রাণ 'পাখি' হয় কাব্যে শুধু, বাস্তবে নয় মোটেই
তাই অকূল ঐ ব্যোমচারণে কোকিয়ে কেঁদে ওঠেই—
বিশেষ যখন ঘোলায় ডরে গা বন্ধু, ঘোলায় ডরে গা
দূরে থেকে যা সুন্দর
কাছে করে তা-ই জর্জর
পরের মুখে ঝাল খেতে ভাই মন আর সরে না।
তার উপরে—"আরো আছে?"—নেই? তবে কী ভেবেছ?
অন্নপ্রাশনের সে-অন্ন উঠে এলে কী যে হয়
বর্ণনাতে ব্যাখ্যা করা দিলীপের তো সাধ্য নয়।
সে-অসাধ্য সাধন আমি করতে যাব? ক্ষেপেছ!
তবুও যে আজ হইছি কলম-ব্রতী
সে শুধু ভাই পেতে তোমায় স্বপ্নভঙ্গে আমার ব্যথার ব্যথী,
আর জানাতে—ঘোর বিপাকে প্রাণ কত কী চায় যে!
ভালো দৃশ্য? হায় শিশুপাঠ! নিদেন কালে হায় রে,
ভালো কি আর থাকে ভালো?
আলোর আলোও হয় যে কালো,
মাথা হ'লে নিচের দিকে দেখাও ঘুরে যায় হে!
কথায় বলে: "খালি পেটে প্রেমের গান আর গায় কে!"
যাহোক শোনো—যত বাজে গুজব ওদের গরুড় পাখির 'মজা'!
মিথ্যে রটায়—"নাগরদোলার আহ্লাদ নয় সোজা।"
শুনেছিলাম—চরণতলায়
যা দেখি তাই মনকে গলায়
কোলাকুলি কালোয় ধলায়
সবাই বলে: "ধিক্, এ দেখনি কি?"

গগন থেকে সবুজ মাটি
যা-ই দেখা যায়—পরিপাটি
কত রঙের খুঁটিনাটি
রূপরেখার কাঁপন, ঝিকিমিকি !
জলদমালা গলায় প'রে
আশা যখন শূন্যে ঘোরে
সেই হরষে প্রেমের ডোরে
বাঁধে সবায় হিয়া !
পাখিকে যা দিলেন বিধি
নেই মানুষের সেই পরিধি
দেয় এনে সেই হারানিধি
বৈমানিকী প্রিয়া !
হায় রে কথার জয়ধ্বজা
—নেই মানে যার আছে মজা—
কারণ এসব শোনা কথা—কই আদালত-মূল্য ?
বলেন নি তো মিথ্যে হাকিম : "নেই কো কিছুই ঠেকে
শেখার তুল্য।"

সায়েবেও তাই তো বলে : "সী·ইং নইলে বিলীভিং
বিশশতকে নামঞ্জুর, কল্পনারাই ডিসীভিং।"

বুঝলাম আমি সায়েবপুরাণ সেদিন নতুন ক'রে
যখন বিমান মাঝপথে—উঃ—ঝড়ে গেল প'ড়ে !
শিউরে ওঠে গা বন্ধু, শিউরে ওঠে গা !
শুনতেও কি চক্ষে তোমার ধারা ছোটে না ?

কত কী যে হ'তে পারত !—
বিজলি যদি ঝাপ্‌টা মারত ?—
দেখেছ কি ভেবে বন্ধু, দেখেছ কি ভেবে ?
দেখলে তোমার মন দেবে—সায় দেবে :
যে, আমাদের রথখানি যা দুলল তাতে যায় না খুশি হওয়া,
কোনোমতে যায় বড় জোর সওয়া :
কারণ, দেহের সে-নৃত্যে মন হয় নি যে উৎফুল্ল
একথাটার উল্লেখও বাহুল্য—

মানবে না কি অনুমানেও অন্তত ভাই ?
মানবে ভেবেই বললাম না আর কিছু তাই—
বলি শুধু—সেই ঠাণ্ডায় অধমাঙ্গ যাচ্ছে যখন জ'মে
উত্তমাঙ্গ উঠছে ঘেমে দুলুনি আর উৎসারণের শ্রমে।

তার উপরে—ক্রমে হ'ল কক্ষ-বায়ু জমাট
যেদিকে চাই—বিভীষিকা—কৃতান্তবৎ কপাট !
উপরন্তু (কর্ম বিনা) করছে সবাই সেই কাজ
যেটার পুনরুক্তি করতে পাই লাজ।

তবে এ-দুর্ভোগে আমার লাভ হ'ল এক এই :
জানতাম অন্ধকূপই আছে আকাশকূপ তো নেই—
দেখলাম এটাই ভ্রান্ত-জানা,
সে-ও থাকে যার নেই ঠিকানা
অভিধানে নাস্তি যে—রয় জীবন-গীতায় সে-ই।

আরো, এবং সেটা বন্ধু !—আরো ভয়ঙ্কর !—
কারণ যেটা হাল্কা ভাবি হ'লে সে দুর্ভর
চরণ টলে, মন কূল না পায় যে !
মুক্তিনভেও খাঁচা !—দেখে প্রাণ করে হায় হায় হে !

সত্যিই তো খাঁচার খাঁচা বন্ধুবর !
ভাবো দেখি, উঠতে যেতেই ঠুকল মাথা !—অতঃপর
আরও কি চাই ব্যাখ্যান ? থাক্, নেই চিত্তের সায় যে।
তাই কোরো ভাই আন্দাজ আজ সেটা—
বীরত্বের ঐ ঝোঁকে আমার বাধল কোথায় লেঠা।

"যার কাজ হায় তারেই সাজে,অন্যজনে লাঠি বাজে"—এটা
(জয় হে ভারত !) বুঝেছিলাম সেদিন হাড়ে হাড়ে
বিমান যখন ক্রয়ডন এসে হুহুস্বরে নামল
ভাবলাম আমি ফুশফুশের ঐ ধুক্ধুকিটি থামল !
সান্ত্বনা এক—পাশের সায়েব সঙ্গীটিরো নাড়ী ছাড়ে ছাড়ে।
ক্ষীণ হাস্যে বললাম আমি : "সায়েব, এত ভয় কি ?"
বলল সায়েব : "কী বলছ ? ড্যাম্, ভরসা হেথা রয় কি ?
"রগ ঘেঁশে আজ বেঁচে গেছি—ভবিষ্যতে আর
"বিমানে রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হ'লেও বলব : খবরদার,
"অতি-লোভে তাঁতি নষ্ট ওরে মন !
"নভচারণ নামটিও নয়—কথা শোন্
"ডাঙার মানুষ ডাঙায় থাকুক বেঁচে বর্তে টায়ে টায় !
"বল্ দেখি, কোন্ বিড়ম্বনার ঘূর্নিবায়
"কার উদ্দেশে চাস যেতে তুই উড়ে

"বজ্রবাদল ফুঁড়ে ?
"রাখ্ বেকুফি, মাটির ছেলে থাক নারে তুই মাটির কোলই জুড়ে।
"স্বর্গ ? যদি থাকতই সে হাওয়ায়
"মর্ত্য আশার অকূলে সে কোন্ চাষা নাও বাওয়ায় ?
"তর্কে এঁটে পারবি নে তুই, এম্‌নি দেব তুড়ে।"

ব্যথা দিয়ে বুঝে ব্যথা
সায়েব যখন বলল টেনে মনের কথা
নতুন ক'রে বুঝলাম আমি যেন আবার বন্ধুবর—

মিথ্যে ঋষি বলেন নি যে, নিরন্তর
টাঙিয়ে রাখা চাই মনে যে, নিজধর্মে নিধনও
ভালো পরধর্ম চেয়ে—তাই উড়ো ঐ ম্লেচ্ছ জাহাজ কক্ষনো
চড়ব না আর, চড়ব না আর, চড়ব না—
তিন সত্যি করলাম—আমি মর্তবাসী, অমর্তে ঘর গড়ব না !
ঘর তো না, সে 'ঘরের ডবল'—থাকৃতে হ'ল ছিপি এঁটে কানে !!
এমন কর্মভোগের কী যে মানে !!!
আমোদ ব'লে চাই কা'কে, হায়, তা-ই কি মানুষ জানে ?
ঋষিই তো নয়, বিশ্বকবিও বলেন নি কো মিথ্যে :
"যা-ই চাই তা ভুল ক'রে চাই"
ঠিক যে কী চাই জান্তে তা ভাই
চাই কিন্তু বুদ্ধি এবং বিত্তে।
তবে কিনা দশচক্রে বুদ্ধিলোপ,
বিত্তেও সেই ঝোপ বুঝে হায় মারে কোপ :
কুমন্ত্রণা দেয় কানে যে চাই মানুষের কীর্তিলোভ।

তাই তো যখন পৌঁছুলাম ঐ ক্রয়ডনে,—
(টলছে চরণ, ঘুরছে মাথা বন্‌বনে)
শ্বেতাঙ্গিনী হোস্‌টেসকে বললাম হেসে : "বান্ধবী !
কী আনন্দ যে—সাধে কি 'জয় বিমানের'—গায় কবি !
হবেই তো—এ কে না জানে ?
গাছও তাকায় আকাশ পানে
নরই শুধু রইবে ধুলোয় ?—তাছাড়া বাঃ, নীল আকাশের কোল পেলে,
নটরাজের রোমান্সের ঐ দোল খেলে,
মাটি মায়ের আঁচলে চায় থাকতে বাঁধা কোন্ ছেলে ?
ব্রেভ্‌রা ছাড়া আর কে মঞ্জু স্বয়ম্বরার মন পেলে ?

গুণী সুরেন্দ্রনাথ

রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার আজ আর নেই। গত ভাদ্রমাসে (১৩৩৮) প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু তাঁকে আমাদের সুখ-দুঃখের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম। ১৮৮৭ সালে বি-এ অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তার পরেই ডেপুটি পরীক্ষায় পাঁচশ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সাহিত্যে, বিচিত্রায়, ভারতবর্ষে, আরও নানা পত্রিকায় তাঁর কত ছোট ছোট রসাল গল্পই যে বেরিয়েছে ! (যাদের মাত্র কয়েকটি "কর্মযোগের টীকা" ও "যেহেতু ও সেহেতু" নামে দুটি বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।)

তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প বাংলা গল্পে হাস্যরসের একটি বিচিত্র নবধারার প্রবর্তন করেছে।

কিন্তু আমাদের কাছে আজ আলোচ্য তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা নয়, তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা।

এহেন প্রতিভা কালেভদ্রে এক-আধটা চোখে পড়ে।

তাঁর ভৈরবী, তাঁর মালকোষ, তাঁর সিন্ধু, তাঁর ভুপালি, তাঁর বেহাগ, তাঁর পুরিয়া, তাঁর বাগেশ্রী, তাঁর ইমন, তাঁর কানাড়া যে শুনেছে সে জানে গানে কী আশ্চর্য নব দীপ্তি, নব সূক্ষ্মকলাকারু, নব সুরসৃষ্টির ঢেউ খেলত তাঁর হিন্দুস্থানি গানে। আর শুধু হিন্দুস্থানি গানেই নয়। বাংলা গানেও তাঁর স্বরলহরী সুরবিহারে ঢালত সে যে কী মাদকতা! বলতে গেলে, এযুগে ভারতে যেকয়টি মুষ্টিমেয় স্রষ্টা গুণীর গানে ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরবের তথা নবজন্মের আলো সমুদ্বেল হ'য়ে উঠেছে তাদের মধ্যে এই আশ্চর্য মানুষটির স্থান কারুর চেয়েই কম নয়। বাংলা গানে তিনি প্রথম প্রবর্তন করেন কথার সঙ্গে সঙ্গে তান গাঁথা—আলাদা আ—আ—আ—আ ক'রে তান দেওয়া যে ভাবৈকরস বাংলা কাব্যসঙ্গীতে অচল এ তিনিই প্রথম বোঝেন তাঁর সহজ সুষমাবোধে। একথা আমার "সাঙ্গীতিকী" পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ব'লে এ প্রসঙ্গের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। আজ আমি বলব তাঁর সঙ্গীতের কথা সাধারণ ভাবে।

প্রথমেই মনে হয় তাঁর অপরূপ সুকণ্ঠের কথা। সে-কণ্ঠ শোনবার সৌভাগ্য যাঁরই হয়েছে তিনিই একটা জিনিষ প্রথমেই যেন নতুন করে উপলব্ধি করেন যে, গায়কের স্বভাবের সৌন্দর্য্য তার কণ্ঠলাবণ্যকে কতদূর পরিণতি দিতে পারে। এই সৌকুমার্যে (refinement) বোধকরি ভারতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এক বিখ্যাত ধ্রুপদী ৺অঘোরনাথ

চক্রবর্তী ছাড়া সুরেন্দ্রনাথের মতন অপরূপ কণ্ঠ আমরা শুনিনি। অনেক পরে হাল আমলে আবদুল করিমের কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছিল—হ্যাঁ ভালো গলা, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠা যায় এমন কিছু নয়। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ যিনি শুনেছেন তিনি বুঝবেন একথার মর্ম। কারণ সে তো কণ্ঠ নয়—সে যে একটা ইন্দ্রজাল! আর কত কণ্ঠবিভূতির যোগাযোগ! যেমন তার জোয়ারি, তেম্‌নি তার দরদ, তেমনি সমৃদ্ধি, তেমনি ঔদার্য, তেমনি প্রসার (range)। এ সম্পর্কে একটা ঘটনার উল্লেখ বোধহয় সাধারণ পাঠকের মন্দ লাগবে না।

৺ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে (আমাদের বাল্যকালে) প্রায়ই গানের বৈঠক হ'ত। একদিন সেখানে অঘোরবাবুর গান হয়। এমন গাইলেন তিনি যে কেউ মনে করে নি যে তাঁর সে ধ্রুপদের পরে আর কেউ মুখ খুলতে পারবে। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে-আসরে। সবাই ধরল তাঁকে—বিশেষ কীর্তন গাইতে। বাংলা কীর্তনেও তিনি আনতেন তাঁর তানালাপসিদ্ধ কণ্ঠের এক নবমাধুর্য—"সখী এই তো কানন গো"—"শ্যামপ্রেম সুখ সায়রে আমি মীনের মতন ডুবে রইতেম"—প্রভৃতি নানান প্রসিদ্ধ পদাবলী গানে। তাঁর এক মস্ত গুণ ছিল এই যে তাঁর পায়াভারি ছিল না—গান করতে বলতে না বলতে রাজি। কাজেই তাঁকে বলতেই তৎক্ষণাৎ তানপুরাটি হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে ধরলেন তিনি তাঁর হিন্দি খেয়াল টপ্পা, বাংলা ভক্তিসঙ্গীত—শেষে কীর্তন। দেখতে দেখতে ধ্রুপদের অমন জমাট গাম্ভীর্য মোহ কেটে গেল—সভায় বিছিয়ে গেল সে যে কী মাধুর্যের স্নিগ্ধ সূক্ষ্মদীপ্তি! বিশেষ করে তাঁর কীর্তনে।

গান শেষ হ'লে বৃদ্ধ অঘোর চক্রবর্তী ছলছল চোখে সুরেন্দ্রনাথের চিবুক ধ'রে বললেন "এমন গলা কোথায় পেলে বাবা!"

গল্পটি পাড়লাম আরো এই জন্যে যে কণ্ঠসঙ্গীতে কণ্ঠমাধুর্যের মূল্য যে কত বেশি সেটা আমাদের ওস্তাদপন্থীরা প্রায়ই ভুলে যান। যাবেন না? গান থেকে তাঁরা চান যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। সুরেন্দ্রনাথ এ ভুল করতেন না, কারণ বাংলা গানে তো নয়ই, হিন্দুস্থানি গানেও তিনি চাইতেন না যা ওস্তাদেরা চাইতেন। তাছাড়া অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মালিক হওয়ার দরুণ তাঁর পক্ষে জানা সহজও হয়েছিল গানে কণ্ঠস্বরের দিব্যদীপ্তি কতখানি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। ওস্তাদি গান শুনে অনেক সময়েই চমক লেগেও যে মন ভরে না কেন সেটাও তাই টের পাওয়া যেত তাঁর গান শুনলে। মন ভিজে উঠত তাঁর কণ্ঠের রসমাধুর্যে। অবশ্য একথা বলছি না যে কণ্ঠই কণ্ঠসঙ্গীতের একমাত্র সম্পদ। হ'লে শিক্ষাদীক্ষা কলাকারুর স্থান থাকত কোথায়? কিন্তু একথা বলছি বৈকি যে গানে কণ্ঠের মূল্য ততখানি যতখানি মূল্য রূপে কমনীয়তার, দানে ঔদার্যের, বন্ধুত্বে দরদের, উৎসবানন্দে প্রাণোচ্ছলতার। য়ুরোপে একথা বোঝে সবাই, তাই ওদেশের গায়কগায়িকার আপ্রাণ সাধনা কেমন ক'রে কণ্ঠের উজ্জ্বলতা, জোয়ারি স্বরগ্রাম প্রসার ও রসালতা বাড়বে। মনের প্রাণের সূক্ষ্ম সুষমার আলোছায়া কণ্ঠমাধুর্যের ভাবে ভঙ্গিতে হেলাদোলায় ঠাট ঠমকে যেমন সহজে ফোটে তেমন ফুটতে পারে না অমধুর কণ্ঠের ওস্তাদি নৈপুণ্যে, তানকর্তবে, তালবাঁটে। কিন্তু কণ্ঠের এই যে সূক্ষ্ম কলাকারু এও বিধাতৃদত্ত দান। সবাই এ পারেনা। হার্বার্ট স্পেনসার মিথ্যা বলেননি যে "Many persons are almost incapable of expressing by ascents and descents of voice, any of the gentler feelings":—সত্য। কারণ খুব কম গায়কের কণ্ঠেই বীণাপাণি তাঁর সোনার কাঠি ছোঁয়ান—বিশেষ ক'রে

আমাদের ওস্তাদদের দৌরাত্ম্যে। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু শ্বেতভুজা দুহাতে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই মিষ্টতার মন্দাকিনী—লালিত্যের মুক্তধারা। একান্ত সহজতার বিনায়াসেই তিনি ফুটিয়ে তুলতেন যে-কোনো সূক্ষ্মতম আবেগ। শুধু gentler feelings-ই নয় গরিমা, রঙ্গিমা, মেদুরতা, প্রবলতা, মন্দ্র-গাম্ভীর্য, তার-স্নিগ্ধতা সবই ছিল যেন তাঁর তাঁবে। একজন বড় ফরাসী কবি সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক Jules Lemaitre যে কথা বলেছেন সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলা চলে অবিকল সেই কথা :—"Il fait de tous ces mots ce que d'autres n'en feraient pas : Il y fait passer le phosphore que les grands poetes ont au bout des doigts."

কথার মন্ত্রে সাধিতেন তিনি কত যে আলোকলীলা,
কত ঝিকিমিকি, সোনালি রূপালি ফুলঝুরি লাল নীলা,
ছায়াঘুমন্ত বাণীর কমল প্রাণহীন রবিহারা,
কবির সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় আনন্দে জাগে তারা।

সত্যই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠের ছিল এই বিরল সম্পদ : সুরকবির সোনার কাঠি—God's plenty. কণ্ঠস্বরে একাধারে এত গুণ দুর্লভ—যেকোনো দেশেই।

বাল্যে কোনো ললিতকলারই শ্রেষ্ঠতম আবেদন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় না। কিন্তু তবু যে সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতম শ্রেণীর খেয়াল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারতাম সে শুধু তাঁর কণ্ঠস্বরের মাদকতায়। বেশ মনে আছে—মন প্রাণ সে-মিষ্টতায় যেন রিম ঝিম ক'রে আসত।

তাঁর সুশ্রী উজ্জ্বল আনন ও সরস ব্যক্তিত্বও অবশ্যই এ-আবেশের খোরাক জোগাত—কিন্তু গৌণ ভাবে—কারণ সবার মূলে ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো, দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় দুটো," গানটি তো কত কতবারই তাঁর মুখে শুনেছি। ওর তানের বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধি ও অপরূপ মাধুর্যে রস পাওয়া আমার শৈশব কালে নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তবুও মনে আছে শুধু এ গন্ধর্বকণ্ঠ গুণীর কণ্ঠস্বরের জাদুতে ভক্তের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ কতরকমই না রূপ পরিগ্রহ করত আমার কাঁচা কল্পনায়। যখন তিনি অন্তরায় গাইতেন :

মা ব'লে ডাকব তোরে হাততালি দে নাচব ঘুরে
দেখে মা হাসবি কত আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো

তখন তাঁর তার-সপ্তকের অজস্র তানের উচ্ছল প্রবাহে নয়নের সামনে জেগে উঠত বাংলা গানের মধ্যে এক নূতন সম্ভাবনা। তখন উচ্চসঙ্গীতের কতটুকুই বা বুঝতাম! কিন্তু তবু অজ্ঞাতে শৈশবের সেই মাহেন্দ্র লগ্নে তাঁকেই প্রথম গুরুপদে বরণ করি—তিনিও আমাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ ক'রেই ধন্য করেছিলেন। তাঁর কাছে কত যে শিখেছি তা বলবার নয়, তাই আজ তাঁর তিরোধানের দিনে আমার এই সর্বোত্তম দীক্ষাগুরুর উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

আবাল্য তাঁর গানই আমার অবচেতনায় নিত্য নব ছন্দে উপ্ত ক'রে গেছেন তিনি। আবাল্য বিভোর হ'য়ে শুনে আসছি তাঁর গান। অবশ্য শিল্পকলায় বালকের নিন্দাপ্রশংসার বিশেষ মূল্য থাকতেই পারে না, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গান যত বয়স হ'য়েছে ততই যে বেশি ভালবেসেছি, যতই বুঝতে শিখেছি ততই যে তার মধ্যে গভীরের স্পর্শ পেয়েছি একথার মূল্য নিশ্চয়ই আছে! পরে ভারতের একপ্রান্ত থেকে

অপরপ্রান্ত ঘুরেছি—শুধু গান শুনতে। কিন্তু যতই শুনেছি ততই বুঝেছি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা কী স্তরের ছিল। মহত্ত্বের ধর্মই এই যে সে গ্রহীতাকে দেয় তার গ্রহণ-অনুপাতে। কত নামজাদা গান শুনেছি—যত বয়স হয়েছে ততই তাদের গুণপনার মধ্যে নানা অসম্পূর্ণতা চোখে পড়েছে—বালকের উচ্ছ্বাস-জোয়ারে এসেছে ভাঁটা। ছোট বই, ছোট কবি, ছোট শিল্পীর ক্ষেত্রে এম্‌নিই হয়। কিন্তু বড় বই, বড় কবি, বড় শিল্পী তার প্রবর্ধমান মনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বাড়ে যেহেতু বড়র ধর্মই এই। মনে পড়ে বাল্যে ও কৈশোরে কত গায়ক-গায়িকার গানই না মুগ্ধ হ'য়ে শুনত আমার গান-পাগল বালক-মন। কিন্তু যত দিন যেত তাদের মোহ ঘনিয়ে না উঠে যেত ফিকে হ'য়ে। একা সুরেন্দ্রনাথ আমার বয়োলব্ধ নিবিড়ায়মান রসস্পৃহার ও নব-নবোন্মেষী অনুসন্ধিৎসার খোরাক সমানে জুগিয়ে গেছেন। তাঁর এক একটি গান অজস্রবার শুনেছি—কিন্তু কই কখনো তো একঘেয়ে হয় নি, পুরোনো হয় নি! মনে পড়ে ভাগলপুরে, কলকাতায়, পুরুলিয়ায় তাঁর "পটতোরা" ব'লে একটি ইমন কতবারই না শুনেছি, "বনঘন মুরলিয়া" ব'লে একটি মালকোষ, "রঙ্গিলে লালে" ব'লে একটি বাহার, "ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে" ব'লে একটি দেশ, "বিয়োগা বিধুরা রাজবালা" ব'লে একটি ভৈরবী, "এই তো কানন গো" ব'লে একটি কীর্তন—আরো সে কত গান! কিন্তু আশ্চর্য এই যে কোনো গান কখনো দুবার এক রকম শুনি নি। সেইজন্যে তাঁর আরও কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে আমি প্রায়ই বলাবলি করতাম যে তাঁর গান শেখা কত শক্ত! তাঁর কণ্ঠে নিত্য এত নতুন নতুন ঢঙের তান মিড় ও স্বরবিন্যাস তাঁর অফুরন্ত কল্পনার ঐশ্বর্যে দীপ্যমান হ'য়ে ফুটে উঠত যে শিক্ষার্থী দিশেহারা না হ'য়েই পারত না। শিখব কী—চিত্ত ছেয়ে যেত প্রতিদিনের অভিনবত্বের আবেশে।

তানের কতরকম উদ্ভাবনা!—রসের কী প্লাবন! কূলে কূলে ব'য়ে চ'লেছে ভরা নদী! কোথাও কি এতটুকু দৈন্য আছে? এতটুকু অগভীরতা, এতটুকু পুনরুক্তি, এতটুকু স্রোতের অভাব, গতির বাধা-পাওয়া? নিত্যই মনে হ'ত অমর কবি ভবভূতির সেই—"স্তোয়স্তেবা-প্রতিহতরয়ং সৈকতং সেতুমোঘঃ"

যে-স্রোতোধারা বাধারে বাধা বলিয়া নাহি মানে
সৈকতের জাঙাল ভাঙে উছল অভিযানে।

কত সময়ে তাঁর জাদুকণ্ঠ মুহূর্তে করেছে দূর হৃদয়ের কত অন্ধকার—মনে হয়েছে কবি মরিসের সেই—

The wind that sighs before the dawn
Chases the gloom of night,
The curtains of the East are drawn
And suddenly—there is light!

যে পবন ফেলে দীরঘশ্বাস নব-উদয়ের আগে
শিশির তিমির উধাও উদয়ে তার!
প্রাচী-গুণ্ঠন পড়ে খসি',—ও কী! সে আননে অনুরাগে
ঝরিল সহসা আলোক-গঙ্গাধার!

সত্য! কতদিনই না মনে হ'য়েছে যে এক সুরেশ্বরীর প্রেরণায়ই এ-ইন্দ্রজাল মর্তে নামে। শুধু হায়! সুরেন্দ্রনাথের মতন কয়জন সুরসাধক সে-দেবীর প্রেরণাকে অনাবিল রাখতে সক্ষম তাঁদের গোপন অন্তরের পূত ধ্যান-লোকে? কয়জনা পারেন ভগীরথের তপস্থায় এ অরূপ-ভাগীরথীকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আনতে? কয়জনার ভাগ্য হয় শ্বেতসরোজবাসিনীর অমল ধবল পদাম্বুজ হৃদয়ে ধারণ করবার?

এ সব যে ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাস নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য—একথা

হয়ত সুরেন্দ্রনাথের গান যাঁরা শোনেন নি তাঁদের বোঝানো যাবে না। কিন্তু তাঁর সুর-অলকনন্দাধারে ধৌতগ্লানি হবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছে তাঁরাই জানেন যে এ-তর্পণ একটুও বাড়াবাড়ি নয়। অবশ্য যে-কেউ যে তাঁর গানের মহিমা বুঝবে এমন কথা বলা হবে পাগলের মতন কথা। দরদী হওয়া চাই—মরমী হওয়া চাই—সুরপাগল হওয়া চাই। কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম সুর-মূর্ছনায় যে-নব পেলব সৌন্দর্যেরই মায়াজাল প্রতি মুহূর্তে সৃজন করতেন তার লাবণী ও অপূর্ব অপরূপতা স্থূলদৃষ্টি স্থূলশ্রুতি বে-দরদীর জন্যে নয়। He who hath ears let him hear—একথা বলা যায় সব বড় আর্ট সম্বন্ধেই। তাই আমি একথা বলতেই পারি না যে অরসিকেও তাঁকে নামঞ্জুর করত না। তবে এ কথা বোধ হয় গৌরব করেই বলতে পারি যে সুরের প্রেমিক তাঁর গানের মধ্যে যে স্বাদ পেত সে এক অননুভূতপূর্ব স্বাদ। তার কানে তাঁর স্বরলহরী নিত্য আলোক-লহরীর তালেই উঠত বেজে। এক কথায় সুরেন্দ্রনাথের গান তার কাছে প্রতিভাত হ'ত revelationএরই ছন্দে।

মনে পড়ে কতদিন এক একটি রাগের আলাপ ও বিস্তার শুনেছি—সে কতক্ষণ ধ'রে! কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কি পুরোনো হয়েছে? সে কি পুরোনো হবার? কোনো সময়ে তাঁর তানালাপের রূপ ছিল যেন খাপখোলা তলোয়ার—বিদ্যুৎগতি, ধারালো, দীপ্যমান; কোনো সময়ে বা "বসনে পরিধূসরে বসানা"—ছায়াগুণ্ঠিতা বিরহিণী; কোনো সময়ে—কান্ত উদয়-গরিমার চলদীপ্তির; কখনো বা অলস মধ্যাহ্নের পাতাঝরা দীর্ঘশ্বাসের; কখনো শারদ প্রভাতে নির্মেঘ নীলিমার,—সে কতরকম উপমা যে ছবি হ'য়ে শ্রোতার চিত্তপটে ফুটে উঠত তাঁর গানের তূলির প্রসাদে! কবি যেমন ঘুমন্ত শব্দকে নিমেষে ছন্দের

সঞ্জীবনৌষধিরসে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন, চিত্রী যেমন কয়েকটি স্তব্ধ রেখায় এক সমাপ্তিহীন গতিপ্রবাহকে লীলায়িত ক'রে তোলেন, প্রিয়জন যেমন একটি নীরব চাহনিতে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত আনন্দ-বেদনাকে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলেন, সুরেন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মিড় দিয়ে আঁকতেন ছবি, তাল্ দিয়ে সৃজন করতেন কাব্য, সুরের উদাত্ত স্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন স্বপ্নরাজ্যে।

আর কী আশ্চর্য ছিল তাঁর ঢঙ! এখানে ঢঙ সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলতেই হবে—যেহেতু সুরেন্দ্রনাথের একটি প্রধান সম্পদ ছিল তাঁর গানের এই চাল ওরফে স্টাইল।

মনে আছে আমি কত সময়েই আশ্চর্য হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ অপূর্ব ঢঙ আপনি পেলেন কোথেকে? তিনি বলতেন, লছমী মিশ্রদের ঘরে। পরে আমি খোঁজ ক'রে ওদের কাছে গিয়েছি—বিখ্যাত সারঙ্গিয়া গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে কয়েকমাস খেয়াল ও ঠুংরি শিখেওছি। কিন্তু ও ঢঙ পাই নি আর কোথাও। পরে বন্ধুবর সোমনাথ মৈত্রের একটি কথায় আমার চৈতন্য হয়। (ছেলেবেলা থেকে ওস্তাদি হাওয়ায় মানুষ ব'লেই এ চৈতন্য হ'তে দেরি হয়েছিল বোধ হয়—কে না জানে বিশেষজ্ঞদের অন্ধতার কথা!) সোমনাথ বললেন: "দিলীপ, ও-ঢঙ ওঁর একার—আর কারুর নয়। মিছে খুঁজে মরছ ও ঢঙ এখানে সেখানে! যে বড় স্রষ্টা হয় সে নিজের ঢঙ নিজেই সৃষ্টি করে।"

চম্‌কে উঠেছিলাম, মনে আছে। এক একজনের এক একটা কথা ঝিমিয়ে-পড়া চেতনায় যেন সোনার কাঠির কাজ করে। মনে হ'ল, ঠিকই তো! শুধু ঢঙই নয়, বড় স্রষ্টা তার নিজের শ্রোতাও গ'ড়ে তোলে। সেই জন্যেই ওস্তাদিপন্থীরা সুরেন্দ্রনাথের গান পছন্দ করতেন

না। বলতেন—হ্যাঁ মিষ্টি গলা, মিষ্টি গায়। ব্যস্ হ'য়ে গেল। আসলে ওঁরা সুরেন্দ্রনাথের শ্রোতা নন। সুরেন্দ্রনাথের শ্রোতা তখন গ'ড়ে উঠছে একটা নতুন দল—যাদের মধ্যে ছিলেন আমার পিতৃদেব একজন পাণ্ডা। ওঁরা দলে পুরু ছিলেন না একথা বলাই বেশি, কিন্তু বড় গুণী চায় না দলপতি হ'তে। সে গানে তার আকাশ-আলো ছড়িয়ে যায় তার নিজস্ব হাওয়ায় নিজস্ব গন্ধে নিজস্ব গৌরবে। যাদের কান আছে, আছে চেতনা—যারা গতানুগতিকতার দাস নয়, সৃষ্টিকে সৃষ্টি ব'লে সহজেই অভিনন্দন করতে পারে—তারাই বোঝে এ স্বকীয়তা ওরিজিন্যালিটি। তাই সুরেন্দ্রনাথের ঢঙের জুড়ি খুঁজতে যাওয়া বৃথা—ও বস্তু আর কোথাওই মিলবে না, মিলতে পারে না। তাঁর তুলনা ছিলেন একা তিনিই—যেমন আবদুল করিমের তুলনাও একা আবদুল করিম। এহেন গুণী তাঁদের নব ঢঙের নবদীপ্তির মধ্যে দিয়ে আনেন নবশিখা। এ'কে অতীতের নিকষে মাপতে গেলে চলবে কেন?

একথা বলছি এই জন্যে যে আজকাল অনেকের কাছেই শুনতে পাই হিন্দুস্থানি ঢঙেই গাইতে হবে সমস্ত গান। কেন রে বাবু! সবাই হিন্দুস্থানি গোয়ালে মাথা মুড়ুতে যাবে কেন? প্রত্যেকে তার নিজের কাছে খাঁটি থাকলেই হ'ল। হিন্দুস্থানি ঢঙের যেটুকু ভালো নেব—কিন্তু তাই ব'লে বাংলা ঢঙের যেটুকু ভালো সেটুকু ছাড়তে গেলাম কোন্ দুঃখে শুনি? এখানে একটা মাত্র বিশেষ মুদ্রা মানে কারা? না, যারা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক। রসজ্ঞ গুণী উদার মানুষ মানবে কেন এ ধরণের জোর জুলম। যে ঢঙ সুন্দর তাকেই সে ঠাঁই দেবে তার গানে—এমন কি বিলিতি ঢঙও। এ-ঢঙও ক্রমশই আনছি না কি আমরা? অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সুরকারদের কত গানেই তো বিলিতি ঢঙ এসেছে চমৎকার হ'য়ে! বিলিতি

ব'লেই তাকে জাতে ঠেলা করব এমন কথা সাজে শুধু শুচিবেয়ে গোঁড়াকে অথবা সঙ্কীর্ণ মামুলিপন্থী ওস্তাদকে। না, সুন্দরের জাত নেই কুল নেই। সংস্কৃতে বলে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"। একথা সব রত্ন সম্বন্ধেই খাটে। সোনা মেলে তো অতল কালো কাদা মাটির খনিতেই, কিন্তু তাই ব'লে কি তার স্বর্ণগৌরব ঘুচে যায়—যেতে পারে? সুন্দরের একমাত্র টিকা তার মনোহারিত্ব তার রসালতা। তার মন্ত্র "বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

তাই সুরেন্দ্রনাথের ঢঙ হিন্দুস্থানি ছিল কি না এ প্রশ্নই অবাস্তর —যদিও ওস্তাদি হাওয়ায় মানুষ হ'য়ে এই শাদা কথাটি বুঝতেও আমাকে কম বেগ পেতে হয় নি। বাস্তবিক ওস্তাদি গোঁড়ামি যে মানুষকে কী আশ্চর্য মন্দ করে সে সম্বন্ধে হয়ত এত সহজে আমার চোখ ফুটত না যদি না আবাল্য সুরেন্দ্রনাথের উদার প্রতিভার প্রভাবের আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে উঠতাম। উদার প্রতিভা বলছি এইজন্যে যে প্রতিভার স্বধর্মই হ'ল মানুষকে সৃষ্টিরসের খোরাক জোগানো। বড় প্রতিভাকে ভালো বাসলে তাই মুক্তিকে ভালোবাসতেই হবে, কেন না প্রতিভা তো নজির মানে না—ঐতিহ্য মানে না—অথরিটি মানে না। সে মানে শুধু এক মনিবকে—সে তার অন্তরের দেবতা দিশারি দীপশিখা। এ অঙ্গীকারের একটি মাত্র মন্ত্র আছে:

"যে পথে চালাবে নিজে চলিব—চাব না পিছে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিও।"

কিংবা

"তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর—তুমি হে আমার প্রাণ,
কী দিব তোমায়—যা আছে আমার সকলি তোমারি দান।"

বড় গুণী তাঁর অন্তরের দিশারির কাছে সত্যিই একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেন ব'লেই না তিনি বড়—নইলে কি মানুষ সত্যি বড় হয় কখনো? আবদুল করিম আমাকে প্রায়ই বলত "রায় সাহেব, খোদাকে পাস হম্ তো চাহতে হৈঁ।"

সুরেন্দ্রনাথও চাইতেন এমনিই নত হ'য়ে বীণাপাণির কাছে। অমন বিনয়ী মানুষ জীবনে কমই দেখেছি।

তাই তো সুরেন্দ্রনাথ অমন নিরভিমান হ'তে পেরেছিলেন, কোনোদিন গোঁড়ামির পায়ে দাসখৎ লিখে দেন নি। দেবেন কী ক'রে? তিনি যে স্বভাবে ছিলেন উদারধর্মী, তাই জানতেন যে গোঁড়ামি মানেই আত্মসমর্পণের অভাব। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বভাব-শ্রদ্ধালু—সহজ পূজারী। তাই যেখানেই সত্যের দেখা পেতেন সুন্দরের আভাষ পেতেন, গ্রহণ করতেন কৃতজ্ঞ প্রণামে। তাঁর গানের ঢঙের বেলায়ও এই কথা। সে-ঢঙে শুধু হিন্দুস্থানি কায়দা বা চালই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করত না। সে-ঢঙে বাংলা টপ্পার মিষ্টতা ছিল, কীর্তনের রেশ ছিল, খেয়ালের মিড় ছিল, ধ্রুপদের সুরস্থিতি ছিল—আর সবার উপরে ছিল তাঁর হৃদয়ের সৃষ্টিপ্রভা, দিব্যদ্যুতি—যা বিধাতৃদত্ত, কেউ কাউকে দিতে পারে না। অমন অনন্যতন্ত্র প্রতিভা আমি তো আর দেখি নি কোনো গায়কের মধ্যে—গানের অত সম্পদও আর কোনো গুণীর মধ্যে দেখিনি এমন জাজ্বল্যমান—এমন কি আবদুল করিমের মধ্যেও না। করিমের ছিল অসামান্য সাধনা—তিনি গুণী ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কিন্তু বাঙালির কল্পনা তিনি পাবেন কোত্থেকে? সে কণ্ঠ, সে স্বকীয়তা, সে আশ্চর্য সৌকুমার্য? ও হয় না। যত দিন যায় ততই বুঝি আজ যে অন্তত এযুগে সঙ্গীতে কাব্যে চিত্রে—এককথায় ললিত

শিল্পে—নবস্রষ্টা হিসেবে বাঙালি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুঃখ এই যে বাঙালি আত্মঘাতী জাতি, তাই সুরেন্দ্রনাথের মতন অদ্বিতীয় গীতিপ্রতিভারও তেমন আদর হয় নি আমাদের দেশে—হায়রে ওস্তাদ-তর্জ্জিত-অনুচিকীর্ষু'র দল! আমরা কথায় কথায় ছুটি বরোদা, লক্ষ্ণৌ হিল্লি দিল্লি—কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কাছে যায় নি একটিও শাগরেদ। রবীন্দ্রনাথ সাধে কি লিখেছিলেন আমাকে একটি পত্রে:

"আজ বাঙালির সেলামের ধারা ছুটেছে একমাত্র হিন্দুস্থানি তান-কর্তবের দিকে। একদিন বাংলার সমজদাররা যখন নব বাংলার চিত্রকলাকে হাস্যবাণে জর্জর করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন তার মধ্যে এই একটা অভিমান ছিল যে তাঁরাই বিলিতি আর্ট বোঝেন ভালো, তাই রাফেলের নাম করতে তাঁদের দশম দশা প্রাপ্তি হোতো, আজ তানসেনের নাম করতে এঁদের চোখের তারা উল্টে পড়ছে। এর মধ্যে নিজেদেরই তারিফ করবার একটা ঝাঁঝ আছে। যাদের বোধশক্তি যথার্থ উদার তাদের এই দুর্গতি ঘটে না।" *

এ কথাটা হয়ত একটু তীব্রভাবে বলা; কিন্তু এর মোদ্দা কথাটা সত্য। বাঙালির নিশ্চয়ই এ চেতনা হওয়ার সময় এসেছে যে তার পক্ষে বাংলা গান গাওয়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক। হিন্দুস্থানি গান গাইতেও অবশ্যই আপত্তির কোনো কারণ নেই—ঠিক যেমন ইংরিজি জর্মন ফরাসি কোনো গান গাইতেও আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এই যে একটা ধারণা বাঙালির মনে আজও বদ্ধমূল যে যতই বলি না কেন, শ্রেষ্ঠ গান এক হিন্দুস্থানি "সৈঁইয়া নজরিয়া কাটারিয়া"-র কোটায়ই মেলে অন্যত্র না—এ ধারণার মূলোচ্ছেদ না হ'লে আর ভালো দেখাচ্ছে

* সাঙ্গীতিকী পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের পুরোচিঠিটি—ভূমিকায়

না। এ অনস্বীকার্য্য সত্যটি এবার অঙ্গীকার করতেই হবে যে মাতৃভাষায় হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা যেভাবে নিবেদিত হ'তে পারে সহজ ভাবে সরল ঢঙে স্বতউৎসারিত আন্তরিকতায়—বিদেশী ভাষায় তেমন হ'তেই পারে না। যতই বলিনা কেন, যখন প্রেমের গান গাই তখন "পিয়া বিন নাহি আওত চৈন" গাইবার সময়ে ঠুংরির তান হাজার খিঁচলেও "পিয়া" বলতে বাঙালির মন তেমন গলবে না যেমন গলবে যখন সে বলবে

"বঁধু কী আর কহিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।"

পেডাণ্ট না হ'য়ে একথা হিন্দিতে বলতে পারে বাঙালি? বলতে পারে কি কোনো কিশোরী:

পিয়া ক্যা কহুঙ্গি ময় বতাবো?

আরে হাঁ পিয়া—পিয়া রা—আ—আ কোঁ্যা সতাও—মোরি আলি দেখো তো—ইত্যাদি? প্রাণ চায় তার এভাবে প্রিয়বিরহব্যথা গানে জানাতে?

অথচ ঐ মেয়েটি বাংলা গানে যদি তার বঁধুয়াকে নিবেদন জানায়:

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি,
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় বাঁধিয়া পরি!

এমন কোন্ বাঙালি আছে (ওস্তাদপন্থী ও, alas, আজকালকার কয়েকটি ওস্তাদপন্থিনী ছাড়া *) যার বুকের অশ্রুসাগর চোখের তটে উছ্‌লে না উঠবে!

---

* একটি ওস্তাদিপন্থিনী ষোড়শী আমাকে বলেছিলেন কলকাতায়: "আপনার বাংলা গান বেশ—ওরিজিন্তালিটি আছে।" ব'লেই ধরলেন হিন্দি গান।

এও আমার কথার কথা নয়। সুরেন্দ্রনাথের, রেবতীমোহনের, গণেশদাসের কীর্তন যাঁরা শুনেছেন তাঁরা একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন। যদিও (হায়রে) এমন উচ্চ সমজদার অবতারের দেখাও মেলে এদেশে যাঁরা বলেন কীর্তন কি আর গান? কিন্তু এ অবান্তর প্রসঙ্গ রেখে সুরেন্দ্রনাথের ঢঙের কথায়ই ফিরে আসি।

শুধু ঢঙই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র সম্পদ ছিল না একথা বলাই বেশি। তাঁর আর একটি মস্ত সম্পদ ছিল এই যে তিনি ছিলেন প্রায় যাকে বলে audience-proof। তাঁকে দুজন শ্রোতার সাম্‌নেও যেমন তদ্‌গতচিত্তে গাইতে দেখেছি—দুশো জনের সামনেও ঠিক তেমনি। বস্তুত তিনি গাইতেন কিন্তু বাহবার জন্যে না; রাগের মধ্যে চমকপ্রদ যোগাযোগ ঘটাতেন কিন্তু চম্‌কে দেবার জন্যে না; অপরূপ স্বরসম্পাতে শ্রোতার সঙ্গে দরদের বন্ধন অবলীলাক্রমে গ'ড়ে তুল্‌তেন অথচ শ্রোতার মুখ চেয়ে না। ওস্তাদদের মধ্যে নিত্য যে বাহ্বাস্ফোটের ভাব সুকুমার-হৃদয় শ্রোতাকে নিত্য পীড়া দেয়—এ নিরভিমান গুণীর গানে সে তাল-ঠোকার, জাহির করার দাপটটি একেবারেই ছিল না। তাই তো তাঁর গুণিহৃদয়ের মনোজ্ঞ স্পন্দনে দরদীর হৃদয়তন্ত্রীও কেঁপে উঠত এত সহজে। সত্য আত্মপ্রকাশ যেখানেই দেখি, অকৃত্রিম আবেগস্ফুরণ যেখানেই দেখি সেখানেই যে আমরা তাঁকে ছুঁই যিনি সব প্রকাশের পিছনে থেকে সৃষ্টিকে করেন সার্থক। তাঁর বিনয়গৌরবা প্রতিভা ছিল "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা।" ভারতীয় সঙ্গীতের এ-অধঃপতনের যুগে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে তাই সত্য রসজ্ঞমাত্রেই অভিনন্দন করবেন। অবশ্য ওস্তাদেরা চিরদিন তাঁর নিন্দাই ক'রে এসেছেন। আমরা কত সময়ে অধৈর্য হ'য়েছি—কত আসরে তাঁর অপমানে; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে অপমান করবে তাদের

সাধ্য কি? যিনি জন্ম-নিরভিমান, অপমান কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে? ওস্তাদেরা তাঁকে বুঝত না। বুঝবে কোত্থেকে? সব দেশেই একদল গুণী থাকেন যাঁরা হচ্ছেন সুরের পালোয়ান—acrobat, যাঁদের বিজ্ঞম্মন্য সমালোচনা সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন: "Musical critics often give applause to compositions as being scientific"; এই দলের গুণী ও গুণজ্ঞ বলেছি সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে তাচ্ছিল্যের সুরে শুধু বলতেন: "হাঁ, মিঠা গাতে হেঁ।" কারণ তাঁর গানে না ছিল সুরের মল্লযুদ্ধ, না তালের লম্ফঝম্প, না আত্মগুণকীর্তন, না "তৈলাধার-পাত্র কিংবা পাত্রাধার-তৈল" তর্কের তুমুল অবসর। তিনি অনেক সময়েই রাগ গাইতে গাইতে ঠাট বদলাতেন। অর্থাৎ রাগমিশ্রণের প্রেরণা এলে কখনো তাকে তথাকথিত রাগশুদ্ধতার খাতিরে খেদিয়ে দিতেন না। শুদ্ধভাবে রাগালাপ-কৃতিত্বের তাঁর অভাব ছিল না—অথচ শুচিবাই তাঁর ছিল না একেবারেই। আমাকে কতবার মালকোষে কোমল রে, কেদারায় কোমল নি, ভৈরবীতে কড়ি মধ্যম প্রভৃতি লাগিয়ে শোনাতেন। বলতেন ওস্তাদেরা এতে এত অগ্নিমূর্তি হ'য়ে ওঠেন—জানোই তো, কিন্তু কী করব? এতে আমি দোষ দেখি না—এমন কি ভস্ম হবার ভয়েও না।"

দোষ দেখতেন না কারণ তিনি ছিলেন বৈয়াকরণ না—গুণী, টীকাকার না—স্রষ্টা, শুষ্ক সমালোচক না—দরদী। তাই তিনি রাগের বিস্তারে অসামান্য শিল্পী হ'য়েও কোথাও কোনো গানে নতুন কিছু সৌন্দর্য দেখলেই আনন্দে শিশুর মতন আত্মহারা হ'য়ে উঠতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি খেয়াল-ঘেঁষা গানই সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে রচিত। পিতৃদেব অনেক গানের সুররচনার সময়ই তাঁর কাছে

নানা নির্দেশ গ্রহণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিখেছিলেনও অনেক, তাই তো তাঁর রচনায় ভারতীয় রাগসঙ্গীতের লীলায়িত সৌন্দর্য এত বেশি প্রকট—যার জন্যে তাঁর গান গুণীর কাছেও এত সমাদর পেয়েছে। কিন্তু যখনই তিনি কোনো রাগে চ্যুতি ঘটাতেন বা মিশ্র করতেন মিষ্ট হ'লেও তাতে সবচেয়ে খুশি হতেন সুরেন্দ্রনাথ। রাগসঙ্গীতের অতবড় মর্মজ্ঞ হ'য়েও রাগের বাঁধাবাঁধি দিয়ে তিনি কখনো নিজের রসবোধকে পিষে মারতেন না। এককথায়, তিনি গান গাইতেন বা বিচার করতেন খোলা মন নিয়ে। ওস্তাদরা এর পরেও তাঁকে ভস্মীভূত করতে না চেয়ে পারে?

আর এই জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে কেউ ওস্তাদ বল্‌লে—অসামান্য ওস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে কুণ্ঠিত হতেন তিনি নিজে। এমনকি ওস্তাদি আসরে পারতপক্ষে তিনি গাইতেও চাইতেন না। একবার কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বিখ্যাত আবদুল করিমের গান হয়। সুরেন্দ্রনাথেরও সে আসরে গাইবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না। পরে, কেন এলেন না জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন: "ওস্তাদি আসরে আমার গান কি কখনো জম্‌তে দেখেছ দিলীপ? না ওদের সামনে গেয়ে আমাকে আনন্দ পেতে দেখেছ? ওস্তাদদের—ব'লে, মুখটিপে তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হেসে বললেন: "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—এ আর বুঝলে না।" অল্প দুএকটি কথা ব'লে সুকুমার ব্যঙ্গের সঙ্গে এম্‌নি হাসিই হাসতে পারতেন তিনি দরকার হ'লে!

ওস্তাদদের নিয়ে এমন কতরকম ঠাট্টাই যে তিনি করতেন! কিন্তু তার মধ্যে কোথাও কি এতটুকু দাহ ছিল? অথচ ওস্তাদদের মধ্যে সত্য গুণপনায় তিনি আন্তরিক সম্মান করতেন—কারণ তিনি ব্যঙ্গ-

প্রিয় হলেও মনে প্রাণে ছিলেন যাকে বলে—"কদরদান"—reverent; কিন্তু কালোয়াতের নানা মুদ্রাদোষের নকল, নানা ভঙ্গির সম্বন্ধে স্নিগ্ধ উপভোগ্য ঠাট্টা, কত আসরে কত কি হাস্যজনক ব্যাপার ঘটত তার নানান্ কাহিনী এমন অপরূপ ঢঙেই বলতেন! এমন রসিক "গ'প্পে" লোক জীবনে কমই দেখেছি। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন "কোষ্ঠীর ফলাফল"-প্রণেতা রসরাজ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বজাতি।

ওস্তাদদের নিয়ে তাঁর রসিকতার একটিমাত্র উদাহরণ দেই, কারণ এ-প্রবন্ধে বেশি উদাহরণ দেওয়ার স্থানাভাব।

তখন তিনি ছিলেন কলকাতায় একটি বাসা ভাড়া করে। একদিন তাঁর গান শুনতে যেতেই বললেন: "দিলীপ, তোমরা দুঃখ করতে আমার কোনো শাগরেদ নেই ব'লে। পরমেশ্বর সে দুঃখ তোমাদের ঘোচালেন: মিলল অবশেষে এক জাঁদরেল শাগরেদ।"

"জাঁদরেল?"

"নয় তো কি! আমার অমন যে নাৎনি যাকে কেউ দুধ খাওয়াতে পারে না, সে একতলায় তাঁর গমক শুনে তিনতলায় আঁৎকে উঠে ঘুম থেকে—আর তার মা অম্নি তাকে ঢক ক'রে দুধ খাইয়ে দেয়।"

ওস্তাদদের নিয়ে এ-ধরণের ঠাট্টার তাঁর আর অন্ত ছিল না: বোধ করি সেই জন্যেই তিনি নিজেকে ওস্তাদ বলে পরিচয় দিতেন না ভুলেও। অথচ ওস্তাদদের তানের ক্ষমতা, দম, রাগজ্ঞান, লয়দুরস্ত, সুরের কর্তৃত্ব এ সবই তাঁর ছিল পুরোপুরিই। না, কম বলা হ'ল। বলতেই হবে ওস্তাদদের রাগবিস্তারে আমরা প্রায়ই সাড়া দিতে পারি না যে গতানুগতিকতার জন্যে—যার জন্যে দায়িক আমাদের রাগসঙ্গীত

নয়, দাম্ভিক ওস্তাদদের কল্পনার অভাব—সুরেন্দ্রনাথের রাগালাপে ঠিক সেই জিনিষটিই মিলত প্রচুর। কাজেই নিছক ওস্তাদির আখড়ায়ও ওঁকে ওস্তাদের ওস্তাদ বললে অত্যুক্তি হবে না।

সত্যি, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর গান শুনেছি। কতবার এমন হয়েছে যে বহুদিন তিনিই গান করেন নি—হঠাৎ আমরা গিয়ে হাজির—হয় পুরুলিয়ায়, নয় ভাগলপুরে, নয় ভবানীপুরে, কিন্তু তানপুরায় স্বরপঞ্চম মেলাতে না মেলাতে তাঁর গন্ধর্ব কণ্ঠে সেই প্রাণকাড়া মিড়, গমক, স্বরস্থিতি, উদাত্ত মধুর তান—আহা, সে কি আর ভুলব কোনোদিন! এখন অনেক তরুণ প্রতিভাবান্ গায়কের গান শুনি। তাঁদের কৃতিত্ব অসামান্য, স্বরসাধনা বিস্ময়কর,—কিন্তু সব জড়িয়েও এঁরা কেউ-ই তো পারেন না কণ্ঠে ভাবের রসের সে-ইন্দ্রজাল আনতে! কেন পারেন না—এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হয়। এর উত্তরও পড়েই রয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

অনেকের কাছে প্রায়ই একটা মামুলি কথা শুনি: যে, গানে সূক্ষ্ম শ্রুতির নিখুঁৎ কলাকারুই সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু কথাটা অত্যুক্তি। সূক্ষ্ম শ্রুতির দাম নেই বলি না—কিন্তু সে দাম হ'ল নৈপুণ্যের দাম। আঙ্গিকের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সব শিল্পেই মহার্ঘ—এও কে না মানবে? কিন্তু তবু সব বলা হ'য়ে গেলেও বলা চলে যে গানে আমরা অভিভূত হই এই আঙ্গিকের নিখুঁৎ রূপায়নে নয়—আমাদের প্রাণ কাড়ে গানের প্রাণশক্তি আবেগ আন্তরিকতা কণ্ঠমাধুর্য্য। সূক্ষ্ম নিখুঁৎ শ্রুতিই যদি গানে সব চেয়ে বড় কথা হ'ত তাহ'লে হার্মোনিয়মের সঙ্গে গান ক'রেও আবদুল করিম, চন্দন চৌবে, সুরেন্দ্রনাথ আরো অনেক প্রথম শ্রেণীর গায়ক কেমন ক'রে আমাদের মুগ্ধ করতেন? মনে আছে লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীতরতন নাসির উদ্দিনের অতি কোমল রেখাব ধৈবতের

প্রয়োগ দেখানোর কথা। ক্রমাগতই হাঁকতেন—"য়ে দেখিয়ে সাব—য়ে দেখিয়ে।" শুনতে শুনতে মন গ্লানিতে ভ'রে আসত। এরই নাম কি গান? এই শ্রুতির সাড়ম্বর প্রদর্শনী—এই-ই কি চাই আমরা গানে? মনে আছে তাঁর এই হাঁকডাক শুনে ওস্তাদিপন্থীরা সঙ্গীতের উৎসাহে গদ্‌গদ হ'য়ে উঠতেন—"মহশাল্লা—ক্যা অতি কোমল ধৈবত, ক্যা তীবর মধ্যম—বিস্‌মিল্লা—" কিন্তু আমি ও অতুলপ্রসাদ এ-আহিরিপনার ভালগারিটি বরদাস্ত করতে পারি নি—বিরক্ত হ'য়ে উঠে এসেছিলাম। তার পরেই শুনলাম আট বছরের ছেলে চন্দ্রশেখরের কিন্নরকণ্ঠে "ভজ মন রামচরণ দিন রাতি" তুলসীদাসী ভৈরবী। অম্‌নি বলেছিল মন মুগ্ধ হ'য়ে:

> যে গান তুমি ঝরিয়ে দিলে কণ্ঠ-আলোর নিঝর ধারায়,
> তারি পরম অনুরাগে স্বপন জাগে গগন তারায়।
> চাই না গানে উল্কাবাজির চমক-দ্যুতি আড়ম্বরে,
> যদি শিশু, তোমার সুরে জাগাও প্রেমের কোজাগরে।

সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে নিত্যদীপ্ত ছিল এই "প্রেমের কোজাগর।" Art conceals art কথাটি যে শিল্পে সত্যিই একটি গভীর কথা তাঁর গান শুনতে না শুনতে বোঝা যেত, তাই মনে হ'ত: "যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে।"

শেষ দিন তাঁর গান শুনি কলকাতায়। রাত প্রায় দশটা—১৯৩৮ সাল। তখন তাঁর বয়স চৌষট্টি। দেহ দুর্বল, সর্বাঙ্গের গাঁটে গাঁটে বাত, অম্লশূল—তার উপর পায়ে কি এক অসহ্য জ্বালা সর্বদাই। কিন্তু গুণী সব দৈহিক দুঃখই ভুলে গেলেন তাঁর তানপুরাটি ধরতে না ধরতে। আমি হার্মোনিয়ম সঙ্গত করলাম। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত

সাড়ে দশটা গাইলেন একাই। আরও গাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু শরীর অসুস্থ বলে আমরা জোর ক'রে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

তখনও কী খোলা মিষ্ট কণ্ঠ! যৌবনের সে-প্রাবল্য বা তেজ নেই শুধু। কিন্তু আর সবই আছে। সেই অপূর্ব সুরের দরদ, সেই বিচিত্র কল্পনা, সেই নিখুঁৎ সুরের কাজ, সেই প্রাণস্পর্শী মিড়, সেই তারা সপ্তকের মধ্যম পঞ্চমে অচঞ্চল স্থিতি ও মন্দ্র সপ্তকে ইচ্ছামাত্রই খরজে নেমে আসা—বস্তুত সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। Spirit willing হ'লে যে flesh weak এর অজুহাতটা মায়া, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একথার জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর গান শুনতে শুনতে প্রাদেশিকতায় আমাকে বার বার পেয়ে বসত—বন্ধুবর সার্বভৌমিক সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও। মনে হ'ত বাঙালির যত ত্রুটিই থাকুক না কেন নিষ্ঠায়, সাধনায়, নিয়মানুগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতায়,—তার দরদ আবেগ ও সর্বোপরি কল্পনা যাবে কোথায়? কই অন্য প্রভিন্স বার করুক তো দেখি একজন সুরেন্দ্রনাথ—একজন আলাউদ্দীন—একজন তরুণ তন্ত্রী তিমিরবরণ! ও যে বাঙালির পিতৃপৈতামহিক প্রাণসম্পদ—মরিয়া না মরে রাম! বনেদি ঘরের ছেলে যে! ফতুর হ'লেও এলাহি চাল তার যাবে কোথা?

সুরেন্দ্রনাথ হয়ত আমাদের সঙ্গীত-জগতের শেষ এলাহি চালের গাইয়ে। কিন্তু তিনি শুধু খানদানি বনিয়াদি ঘরের ছেলেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন আশ্চর্য শিল্পী। দুঃখ এই যে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনির চাপে তাঁর নানামুখী প্রতিভা যথোচিত বিকাশ পাবার সুযোগ পায় নি, কিন্তু তবু তিনি যাই করতেন তাতেই রেখে গেছেন তাঁর মৌলিকতার ছাপ: কী আসর জমানোয়, কী গল্প লেখায়, কী গানে, কী ক্যারিকেচারে! এর উপর ছিলেন তিনি নিপুণ চিত্রী,

সেরা সামাজিক মানুষ—একান্ত বন্ধুবৎসল, মহৎ, উদার, জন্মঅমায়িক, বসুধৈবকুটুম্বক প্রীতি-নিলয়।

কিন্তু মানুষ সুরেন্দ্রনাথ বা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বর্ণনযোগ্য অনেককিছু থাকলেও এ স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে তার স্থান নেই—কারণ বলছি, এর বর্ণনীয় শুধু গুণী সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর এই দিকের আর একটি কথা ব'লেই তাই বিদায় নেব। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতের আসন্ন রেনেসাঁসে তাঁর গানের এ গুণটির মূল্য বোধ হয় তাঁর অন্য কোনো অবদানের চেয়েই কম না।

সে গুণটি হচ্ছে তাঁর গানের সৌকুমার্য—refinement। এমন কি অতবড় যে গুণী আবদুল তাঁরও গানে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গানে কখনো গ্রাম্যতা বা কর্কশতা বা লম্ফঝম্প—coarseness—আসতে দেখি নি—ভাল আসরে তো নয়ই, হাজার coarse শ্রোতার মাঝেও না। এটা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী জানেন শুধু। বিশেষ ক'রে গানে, অভিনয়ে ও বাগ্মিতায় মন্দ শ্রোতার স্থূল মাধ্যাকর্ষণ বরাবর কাটিয়ে চলতে পারা প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। সস্তা যশের মায়া কাটাতে পারা সম্ভব হয় কেবল বহু পুণ্যফলে, যে জন্য চিন্তাশীল অল্‌ডাস হাক্‌সলি দুঃখ ক'রেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর য়ুরোপীয় সঙ্গীতকারদেরও স্খলনে: "Even serious musicians seem to find it hard to dispense with barbarism."

রেডিও ও টকির যুগে এ barbarism হ'য়ে উঠছে তো প্রায় অপরিহার্য (এবং তার স্বপক্ষে চমৎকার চমৎকার যুক্তিও গ'ড়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে—যার সাইকো-আনালিটিক নাম—rationalization)—কিন্তু সেইজন্যেই আনন্দ হয় ভাবতে যে সুরেন্দ্রনাথ এ-যুগের মানুষ

ছিলেন না। তাই এই প্রাণখোলা, সদানন্দ, স্বভাবনম্র, উচ্চাশা-বিরহিত, স্নিগ্ধভাষী, সুশীল, উদার, অমায়িক মানুষটি গান করতেন তো একহাত দেখাব এ-তালঠোকার ভাব নিয়ে না—এমন কি নিজের গুণপনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেও না। তিনি গান করতেন—গান করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল ব'লে—গান না ক'রে তিনি থাকতে পারতেন না ব'লে।

গান না ক'রে তিনি যে থাকতে পারতেন না এর একটি সরস দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—বিশেষ এইজন্যে যে এতে ক'রে তাঁর অপূর্ব নিরভিমানতার একটা মনোজ্ঞ দিকের পরিচয় দেওয়া হবে। এ-ধরণের ছোটখাটো দৃষ্টান্তে তো আসল মানুষটা কম ফুটে ওঠে না।

আমাদের দেশের দুর্বাসা-সোদর গুণীদের সঙ্গে যে ভুক্তভোগীরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন গায়কের সঙ্গে বাদকের ললিত সহযোগিতার সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই কী গর্হিত প্রতিযোগিতায় রক্তগঙ্গা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু "তরোরিব সহিষ্ণু" সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন মাটির মানুষ। যে-রকম তবলচিই হোক্ না, এ নিরভিমান মিষ্টভাষী গুণী মানিয়ে চলতেন। ভাল সঙ্গতদারের সঙ্গে ঝগড়া করা তো দূরের কথা অতি নিকৃষ্ট তবলচিকেও তিনি সদাপ্রসন্ন ভাবে যাকে বলে চালিয়ে নিতেন। অনেক সময়ে এতে ভারি মজা হ'ত। একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করি।

তখন আমার ভ্রাতা শচীন্দ্রলাল সবেমাত্র তবলায় একতালা ও তেতালার ঠেকাটি শিখেছেন। সেদিন ভাগলপুরে তবলচি পাওয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন: "তাতে কি, শচীনই ঠেকা দেবে। সে-বেচারি

তো 'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজের' সঙ্গে সঙ্গত করতে হবে ভেবে কেঁপেই অস্থির। কিন্তু সদাশিব সুরেন্দ্রনাথ ছাড়লেন না। বললেন "ভয় কি? কাওয়ালির ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, না তিন্ তিন্ তা, তা ধিন তেটে ধিন্—এইটুকু তো জানো? তাই সই। ও-ই দিয়ে চলো।" গান তো সুরু হ'ল।

কিন্তু তাই বা সে পারবে কেন? অত বড় গাইয়ে! বিষম নাস্তানাবুদ হ'য়ে পড়ল। ফলে কখনো বা ঢিমা তেতালায় ষোল মাত্রার জায়গায় কুড়ি মাত্রা পরে "সম" দেয়, কখনো বা একতালার চালে বারো মাত্রার পরেই ফাঁক এনে সম ফেলে গুলিয়ে। এ ধরণের রসভঙ্গে অন্য যে-কেউ হ'লেই থেমে যেত। কিন্তু পাছে তাতে তার মনে আঘাত লাগে ব'লে সুরেন মামা হেসে বললেন—

"মাভৈঃ শচীন, বাজাও না ভাই, প্রাণের মায়া ছেড়ে
চলো উধাও বাজিয়ে সাথে—হর্ষে মাথা নেড়ে।"
বললাম আমি—"সে কি বলুন! মাত্রা যে ভুল করে!
ফাঁকের পরে চার তাল দেয়—বাক্য মোদের হরে!!"
বলেন গুণী—"তাতেই বা কী? যেমন বাজাও, জেনো
সমে এসে মিলিয়ে দেবই,—মুখখানি চুণ কেন?
শুধু তুমি এইটি কোরো—তালটি যেয়ো দিয়ে,
ফাঁক ও সমের হিসেব আমিই মিলিয়ে নেব গিয়ে।"

আমাদের মধ্যে হাসির সাড়া পড়ে গেল। শুধু সে হাসির সঙ্গে সে-সভার কোন্ শ্রোতার না মনে মুগ্ধ ভক্তি জেগেছিল—এ নিরহঙ্কার ভোলানাথের সদানন্দ চরিত্রের প্রতি?

বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে এতটা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে পারতেন

তার প্রধান কারণ—বড় গাইয়ে ব'লে শুধু বাইরে না, অন্তরেও এতটুকু আত্মমুখরতা তাঁর ছিল না। এবং সেই জন্যই তিনি অমন শ্রোতা-নিরপেক্ষ হ'য়ে গান ক'রে যেতে পারতেন, ভাল শ্রোতা মন্দ শ্রোতা উভয়কেই সমভাবে আদর ক'রে পারতেন তাঁর গান শোনাতে। সত্যি, নিরভিমানতা তাঁর এত মজ্জাগত ছিল যে শুধু যে ধনী দরিদ্রেরই তাঁর কাছে তফাৎ ছিল না তাই নয়, যে তাঁর গানের নিন্দা করত সেও তাঁর গান শুনতে এলে তাঁর গানের অনুরাগীর সঙ্গে সমানই আদর পেত। তিনি ভুলেও ভাবতেন না শ্রোতা তাঁর গানের মহিমা বুঝছে কি না। তিনি শুধু গেয়ে যেতেন—দুহাতে বিলিয়ে যেতেন—তাঁর সুরের স্ফুলিঙ্গ অপরের মনে আগুন জ্বালল কিনা সে নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই কখনো দেখি নি। বাস্তবিক, কোনো গায়ক যে এমন প্রশংসানিরপেক্ষ হ'য়ে আজীবন গান ক'রে যেতে পারে, অসমজদারের কাছেও যে এমন উদার ছন্দে তার সুরৈশ্বর্যের ঝুলি উজাড় ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারে, এবং সর্বোপরি তার উচ্চতম প্রেরণার কাছে অনুক্ষণ খাঁটি থাকতে পারে—শ্রোতার বাহবার লোভে একটুও নিচে না নেমে—এ মহিমময় দৃশ্য আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নি, না এদেশে, না ওদেশে।

কেবল এক আক্ষেপ জাগে। এতবড় প্রতিভা আমাদের সঙ্গীত-জগতে নিজেকে এমন অবাধে বিলিয়ে দিয়ে গেল, এমন আত্মভোলা প্রতিভার বরপুত্র আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হ'য়ে তার স্বরসাধনায় সুরজাহ্নবীকে মর্তে বইয়ে দিয়ে গেল অথচ আমরা তাকে চিনলাম না! গীতায় ফলত্যাগের উপদেশ রয়েছে বটে, কিন্তু তবু এতে একটু দুঃখ না হ'য়ে পারে যে—the world does not know its greatest men?—অন্তত: কোনো অনাদৃত প্রতিভার

ভক্তদের মনে—আমাদের মনে—যে আমরা জানি যে তিনি কী ছিলেন ?

কিন্তু না। দুঃখ কেন ? কতটুকু আমাদের দৃষ্টির পরিধি যে তাই দিয়ে ফলাফল বিচার করতে যাই ? কেন মনে করি যে সুরেন্দ্রনাথের গান সমজদারের সংখ্যাবাহুল্যের অভাবে ব্যর্থ হ'য়ে গেল ? জীবনে সত্যের যে-আগুন একবার জ্বলে সে কি কখনো নেভে ? না, তার আলো, শক্তি, পাথেয় কখনো পথহারা হয় ?—হ'তে পারে ?

সুরেন্দ্রনাথ আমাদের আভাষ দিয়ে গেছেন বাংলা গানের ভবিষ্যৎ বিকাশ কোন্ লীলায়িত উজ্জ্বল পথ নেবে। তিনি তাঁর সুরের আলোয় প্রতিভার স্রোতস্বিনীতে পথ কেটে চ'লে গেছেন—দেখিয়ে গেছেন গানে চাইলে কী বস্তু পাওয়া যায়, আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন গানে সত্যতম রস কাকে বলে। তাঁর দেহদীপ আজ নির্বাপিত —কিন্তু গানে তাঁর সত্যোপলব্ধির বহ্নিবাণী চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অনির্বাণ হ'য়েই জ্বল্‌বে। আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের যে-শিখা তিনি তাঁর সৃষ্টিপ্রদীপে জ্বেলে রেখে গেছেন সে-শিখা যে স্বয়ংপ্রভা, স্বয়ম্বরা —যেখানেই সৃজনী প্রাণ সঙ্গীত সৃষ্টি করবে তাঁর জ্যোতি ধরবে তার পথে আলো। তাই তাঁর মহাপ্রয়াণের দিনে আজ আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই :—

গুণী ! গাইলে তুমি যে-গান সুরের জাহ্নবী-উচ্ছ্বাসে
সে-ঢেউ আজ কি গেছে থেমে ?
তোমার প্রাণ-দেউলে যে-আরতি জাগালে উল্লাসে
সে-রূপ জাগবে না আর প্রেমে ?

পড়ে ঐ যে তারা খ'সে—সে কি হবে গগনহারা
তার বিলিয়ে বুকের আলো ?
ঝরে ফুলটি যবে—হয় কভু তার উদ্দীপনী ধারা
মরণ কালোর ছোঁওয়ায় কালো ?
না-না এমনতর অশ্রুগাথাই নয় তো লীলার বাণী,
জ্বলে দীপে যখন শিখা
তার বিদায়-পথেও রয় সে না দেয় অভিমানী,
রাখে জ্বালিয়ে জয়ন্তিকা।
তাই জীবন-নাটমঞ্চে যবে যায় থেমে মূর্ছনা
থাকে পথ চেয়ে তার রেশ ;
যবে সৃজন-জাদুকরে রাঙায় আনন্দ-কল্পনা
সে আর হয় না নিরুদ্দেশ।
তুমি মোদের সাথে ছদ্মবেশী রইলে চিরদিন,
তোমার নয়ত হেথায় ধাম :
এলে দিতে তোমার আপন লোকের পরশ অমলিন,
মোদের লও গুরু, প্রণাম।

সুরেলা

সুরেলা অতুলপ্রসাদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সন্ন্যাসরোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হ'য়ে গেছে। না, সব শেষ নয়। অনেক কিছুই র'য়ে গেল। দিয়ে গেছেন তিনি। উত্তরাধিকারী আমরা তাঁর গানের। কম নয় সে-সৌভাগ্য।

সে-গান যে কী-বস্তু ছিল জানে সে যে তাঁকে অনুভব করেছে। কিন্তু গানকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে খুব বেশি লোক নয়। তাই আমার বিশ্বাস খুব কম লোকেই তাঁর গানকে তেমন ক'রে জানে। কিন্তু যারা এভাবে তাঁর গানকে জেনেছে তারা জেনেছে যে এমন সুরেলা কান ও ফুলেলা প্রাণ জীবনে বড় বেশি মেলে না। যথা তাঁর এই গানটি :—

"আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চ'লে যায়?
(তারা) চেয়ে আছে তারি পানে, সে ত নাহি ফিরে চায়!
ভুলে কি গিয়েছে ভোলা প্রভাতের ফুল তোলা
জানে না কি পরিতে সে কুসুম গলায়?
আঁখির শিশির-পাতে ফুটেছে তারা প্রভাতে
শুকাইয়ে যাবে তারা সাঁঝের বেলায়!
যবে সে আসিবে ফিরে নিশির ঘন তিমিরে
(তার) চরণ করিব রাঙা নিঠুর কাঁটায়।"

এক নতুন ঢঙের খাম্বাজে ছোট মিড়ে, ছোট গমকে, ছোট তানে

এ-গানটি শুনতে শুনতে কার না মনে জাগত উদাস-করা ফুলের সুগন্ধ, আলোকলোকের পিপাসা ?

মনে পড়ে যেদিন এ গানটি তিনি প্রথম শুনিয়েছিলেন তাঁর পেলব অভিমানী কণ্ঠে। কত দরদই না ছিল তাঁর মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বরে ! ক'জন বড় গায়কের মধ্যে সে মনোজ্ঞ সুর, সে-দরদ মেলে ? তাঁর মুখে এ সব গান শুনতে শুনতে কার না ইচ্ছা হ'ত তাঁকে বরণ করতে কবি ব'লে, প্রেমিক ব'লে ? বিশেষ যদি সে তাঁর মুখে শুনত :

"কুসুমের গন্ধে রূপে সে আসে গো চুপে চুপে
মেঘের আড়াল হ'তে ডাকে : আয় আয় আয়।
হে মোর অচেনা বঁধু লুকায়ে থেকোনা শুধু,
এসো, করি পরিচয় মালায় মালায়।"

আমার মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন তাঁর বিখ্যাত "চাঁদিনী রাতে" গানটি কবি রচনা করেন। মুখে লাজুক নম্র আগ্রহ : "দিলীপ, কাল সন্ধ্যাবেলা চাঁদের আলোয় একটি গান তৈরি ক'রেছি।"

"সে কি অতুলদা ! এতক্ষণ শোনাও নি ?"

"কি জানো—ভাবছি—"

"ভেবো না অতুলদা, ভাবা তোমায় সাজে না—তুমি গেয়ে যাও, মনে নেই তোমার গান :

"মিছে তুই ভাবিস মন,
তুই গান গেয়ে যা—গান গেয়ে যা আজীবন।"

গান রচনা করতে, গাইতে তাঁর কুণ্ঠা—অথচ আগ্রহের কথা মনে ক'রে আমার মনে পড়ে এ-কুণ্ঠার সমর্থন :

"Tell me, my Love ! Is it not more than wrong
To praise Thy Beauty as I do, in words ?
Is song a sin ?—and yet all life is song,
From the huge planets to the little birds."

তুমি আমি কত সময়েই না তাঁর এই মেয়েলি লজ্জাকে করতাম তিরস্কার ! গাইতে কি তিনি সহজে চাইতেন ? গান রচনা করেছেন —সে-ও যেন একটা অপরাধ। কত সঙ্কোচ—প্রচার করতে আপনাকে ! এ-যুগে ! তবে বোধ হয় সেইজন্যেই আমাদের মন টানত তাঁর মনটি। মনে হ'ত বেশি ক'রেই অন্য সবার পানে চেয়ে—এবিষয়ে তিনি অন্য সব কবির চেয়েই কত বড় ছিলেন। যে-গানে আজ সারা বাংলা মুগ্ধ সে-গান গাইতেও তাঁর কত কুণ্ঠা ছিল প্রথম প্রথম ! নয় ? যাক, যা বলছিলাম।

—"কি জানো দিলীপ—এর সঞ্চারীর সুরটুকু—"

—"আহা গাও না অতুলদা—"

—"ভালো লাগবে কি না—"

—"ফে—র ?"

—"আচ্ছা আচ্ছা গাইছি, শোনো।"

তখন সঙ্গীতার্থীরা আসে নি—সান্ধ্য-সভা জমকাতে।

অতুলদা গাইলেন সেই গানটি যা বাংলাভাষায় একটি অনিন্দ্যসুন্দর গান :

"চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে !
উজল নয়নে কে গো হাসিলে ?
মোহন সুরে ধীরে মধুরে
পরাণ-বীণায় কে গো বাজিলে ?"—

বাধা দিয়ে বললাম : "অতুলদা, এ যে একটা সুরের হাওয়া ! আহা 'চাঁদিনী'র রে গা রে পা-র ঐ আরোহণের পরেই 'আসিলে'-র অবরোহণের পঞ্চম থেকে রেখাবে ছায়ানটের ঢঙে—দেশের সঙ্গে ছায়ার এ-মিলন—"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ঈষৎ-রক্তিম মুখে : "তু-তুমি আমাকে বড়—" তাঁর মিষ্ট লজ্জায় কথা মুখে এমন মধুর হ'য়ে বেধে যেত !

"একটুও বাড়াই নি অতুলদা—বাংলায় ঠুংরির এ-আমেজ তোমার আগে কেউ আনেন নি এ আমি তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারি—বিশেষ এ গানটির কোমল কবিত্বের সাথে দেশ রাগিণীর নতুন চাল—"

অতুলদার সদা স্নেহে নরম মুখখানি খুশিতে আরও নরম হ'য়ে উঠল, বললেন : "আরও আছে—একটু পিলুও—" ব'লে তর্জনী উঠিয়ে পিলুটিকে যেন ছুঁয়ে দেখিয়ে দেন আর কি। মনে পড়ে আজও তাঁর কণ্ঠস্বরে ইতস্ততের সে-জড়িমা।

"আহা, অ্যাপলজি কেন অতুলদা—"

"না না—অ্যাপলজি কেন হবে ? শোনো সঞ্চারীটা :

হেম-যমুনায় প্রেম-তরী বায়,
কে ডাকে আমায়—আয় গো আয় !
প্রভাত বেলায় সোনার ভেলায়
কেমনে চ'লে যাবে হায় !"

গান-রচনা সম্বন্ধে সহজে উচ্ছ্বাস বেরোয় না আমার মুখ দিয়ে। তবু উচ্ছ্বসিত না হ'য়েই পারিনি এ-সৃষ্টিতে : "অতুলদা, দেশের সঙ্গে এ ধরণের অপূর্ব মিশ্রণ—"

"যাও দিলীপ—" ফের লজ্জিত। মুখ নিচু করলেন। 'অকোয়ার্ড' যাকে বলে!

—"সত্যি যে অতুলদা। এর নাম হ'ল সত্যি কম্পোসিশন—বিলিতি পারিভাষিকে।" দিলীপও যে-নাছোড়বন্দ!

অতুলদা মুখ তুললেন। তখন তাঁর চোখে কুণ্ঠার কুয়াশা কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে প্রীতির সলজ্জ আভা: "স-সত্যি তোমার ভাল লেগেছে দিলীপ? দেখ, আ-আমি কখনো কোনো দিন মনেই করতে পারিনি যে আ—আমার গান কারুর এত ভালো লাগতে পারে।" একটু থেমে: "কিন্তু দেখ,—শেষের আভোগটা এখনো আমার ম-মনোমত হয় নি।" আত্ম-প্রশংসা শুনলেই তাঁর কথা কি রকম পদে পদেই বেধে যেত!

পরে যখন মনে ধরেছিল শুনিয়েছিলেন:

তব সে কূলে, যাবে কি ভুলে
যে-ভালবাসা বাসিলে!"

তার পর মনে পড়ে আমরা কতবারই শুনেছি এ গানটি তাঁর কোমল গভীর কণ্ঠে। অত খাদের গলায় কী পেলব কোমলতা!—সে কি ভুলবার? চড়া পর্দায়—high frequency-তে—ছোট ছোট মিড় খোঁচ খোলে সহজে। এটা হ'ল ধ্বনিতত্ত্বের একটা গোড়াকার কথা—যেমন তীব্র আলোয় পথের বন্ধুরতা ওঠে ফুটে। কিন্তু সেই খাদের গলায়ও কী দরদ, কী অপূর্ব মিড় আর সূক্ষ্ম গমকই না বেরুত তাঁর কণ্ঠে! নইলে কি এসব ঢেলে দিয়ে যেতে পারতেন তাঁর গানের রসে! "He best can paint them who shall feel them most." তিনি যে মনে প্রাণে দিতেন সাড়া সুরের সূক্ষ্মতায়! তাই তো হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের এই অপরূপ সৌকুমার্য তিনি বাংলা

গানে সঞ্চারিত ক'রে গেছেন। এ যে কত বড় দান ক'জন তার খবর রাখে বলো তো? আমরা অনেকে (নিতান্তই মুষ্টিমেয় কতিপয়) কি সাধে বলতাম: "বাংলাদেশে মাত্র দুজন সত্যিকার বড় সুরকারের জন্ম হয়েছে—প্রথম শ্রেণীর: খেয়ালে ও পৌরুষে—দ্বিজেন্দ্রলাল, ঠুংরি ও কোমলতায়—অতুলপ্রসাদ।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পরে একথা স্বীকৃত হবে প্রতি সুরপ্রিয় মানুষের কাছে।

"সুরকার" বলতে আমি কবি বুঝছি না কিন্তু, বুঝছি যাকে ওরা বলে "কম্পোজার"—গানের সুরের দিকটার স্রষ্টা—বিশেষ ক'রে।

গেটের গানে অন্যে সুর দিয়েছেন—যেমন শুবার্ট বা শুমান—কাজেই গেটে কবি কিন্তু কম্পোজার শুবার্ট বা শুমান। ওদের দেশে কিন্তু কবি ও সুরকার একাধারে প্রায়ই মেলে না, যেমন আমাদের দেশে মিলেছে, ধরো, নিধুবাবুর সময় থেকে আরম্ভ ক'রে। তাই আমাদের দেশে এ-শ্রেণীর সুরকারকে নিছক কম্পোজারের পদবি দেওয়া যায় না। কিন্তু পারিভাষিকের কথা যাক,—যা বলছিলাম: যিনি গান ও সুরের সমন্বয় করেন কেবল তিনিই পেতে পারেন সুরকারের পদবি। এখনো অতুলপ্রসাদের গানের রসমূল্য বিচার করার সময় হয়ত আসে নি। কিন্তু তবু গান তথা সুরের গভীরতা, পেলবতা, ভঙ্গি-লাবণ্য, রস-প্রেরণা—এসব যাঁরা বোঝেন তাঁরা একবাক্যেই বলবেন যে অতুলপ্রসাদের গানের একাধিক দিক থাকলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান: বাংলা গানে ঠুংরির মধুরতম কোমলতম বিচিত্রতম ঝঙ্কারের আমদানি—লীলায়িত ভঙ্গিতে। আর এখানে তিনি সুরকারদের মধ্যে নিশ্চয়ই অগ্রণী।

"লীলায়িত" বলতে আমি কী বুঝছি ব্যাখ্যা মুস্কিল তাঁদের কাছে যাঁরা হিন্দুস্থানি গানের খবর রাখেন না। অর্থাৎ গানকে সুরের অবকাশ

দেওয়া। একথাটা আমি বহুবারই বলেছি তুমি জানো। কিন্তু গান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখা নিষ্ফল বুঝে বহুদিন গান নিয়ে তর্ক ছেড়ে দেওয়ার দরুণ হয়ত হঠাৎ একথা শুনে অনেকের মনে হবে কথাটা ঝাপসা। মোটেই না। তাই কী বলতে চাইছি সংক্ষেপেই বলি ফের। বলতেই হবে, যেহেতু এ হ'ল সুরকার অতুলদার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—তাঁর ক্লাসিসিস্‌ম।

গানে কথার আবেদন খুব দরকার একথা আমি মানি। কিন্তু সুরের আবেদনকে একেবারে চাপা দিয়ে না। সে-গান গাইতেই আনন্দ বেশি যে-গানে সুরের ঐশ্বর্য্য আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এহেন গান শুনতেও একঘেয়ে লাগে না, কেন না একই গানের কুঁড়িকে প্রেরণার ইঙ্গিতে নতুন নতুন সুরের বসন্তে বিকশিত ক'রে তোলা যায়। কি না যাকে বলে গানে সুরের প্ল্যাস্টিসিটি। এই হ'ল ভারতীয় গানের বৈশিষ্ট্য—এ'কেই বলি ক্লাসিকাল চাল। য়ুরোপীয় গানে এবস্তু নেই সবাই জানে। ওদের পারিভাষিকে: সে-গানে "ইম-প্রভাইজেশন" নেই—যেমন আমাদের গানে আছে। গানকে তানের লয়ের আড়ির বিরামের বিস্তারের নানা অবসর দিলে তবেই সে গান হয়ে ওঠে—আমাদের মতে। য়ুরোপের সুরকাররা একথা জানেনই না। তাঁদের গানের স্বরলিপিতে এমন কি এ-ও ছ'কে দেওয়া হয় যে, কোথায় পিয়ানোর পেডাল দিয়ে সঙ্গতকে মন্দ্রিত করতে হবে, কোথায় না! কোথায় সুর প্রবল হবে কোথায় দুর্বল, কোথায় সুর বেশি স্থায়ী হবে (তার চিহ্ন ওরা দেয় চন্দ্রবিন্দুর মত সঙ্কেত দিয়ে!) কোথায় আলেগ্রো (দ্রুতগতি) হবে, কোথায় লেগাতো (ঠায়) হবে—সবই ধ'রে বেঁধে দেওয়া!! কত বড় গায়ক গায়িকাই ওদেশে আমাদের কথায় সায় দিয়ে দুঃখ ক'রে বলেছে: "একথা

খুবই ঠিক যে আমাদের গায়করা হ'ল নিছক বাহন, আপনাদের—স্রষ্টা। আমাদের গাইবার কোনো স্বাধীনতাই নেই—সবই সুরকার বেঁধে ধ'রে দিয়েছেন—একটু বদলাবারই কি ছাই জো আছে সব হাঁ হাঁ ক'রে উঠবে।"

কেন উঠবে তাও সুবোধ্য। ওদের গান হার্মনিসঙ্গতে—পিয়ানোয় বা অর্কেস্ট্রায়—গাওয়া হয়। কোথাও বদলাবে সাধ্য কি—সুরসম্পদ হবে ভ্রষ্ট—(কংকর্ড হবে ডিস্‌কর্ড—ওদের পারিভাষিকে)—ফল হবে: বেসুরো জাতীয় একটা শ্রুতিকটু বিশ্রী ব্যাপার। তাই ওদের দেশে একথা সর্ববাদিসম্মত যে ওদের গানে কম্পোজারই হ'ল প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা, একসেক্যুটাণ্ট—বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর। কারুসো বাতিস্তিনি বা শালিয়াপিনের আদর নেই বলছি না—কিন্তু সে-আদরের জাতই আলাদা—ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তাঁরা। বিটোভন ওয়াগনার মোজার্ট শুবার্ট এঁরাই হ'লেন ব্রাহ্মণ, সুরব্রহ্মজ্ঞ—ওদের দেশে।

আমাদের গানে কিন্তু হার্মনি নেই। (দু একজন সুর-অজ্ঞ সমালোচক সেতারের চিকারি বা তাম্বুরার সুর পঞ্চমের একত্রে বাদনকে বলেন 'হার্মনি'। হার্মনি কাউণ্টার-পয়েণ্টের ক খ-ও যাঁরা জানেন না তাঁরাই একথা বলেন) কাজেই আমাদের গানকে ধ'রে বেঁধে দিলে সে বড় হয় না। আমি বলছি না সে-গানের কোনো সুর-মূল্যই থাকতে পারে না। কিন্তু সে-গানে আমাদের গানের শ্রেষ্ঠ ধারা—সেরা চাল—বজায় রইল না—সে সব গান ওদেশে গেয়েছি কতবারই—ওরা শুনে বলে: "এ তো আমাদেরও আছে, নতুনটা কী?" তাছাড়া এ ধরণের সুরবৈচিত্র্যহীন গান গেয়ে ওদের সমকক্ষও হওয়া যায় না। কারণ, বলেছি, ধরা-বাঁধা গানের ক্ষতিপূরণ ওরা পায় হার্মনিতে। আমাদের সে-বালাই নেই, কাজেই আমরা যদি গানকে অনড়ভঙ্গি

অচলসুর করি তবে ভবভূতির ভাষায় "মহতী বিনষ্টিঃ" হবেই হবে। অন্ততঃ সে গান প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত—ক্লাসিকাল সৃষ্টি—হবে না কোনোমতেই—একথায় অনেকে রাগ করলে করব কী?

দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ বুঝতেন একথা। কেন না—বলেছি—তাঁরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার অদ্যাবধি। তাঁদের শ্রেষ্ঠ গানের সঙ্গে অন্য নানা সুরকারের গানের তুলনা করলে যে-কোনো সুরবিৎ-ই বুঝতে পারবেন একথা। কারণ তিনি দেখতে পাবেন কী অপরূপ ভঙ্গিতে এই দুই শ্রেষ্ঠ সুরকার তাঁদের গানে স্বরের আকাশ খোলা রেখেছেন। এক কথায় এঁদের শ্রেষ্ঠ গান (যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের—"তোমারেই ভালো বেসেছি আমি তোমারেই ভালোবাসিব" দরবারী কানাড়া, বা "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই" বাগেশ্রী, বা "আর কেন মা ডাকছ আমায়" সিন্ধু, "এ জগতে আমি বড়ই একা" ভীমপলশ্রী, "এসো প্রাণসখা এসো প্রাণে" বাহার প্রভৃতি খেয়ালপন্থী বহু গান, বা অতুলপ্রসাদের বহু ঠুংরিপন্থী গান)—আমার সাঙ্গীতিকীতে ওদের একটা ফিরিস্তি দিয়েছি,—এসব গান শুনতেও আনন্দ গাইতেও আনন্দ, কেন না গাইতে গায়ক তার সুরসৃষ্টির অবকাশ পায় প্রেরণা পায়। একথাটা ভুললে আমাদের গানের সর্বনাশ হবে যে, আমাদের গায়ক হ'ল সত্যিই খানিকটা সুরকার—স্রষ্টা—য়ুরোপীয় গায়কদের মতন বাহন বা আজ্ঞানুবর্তী নয়। এইজন্যেই আমি বলি যে, যে-গানে সুর ছাড়া পায় নি সে গানে সুরের চটক হাজার শ্রুতি-সুখকর হোক না কেন সে হ'ল দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি। আমাদের গানে আমাদের সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে য়ুরোপীয় গানের অনুকরণে নিরুৎসাহ ক'রে দিলে ওদের সমান তো হ'তে পারব না (কেন না অনুকরণে বড় সৃষ্টি হয় না) লাভের মধ্যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদটাই হারাবো, যার নাম—

ভারতীয় সুর-সাধনার ঐতিহ্য—ট্রাডিশন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ একথা বুঝতেন ব'লেই তাঁদের গান নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যা অন্য অনেকের গান—নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও—হয়নি। অথ বাংলা গানের সম্বন্ধে কিছু বলার সময় এল।

বাংলা গানের ঢেউ নিধুবাবুর—তারও আগে, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির—আমল থেকে ব'য়ে আসছে প্রধানত দুটো খাতে: রামপ্রসাদি ভাটিয়ালি বাউল তরজা কথকতা প্রভৃতি মেঠো সুরের প্রণালীতে, ও টপ্পার চালে—যাত্রা কথকতা প্রভৃতিতে। * পরে ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের হাল আমলে ধ্রুপদের প্রবর্তন করার চেষ্টা হয় বাংলা গানে। কিন্তু যাঁরা সে সব গান রচনা করলেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্রুপদের গঠনকারুর—টেকনিকের—সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, কেন না অত কষ্ট ক'রে কণ্ঠসাধনা, তালসাধনা, নাদসাধনা ক'রে ধ্রুপদ রীতিমত শিক্ষা করার মতন না ছিল তাঁদের নিষ্ঠা, না প্রতিভা। সত্য ধ্রুপদী হওয়া কঠিন তো বটেই। অঘোর চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রাও, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নির্ভেজাল উদাত্ত-ঝঙ্কার ধ্রুপদ বাংলা থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে ব'লে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ

---

* এখানে কীর্তনকে আমি বাদ দিচ্ছি, কেন না কীর্তনের অপূর্ব গরিমা ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ভাবতে গেলেও অবাক না হ'য়েই পারা যায় না। না এদেশে না ওদেশে মেলে ও ধরণের গান—আঁখরে সুরে তালে দোয়ারে গৌরচন্দ্রিকায় পালা গানে—এ ধরণের সুরের চমক ভাবের গমকের সাথে। কীর্তন সঙ্গীত-জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম্। ওর তুলনা ও-ই নিজে, কারুর সঙ্গে ওর কোনই মিল নেই। ওতে আছে কাব্য ভাব তান সুর তাল ছবি—এক কথায় নাটকীয় সমন্বয়—ভক্তির প্রেমের পটভূমিকায় ওকে প্রশংসা করব কি—ভেবেই পাই না কী ক'রে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল!

সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তোমার আমার কাছে কতবারই না আক্ষেপ করেছেন আজও মনে পড়ে।

ধ্রুপদ বাংলা গানে কায়েম হ'তে পারে নি যদিও বাঙালি গায়ক হিন্দুস্থানি ধ্রুপদে প্রথম শ্রেণীর গায়ক হয়েছেন। (অঘোর চক্রবর্তীর, রাধিকা গোস্বামীর ধ্রুপদ অবিস্মরণীয় কে না বলবে?) কারণ, বলেছি, সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি অসম্ভব তার গঠনকারুর (টেকনিকের) সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে। অনেক অল্পাভিজ্ঞ শ্রোতা এই গোড়াকার কথাটা জানেন না ব'লেই দু'টো মিষ্টি সুর শুনতে না শুনতে গদ্‌গদ হ'য়ে ব'লে ওঠেন: "আহা হা হা—কী কম্পোজিশন রে!" কিন্তু এক ভুক্তভোগীই জানেন শুধু দুটো চটকদার সুর রংদার তালে বসাতে পারলেই সঙ্গীতসৃষ্টি হয় না—সঙ্গীতেরও আছে কাব্যের মতনই স্থাপত্য-কারু—আরকি-টেকচার—আর এ স্থাপত্যজ্ঞান আয়ত্ত হয় বহু সুরসাধনায় বহু শ্রবণে। দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়ালে এ জ্ঞান হ'য়েছিল কেন না তিনি আশৈশব তাঁর পিতা কার্তিক রায়ের খেয়াল শুনে মানুষ—শ্রেষ্ঠ গানের খেয়ালের নিবিড় ছাপ পড়ে তাঁর কোমল শিশুমনেই। তাছাড়া পরে অনেক বিখ্যাত খেয়ালীর (যেমন অন্ধ শরৎ) গান খুবই শুনতেন ও বিশেষ ক'রে অদ্বিতীয় গুণী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গান থেকে শিখতেনও নানাভাবে। কাজেই খেয়ালের প্রাণধারা বাংলার সুরের মাটিতে তিনি অনেকটা পরিমাণে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন। দুঃখ এই সে সব গান গাইবার বা সে সব রচনার মূল্য দেবার লোক এযুগে বড়ই কম। কারণ সব উচ্চ সৃষ্টির মতনই সত্য খেয়ালে রস-পাওয়া সাধনা-সাপেক্ষ, এবং ভালো চালের ধ্রুপদ বা খেয়াল কী বস্তু তাই শতকরা নব্বই জন বাঙালীর অজ্ঞাত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। যাক।

কিন্তু খাস ঠুংরির চাল দ্বিজেন্দ্রলালও জানতেন না। মেটেবুরুজে নির্বাসিত ওয়াজিদ আলি শার সভাগায়কদের ও পরে অপূর্ব সুরকার মৈজুদ্দিন খাঁর হাতে ঠুংরির হয় অভিনব বিকাশ গত পঞ্চাশ বছরে।* কিন্তু বাঙালীর এ বিষয়ে কোন শিক্ষিত-পটুতা ছিল না—কারণ ঠুংরি ছিল সারঙ্গিওয়ালা ও বাইজিদেরই ঘরানা চীজ। মৈজুদ্দিন খাঁর কাছে ভারতের বিখ্যাত বাইদের অনেকেই শিক্ষা করেন—একথা নানা বাইজীর কাছে গান শিখতে গিয়ে তাঁদের মুখেই আমি শুনেছি। কাজেই বলা যায়, তাঁর ও মেটেবুরুজের ঠুংরির চাল হিন্দুস্থানে চালিয়ে দেন প্রধানত বাইজিরা। ওস্তাদরা, তো অবজ্ঞাভরে ঠুংরি গাইতেনই না—এই সেদিনও ৺অতুলপ্রসাদ লক্ষ্মৌয়ে থাকার দরুণ আকৈশোর খাস ঠুংরির পরিচয় লাভ করেন—যাকে বলে অন্তরঙ্গ পরিচয়—দরদ প্রেম দিয়ে গ্রহণ করার পরিচয়। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কবি মনীষীদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানতেন ঠুংরি কী বস্তু। অনেকেই মনে করেন ঠুংরি বুঝি একটা তাল মাত্র—এত বিস্ময়কর ছিল এ বিচিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। তাই বহুদিন অবধি অতুল-প্রসাদের বাংলা ঠুংরির কদর হয়নি। মনে আছে আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে প্রথম তাঁর গান শুনি লক্ষ্মৌয়ে—১৯২৩ সালে—তখনও বাংলাদেশে তিনি "উঠগো ভারতলক্ষ্মী"র কবি—স্বদেশী কবি—ব'লেই

* কেউ কেউ বলেন গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব লক্ষ্মৌ ঠুংরির রচনাকার। তিনিও সুরকার ছিলেন বৈ কি, এবং বহু ওস্তাদ বাইজিকেও শিখিয়েছেন। কিন্তু মৈজুদ্দিনকে যে-ভাবে ঠুংরির অন্যতম রচয়িতা বলা যায় ভাইয়া সাহেবকে সেভাবে বলা যায় না। কারণ তিনি ছিলেন বাদক, গায়ক নন। এবং বাদকরা গানে ঠিক প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি করতে পারে না।

পরিচিত। সৌভাগ্যক্রমে সুর শুনলে আমি তা একটু আধটু চিনতে পারতাম—তাছাড়া ঠুংরির ভক্ত আমি কৈশোর থেকেই। একাধিক ওস্তাদের কাছে শিখেছিলাম ওর মর্মবাণীটি। ফলে আমি শুনবামাত্র চিনতে পারি যে যা আমি চাইছিলাম এ সেই বস্তু: ঠুংরির কোমলতম, মধুরতম, উৎকৃষ্টতম আমেজ—বাংলা গানে।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হই আমি প্রথম এই প্রণালী দিয়েই। পরে তাঁকে ভালবেসেছিলাম মানুষ হিসেবেও। কিন্তু সে কথা আজ না। সে সব বলতেও বাধে। মানুষ-হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন আজকালকার সাহিত্যের পাতায় বলতে সঙ্কোচ হয়। কারণ আজকালকার সাহিত্য (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) দলাদলি পরশ্রী-কাতরতার কুৎসা-রটনার ক্ষেত্র—আর্টের অজুহাতে। এক্ষেত্রে তাঁকে নামাতে ইচ্ছা করে না। আমি বলি শুধু এই মধুর মানুষটির সুরের কথা সহজ সরলভাবে।

সুর। কিন্তু বলা কি যায় সুরের কথা মানুষটাকে বাদ দিয়ে? সে দরাজ প্রাণ, সে কোমল প্রাণ, সে পেলব প্রাণ, সে মধুর প্রাণ—সব যে তাঁর গানের শাখায় শাখায় বেঁধেছে নীড়,—রচেছে মণিমঞ্জুষা!…সে মঞ্জুষার ডালা খুলতে গেলেই সুরের সাথে যে বিছিয়ে যায় তাঁর প্রাণের সৌরভ, প্রেমের আলো!…মনে পড়ে তাঁর বিখ্যাত "কত গান তো হ'ল গাওয়া"র একটি চরণ:

যদি আমার দিবারাতি
কাটি' যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধু লাগি'
পথ পানে শুধু চাওয়াও?

বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

সত্যিই ভুলবার নয় অতুলদার কণ্ঠে "যদি আমার দিবারাতি"র সেই নিখাদ থেকে সপ্তমে স্থিতি ! সেই "বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া" গাইতে তাঁর বেদনার অনাড়ম্বর নিবিড়তা ! আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠা—মানুষের জন্ম-নিঃসঙ্গতার মধুর বেদনা !

ও-গানটি যে তাঁর মুখে শুনেছে সে কি জানে কত দরদ দিয়ে এর প্রতি চরণটি লেখা ? গজলের তীক্ষ্ণ রোদন এর মিড়ে কী ভাবে ফুটে উঠেছে সেভাবে কি উপলব্ধি করা যায়—তাঁকে না জানলে ?

কী ? আর্টের ভূমিকা—কন্‌টেক্স্‌ট্‌—দিয়ে তাকে বিচার করতে যাওয়া ভুল ? জানি ওসবই। কিন্তু ও মিথ্যা। মানে বড় সৃষ্টির মধ্যে তার ভূমিকাও ওঠে ফুটে। উঠবেই। যে-ই জীবনে একলা বোধ করেছে সেই অতুলপ্রসাদের এ প্রশ্নের মর্ম বুঝবে—"যদি আমার দিবারাতি কাটি' যাবে বিনা সাথী..."

কিন্তু এ প্রশ্নের বেদনা সমগ্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারা যেত তাঁর সমগ্র-হৃদয়-দিয়ে-গাওয়া গান শুনলে তবেই। তাই তাঁর মুখে তাঁর গান শোনা ছিল একটা সৌভাগ্য। বাস্তবিক তাঁর মুখে না শুনলে হয়ত তেমন ক'রে বুঝতেই পারতাম না—তাঁর গান কী অপূর্ব বস্তু ছিল। তিনি গানে কোনো অসাধ্য-সাধন করতেন ব'লে নয়। বড় গাইয়ে তিনি ছিলেন না, সুরেন্দ্রনাথের মতন। সেদিকে তাঁর দান নয়। কিন্তু সমস্ত প্রাণকে এ ভাবে স্বরচিত সুরেলা গানের মধ্যে

ঢেলে গান গাইতে এক দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্য কাউকে শুনিনি। তাই বলছি : অতুলপ্রসাদের বা দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে তাঁদের স্বরচিত গান শোনা ছিল একটা শিক্ষা : সুরের শিক্ষা, দরদের শিক্ষা, কাব্য কোন্ ইন্দ্রজালে গান হয় তার শিক্ষা।

মনে পড়ে যখন অতুলদা গাইতেন :

> "যাব না,—যাব না,—যাব না ঘরে,
> বাহির করেছে পাগল মোরে!
> আকাশের দুতীরে দু'বেলা
> আলো কালো করে হোলি খেলা ;
> আমার পরাণে লেগেছে রং
> কালোর 'পরে।"

তখন একটা অতি সামান্য চলতি মেঠো হিন্দুস্থানি সুরকেও তিনি সুকুমার অনুভবের স্পর্শমণিতে কী মধুর সুরকারুতে ফুটিয়ে তুলতেন—আড়ির (syncodation) সাহায্যে! এ-আড়ির মাধুর্য কয়জন সুরকার জানেন? এ জিনিষ অশিক্ষিত-পটুতায় সম্ভব নয়।

তাই বলছিলাম অতুলদা এ পেরেছিলেন তিনি ঠুংরির টেকনিকটির ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন ব'লে, জানতেন ব'লে—সুরের মোচড় ঠিক কাকে বলে, কোথায় ঠুংরির মর্মরস পড়ছে উপছে।

কবি যেমন জানেন ঠিক ছন্দে ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটির (le mot juste) যোগান দিতে, চিত্রী যেমন জানেন ঠিক জায়গায় ঠিক রেখার 'পরে ঠিক রঙের বিন্যাস করতে, তেমনি যথার্থ সুরকার জানেন ঠিক জায়গায় ঠিক তালের ঠিক খোঁচটির ঝঙ্কার দিতে। অতুলদা জানতেন, কেননা তাঁর প্রাণের বীণাটি ছিল সুরেলা, রঙের ডালাটি ছিল শ্যামল,

এক কথায় হৃদয়ের গোপনতম তন্ত্রীতে মৃদু গানও উঠত রণিয়ে—যেমন ভোরের আকাশে টুকরো আলোও ওঠে গুনগুনিয়ে!

কিন্তু একথা তুমিও জানো, আমিও জানি যে, এসবই সাধারণের কাছে মনে হবে উচ্ছ্বাস। সুরকে যে-কানে লোকে সাধারণত শোনে সে-কান নিয়ে অতুলপ্রসাদের গান শুনলে মনে হবেই: সে-সুর এমন কিছু নয়। কিন্তু যার কাছে সুর একটা আশ্চর্য সত্য তার শোনার ভঙ্গি প্রকাশের ভঙ্গিই যে যাবে বদ্‌লে। অবাস্তবকে মনে হবেই স্থূলতম সত্য—রঙিনকে মনে হবেই বাস্তব। তাই অতুলদার লাজুক ছোট্ট সুরের নিটোল বিকাশে যে-সুর-পাগলের মন উদাস হয়েছে ঐ অ-ধরার কথা ভেবে, তার মনে বেদনা না জেগেই পারবে না যে সে-কণ্ঠ আজ চিরদিনের মত নীরব, সে-লেখনী চিরদিনের মতনই স্তব্ধ, সে-প্রাণের "আলো-কালোর হোলি খেলা" চিরদিনের মতনই নিরঙ।

সত্যি, প্রাণে তাঁর রঙের ঝুলনোৎসবের কি সমাপ্তি ছিল?

মনে পড়ে তাঁর সেই মৃদুল কালাংড়া?—

"আয়, আয়, আমার সাথে ভাসবি কে আয়!
আয় আ—য়!
ঐ দেখ্ সুরধুনী,
ছোটে কার ডাকটি শুনি'
আমিও ডাক শুনেছি—
আয়, আয়, আয়।
চল্ আজ স্রোতের সনে,
ছুটি' সেই ডাকের পানে,
যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়!"

এসব গানেই পরিচয় পাই তাঁর রচনার কোন্ সৌরভটির বলো তো? আমার মনে হয় যাকে ইংরেজিতে বলে রেটিসেন্স—যাকে একজন বর্ণনা করেছেন "framed in silence" ব'লে।*

বাংলায় এর প্রতিশব্দ নেই, অনুবাদ করতে গেলে একে "বিজনতা" বলতে হয়। এ গুণটি গানে কত বিরল গুণ সুরজ্ঞমাত্রেই জানেন। অনেক ভাল গান-রচয়িতাও গানে যা বলার সবই সাড়ম্বরে ব'লে দেন; গানের যে-বহির্মুখরতা তার পিছনে থাকে না কোনো মৌনতা। অতুলপ্রসাদের গানে ছিল এই মৌনতা, এই বিজনতা, এই আলজ্জ সংযম। তাঁর সেই অপূর্ব খাম্বাজটি মনে পড়ে না?—

"কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটীরে!
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি,
কুঞ্জ-কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।
ও দুটি নয়ন-মণি চিনি যে গো আমি চিনি
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল শিশিরে।"

কী অপূর্ব রেটিসেন্স—বর্ণনা-সংযম! কী নিটোল রসপ্রবাহ, পাঁপড়ির অদেখা কোলটির মত নরম! কী সৌগন্ধী পেলব তূলি! আর সবচেয়ে বড় কথা: কী নরম সুরখানি! ঠিক্ দোলানিটি ঠিক জায়গায়—যার নাম—ইনেভিটেবিলিটি! এতটুকু জাহিরিপনা নেই, নেই আড়ম্বর, নেই প্রচার, নেই নিজের সুরের গভীর অনুভবকে বেআব্রু করার প্রয়াস। আর তানে তানে আছে ঐ বিজনতা—সংযমের মধ্যে দিয়েই যে নিজেকে প্রকাশ করে অফুরন্ত উচ্ছলতায়। মনে

* এখানে ব'লে রাখি: তানের দৃশ্যত অজস্রতার মধ্যেও রেটিসেন্স থাকতে পারে। কারণ প্রতিভা জানেন যেখানে দশটা তান মনে আসে, সেখানে অন্তত পাঁচটাকে বাদ দিতে হয়। রেটিসেন্স মানে নয় যে সুরকে নানা ভঙ্গিতে না গাওয়া।

হ'ত নাকি—তাঁর প্রতি মিড়েই যেন তাঁর প্রাণটি গান হ'য়ে না ফুটে উঠতে পারেনি ব'লেই প্রকাশ করেছে আপনাকে কত সঙ্কোচে—কত কুণ্ঠায়—কত মধুর সলজ্জ শঙ্কায় ?—তাঁর গানে ঠুংরির এই আধখানি-বলা আধখানি-না-বলা আদর ও মান অভিমানের কোমল কাঁপন আলোছায়া কত গানেই না উদ্বেলিত !—

"কে গো তুমি, বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে ?"

এ সাদর নিমীল মুগ্ধ প্রশ্ন আজও যেন শুনি কানে শেষে সেই জৌনপুরীর খোঁচের সাথে—"সম্ভাষিলে"! দুঃখ এই যে, গেয়ে না শোনালে কালির আখরে এ কথাকে যায় না বোঝানো। তাইত আমি গান-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি না। গান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বৃথা। ও গেয়ে নিবেদন করার বস্তু—লেকচার দিয়ে প্রতিপন্ন করার নয়। কী ক'রে বোঝাব কী অপূর্ব ছিল এই গানটির অন্তরায় সুর ও কথার আংটি-বদল ?—কী ক'রে জাগাবো সুরের এ-আফোটা প্রশ্ন :

"শারদ নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে,
পীতকায়ে মৃদু বায়ে মম পাশে আসিলে
কে আমারে সম্ভাষিলে !"

শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণে লাগত কী অপূর্ব দোলা—মনে রস জ'মে উঠত যেন মৌচাকের মতন! সে কি বলা যায় কখনো ? তবু বলতে ইচ্ছা করে—এম্‌নিই আমাদের দুর্বলতা! যা অনির্বচনীয় কথায় তার যতটুকু পারি ততটুকু ইঙ্গিতও না দিলে মনে হয় যেন কোথায় প্রত্যবায় ঘটল বা। কে যেন বলে : অকৃতজ্ঞ! বলি তাই আর একটু।

একটা কথা তুমিও জানো। এ সব গানের ছন্দ প্রায়ই তিনি একটু আল্‌গা ক'রে বাঁধতেন। তাই সুরের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর

গানকে না দেখলে শুধু ছন্দের কাঠামোয় দেখতে গেলে অনেক সময়েই মন পূর্ণ তৃপ্তি পায় না যেন। যেমন, ধরা যাক্, উপরের গানটি। এর প্রতি পর্বের চারটি স্বরকে তিন পর্বে (তেওরার সাত মাত্রায়) বিছানো হ'য়েছে—"ভাবিলে"র ওজনও তিন নয়, সাত। অর্থাৎ ঐ তেওরা তালের পূরো এক আওর্দায় মেলে-ধরা আলগা-ভাবে। বাধ্য হ'য়ে সাহিত্যের পাতায়ও একটুখানি গানের স্বরলিপি দিতে হ'ল :

\+ ২ ৩ + ২ ৩
গা পা পা। ধা-া। ধর্রা র্সর্া। র্সনা র্সা ণা। ধা-া। -া-া*
আ — মা রে — সম্ — ভা — বি লে—

আমার সেই অষ্টমী বোন্‌কে যখন এ গানটি শেখাতাম তখন "ভাবিলে"-র মিড়টি যে কী মধুরই লাগত! কিন্তু স্বরলিপিতে তার কচি গলার অপূর্ব মিষ্টতার আভাষ কেমন ক'রে ফুটবে? তবু এইটুকু স্বরলিপি দিলাম ইঙ্গিত করতে যে চারের ছন্দ সাতের তালে বসানোর অপূর্ব কৃতিত্ব থাকে এক সত্য সুরকারের। অতুলপ্রসাদ এটা যে পারতেন তার কারণ সুরই আসত তাঁর প্রথমে। অর্থাৎ তিনি গান লিখতেন আগে না—তাঁর মনে সুরই আগে আসত গুনগুনিয়ে—কথা আসত পরে। তাই না তিনি তাঁর নানা গানেই এক ছন্দের কবিতাকে এমন ক'রে সম্পূর্ণ অন্য তালে বসাতে পারতেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এ-গানটির সুর দিতে গেলে কারুর কখনো স্বপ্নেও মনে হ'ত না এটিকে সাত মাত্রার তেওরার তালে এমন সুন্দরভাবে গাওয়া যায়। অথচ সাতের তালে এর গতি এতই স্বাভাবিক সুন্দর যে শুনলে মনে হবেই

* কাকলি, দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠায় স্বরলিপি দ্রষ্টব্য।

যে, বাঃ এ তো আমরাও পারতাম। এই অকৃত্রিমতায়ই ছিল তাঁর সুরেলিয়ানা, এইখানেই ছিলেন তিনি স্বভাব-সুরকার। অথচ এমন কথাও শুনেছি যে অতুলপ্রসাদের গান গানই নয় যেহেতু ওতে ছন্দের ভুল আছে,—মিলের গলদ আছে ইত্যাদি।

আছে ছন্দের ভুল—মানি। অনেক গানে সে-ভুল গুরুতর এ-ও স্বীকার করব। অনেক গান তাঁর গানই নয়, এ-ও মেনে নেব অকুণ্ঠে। কিন্তু মানুষকে তার ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা চলে না: "The greatness of a man is the greatness of his greatest moments" তাই অতুলপ্রসাদের নানা ত্রুটি মেনে নিয়েও অকুণ্ঠেই বলব: তিনি ছিলেন কবি, ছিলেন প্রেমিক—কেন না তাঁর মধ্যে ছিল কবিতার সেরা কবিতা—যার নাম সুরের প্রেম! এ কথা তাই একটুকুও বাড়িয়ে বলা নয় যে, তিনি ছিলেন সুরেলা অতুলপ্রসাদ যে-ধরণের উচ্চশ্রেণীর সুরেলা সঙ্গীত-রচয়িতা যে-কোন দেশেই মেলা ভার—এমন গুণী—যাঁর হৃদয়ে সুর ওঠে গুনগুনিয়ে—বসন্তে ভ্রমরগুঞ্জনের মতনই, নির্মেঘ উষার রবিচ্ছটার মতনই: স্বভাবে—আপনা থেকে। সুরকে তাঁর কোনোদিন ডাকতে হয় নি—সুরই তাঁকে ডেকে এসেছে চিরদিন—বরণমালা বরণডালা নিয়ে। আর গান রচনা করেছিলেন তিনি এই সুরেরই ইশারায়—কবিত্বের নয়। মানি, কথার আনন্দও তাঁর গানে প্রচুর মেলে। মানি, তাঁর অনেক গানের অনুভব রস-নিটোল হয়ে ফুটেছে তাঁর কবিত্বের জন্যেও বটে। কিন্তু তবু বলব তাঁর গানের কথা সুরকেই ফুটিয়েছে, অন্য অনেক রচয়িতার মতন সুর হয়নি কথার বাহন। ছন্দ যখন কথাকে নিয়ে চলে বচনাতীত আনন্দলোকে—তখন শিল্পী হ'ন কবি, কথা যখন সুরের পাখা মেলে চলে আলোকলোকে তখনই তিনি হ'ন সুরকার—কম্পোজার।

একথা এত ক'রে বলছি কেন আর কেউ না বুঝুক তুমি বুঝবে। কথাটা ভুল-বোঝার সম্ভাবনা আছে, তাই আরও বিশদ ক'রে বলি।

ঠিক সুরকার যাকে বলে বাঙলায় তিনি জন্মান নি বেশি, শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়াদের পরে। বৈষ্ণব কবিদের গানেই প্রথম পাই সত্য সুরগুঞ্জন যার ফলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গান হ'ল কীর্তন। কিন্তু কীর্তনেও কথার প্রাধান্য খুবই বেশি। অর্থাৎ কীর্তনের সুর-মূল্যের বৈশিষ্ট্য অপরূপ X বিকাশধারা সুরস্থাপত্যের গৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায় না যে, সুরের ইশারাতেই পদাবলীর উদ্ভব।

কথাটা হয়ত অনেকের কাছে ঝাপসা ঠেকবে: সুরের ইশারা বলতে কী বুঝছি। বুঝছি: ধরা যাক্, হিন্দুস্থানিদের কথাকে সুরের গৌণ বাহন হিসেবে ব্যবহার করার রেওয়াজ। এ প্রথা বহুদিন থেকে জের টেনে আসছে। আকবর শা বললেন: "মিঞা তানসেন, আজ একটা নতুন রাগ শোনাতে হবে মনে থাকে যেন।" মিঞা মহা খুশি। রচনা করলেন এক কানাড়া থেকেই দরবারি কানাড়া, বাহার আড়ানা মিঞা মল্লার, তোড়ি থেকে দরবারি তোড়ি, নাচারি তোড়ি আরও কত কী রাগ রচলেন কত কি তালে কত রকম স্থাপত্য-কারুতে—আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ চার তুকে! কিন্তু এখানে কথা রইল নগণ্য—"জনাবালি" শুনবেন সুর, মাথা নাড়বেন তালে, সমে এসে বলবেন "মহশাল্লা"! সতীর্থ ওস্তাদরা দেখবে কত নতুন বাঁট, লয়কারী আড়ি, কুআড়ি কী অবলীলাক্রমেই ফুলঝুরি কাটছে সুররত্ন মিঞা তানসেনের কণ্ঠের তুবড়ি যোগে। কাজেই কথা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলল—কেউ শুনলই না। হিন্দি গানে তাই কবিত্ব মেলে না ধ্রুপদ খেয়ালে—মেলে মীরা দাদু কবীর প্রমুখ মরমিয়া কবিদের গানে।

কিন্তু এঁদের গান আবার আমাদের সুরৈশ্বর্যে বড় হয় নি। এর কারণও সুবোধ্য : হিন্দুস্থানে এ যাবৎ হিন্দুস্থানি সত্য কবিরা সুরকার ছিলেন না, সত্য সুরকারেরাও কবি ছিলেন না।

মীরাবাইয়ের—

'তুমহারি কারণ সব সুখ ছোড়িয়াঁ অব মোহে কেঁও তরসাও
বিরহ ব্যথা জাগী উর অন্দর সো প্রভু আও বুঝাও।"

শুনলেই মন ওঠে নেচে—এ কবিতা।

কিম্বা কবীরের

বাস কহে : "হম ফুলকো পাউঁ" ফুল কহে : "হম বাস।"
ভাস কহে : "হম সৎকো পাউঁ" সত্য কহে : "হম ভাস॥"
রূপ কহে : "হম ভাবকো পাউঁ" ভাব কহে : "হম রূপ।"
আপসমে দুহুঁ বন্দন চাহে পূজা অগধি অনুপ।

শুনলেই যেকেউ বলবে : "এ খাঁটি জিনিষ—কাব্যরসগাঢ় ভাবগাঢ় অপরূপ পদাবলী।"

কিন্তু হাজার তানসেন, গানসেন, আমীর ওম্‌রাও, ধুরন্ধর সিং, আহম্মদ খাঁ, হক্রু খাঁ, পালোয়ান রাও প্রভৃতির হৃৎস্তম্ভনকারী নজির আওড়াই না কেন মহেশ্বর ত্রিশূল নিয়ে হুঙ্কার করলেও কেউ বলবে না যে এ হল গান যার ছত্রে ছত্রে কবিত্ব :—

"অষ্ট জাম মোহি কৌ ধ্যানরহত বাকৌ আলীকৌ লে ভেটৌঙ্গী।"

বাঙালি প্রাণ বলবেই "এ গানে রাগ-রস থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব-রস নেই—এ গান হাহা হুহু তুম্বুরু গন্ধর্ব কিন্নররা লিখলেও নেই।"

আর এই জন্যেই হিন্দুস্থানি গান বাংলায় তেমন সমাদর পায়নি আজ পর্যন্ত যেমন পেয়েছে কীর্তন, বাউল, সারি, রামপ্রসাদী,

ভাটিয়ালি প্রভৃতি। এদের মধ্যে অনেক নগণ্য অনামাদের গানেও যে কবিত্ব মেলে তানসেন-প্রমুখ অপূর্ব সঙ্গীত-রচয়িতাদের গানেও তা মেলে না।

বাঙালির গৌরবের পালা শুরু এইখানে। সবে শুরু। মরমিয়াদের পরে (হাল আমলে) হিন্দুস্থানিদের মধ্যে বড় কবি জন্মায় নি, কিন্তু বাংলায় বড় সুরকার জন্মেছে। নিধুবাবুকে বড় সুরকার বলা যায় না, তবু তিনিই বোধ করি আমাদের প্রথম সুরকার। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ।

দ্বিজেন্দ্রলাল, বলেছি, প্রথম বাংলা সঙ্গীতে আনেন বিলাতী ওজস —তাঁর স্বদেশী গানে।—অথচ স্বদেশী সুরে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ছিল তাঁর অপূর্ব প্রতিভা—যে কথা অনেকদিন আগে বলেছিলেন বীরবল। এ যে কত বড় কীর্তি তা গান যিনি না জানেন তিনি বুঝতে পারবেন না, করুণ ইমন ঝিঁঝিট-কে নিয়ে তিনি বীররস সৃষ্টি ক'রে গেছেন, "সেথা গিয়াছেন তিনি" "বঙ্গ আমার" প্রভৃতি অনেক গানেই। এ রকম উজ্জ্বল ওজস বাংলা গানে আর কেউ যে আনতে পারেন নি এ বিষয়ে বোধ করি মতভেদ নেই। কিন্তু যেটা এখনো সবাই তেমন ক'রে উপলব্ধি করেন নি সেটা এই যে তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল বাংলা গানে উচ্চাঙ্গের খেয়ালের তান মিড় ও চালের প্রবর্তন— গভীরতম লীলায়িত ভঙ্গিতে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হ'তেই তিনি দেহরক্ষা করলেন মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে। গানের দিক দিয়ে কত বড় ক্ষতি যে হ'ল তাঁর অকাল মৃত্যুতে— যে কথা শরৎচন্দ্র তাঁর এক শ্রাদ্ধবাসরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন। বলেছিলেন গানে অসামান্য প্রতিভা থাকার দরুণ ঐ বয়সে সরকারি চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও অত নাটক প্রহসনাদি লিখেও এত

উৎকৃষ্ট প্রথমশ্রেণীর গান রচনা ক'রে গেছেন তিনি প্রথমশ্রেণীর সুরকার হ'য়ে। সুরের কতখানি দুর্নিবার প্রেরণা থাকলে যে এ সম্ভব তা জানেন এক সুরদরদীরা। তাঁদের দুঃখও না হ'য়েই পারে না যে এত বড় সুরপ্রতিভাকে তাঁর শক্তির বার আনা ব্যয় করতে হ'য়েছে সরকারী চাকরিতে। তাঁর যদি অন্ন-চিন্তা না থাকত!...কিন্তু সে যাই হোক্ গানের অন্য একটা বড় দিক তিনি বিকাশ করেন নি—এই ঠুংরির দিক। হিন্দুস্থানি গানে ঠুংরি মধুর—বড় মধুর। তার ভঙ্গির, তার আদরের, তার মান অভিমানের, তার সাদর ভর্ৎসনার তার প্রেম-নিবেদনের, তার চটুল-কটাক্ষের, তার উৎসব-নিমন্ত্রণের, তার ললিত নৃত্যের—কত কী! ঠুংরির একটা দিকও নয়—নানা দিক। অতুলপ্রসাদ এ হেন ঠুংরির নানা পেলব সুষমার আলোছায়া ফলিয়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার দীপ্তি দিয়ে। তাই তিনি সুরকার পদবি পেতে পারেন; কবি-হিসেবে নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও দাবি করতে পারেন প্রথমশ্রেণীর প্রতিভার—গান ও সুরের সমন্বয়ে। উদাহরণ?—কত দেব? এ চিঠিতে তার স্থানই বা কোথায়? তবু দেই একটা। ধরা যাক্, হিন্দুস্থানি ঠুংরি পিলু খাম্বাজকে ঝাঁপতালে, মিড়ে, খোঁচে, লচাওয়ে তিনি কী অপরূপ মূর্তিই দিতেন যখন গাইতেন:

বাদল রুম ঝুম বোলে
না জানি কী বলে!
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উথলে।
কাহার নূপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী?

বিরহী পরাণ তারে যাচে…
আশা ময়ূরগুলি পুছ মেলি নাচে…
রাখিব পরাণখানি তার চরণতলে।

কাশীর বিখ্যাত মোতিবাইয়ের কাছে আমি তুলসীদাস প্রভৃতির কয়েকটি ভজন শিখি ও প্রতিদানে দ্বিজেন্দ্রলালের :

"এ জগতে আমি বড়ই একা আমি বড়ই দীনা"

এই ভীমপলশ্রী খেয়াল, আর অতুলপ্রসাদের এই "বাদল ঝুম ঝুম্ বোলে" ঠুংরিটি শেখাই। সে মুগ্ধ হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়ালের ঢঙে ও অতুলপ্রসাদের ঠুংরির।

আহা কী ঢঙেই না গাইত সে গান দুটি! কী গলা! কী দরদ! কেন এ প্রসঙ্গের অবতারণা?—শুধু জানাতে যে এ-গান ছিল খাঁটি গান।

এ জগতে সাঁচ্চা জিনিষ কয়টা মেলে বলো? কয়জন গান-দরদী বলতে পারে, বুকে হাত রেখে বলতে পারে :—

বিধি! আর তো তোমারে নাহি ডরি?
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী!
যবে কণ্টক-তরুতলে ভাসাবে নয়ন-জলে
আমি কুসুমে দিব গো তারে ভরি'।
হানো যদি খরবাণ আমারও তো আছে গান
আমি সমুখে রহিব তারে ধরি।
জেনো ওহে নিরদয় হবে তব পরাজয়
সন্ধি করিবে এসো অরি!
যারে ব্যথা দিবে তুমি তাহার নয়ন চুমি'
যতনে বেদন ল'ব হরি';
সবারে রাখিব বুকে (মোরে) কেমনে রাখিবে দুখে?
সবাকার হাসি যে গো মোরই!

আমার তাঁর একটা কথা আজ মনে পড়ছে। জীবনে বড় দুঃখের সময় তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণের গানটি লিখেছিলেন যার তুল্য আত্মনিবেদনের গান বাংলা ভাষায় মেলে বোধ হয় দু'চারটির বেশি নয়; (এর সমকক্ষ গান বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের :

"তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি হে আমারই প্রাণ!
কি দিব তোমায় যা আছে আমার সকলি তোমারি দান।")
কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়!
(শুধু) তুমি যে শিব—তাহা বুঝিতে দিয়ো।
বলিব না—'রেখো সুখে'—চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিও,
(শুধু) তুমি যে শিব—তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ;
আমার ভাবনা, প্রিয়! তুমি ভাবিও,
(আর) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি চন্দন-থালা
আমার যে শূন্য ডালা তুমি ভরিও!
(আর) তুমি যে শিব—তাহা বুঝিতে দিয়ো।"

গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হ'য়ে সে-সন্ধ্যায়।

আমাকে সেদিন এ গানটি শেখান। বলেন "দিলীপ...এ গানটি কিন্তু...যার তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি—আমার...বড় ব্যথার আঁধারে লেখা।"

তার পরেই এলেন সভাসদরা। তিনি সদাপ্রফুল্ল সদাশিবের মতন প্রাণখোলা হাসি হেসে মাতিয়ে তুললেন সবাইকে।

রাত্রে একত্রে শুতাম—শুয়ে কত গল্পই হ'ত! রাত বারটা হবে।

বললাম, "অতুলদা, কেমন ক'রে এত হাসতে পারো তুমি—অমন গান গাওয়ার পরেই ?"

অতুলদা মৃদু হেসে ব'লেছিলেন মনে আছে : "দিলীপ, গান ও হাসিই আমার জীবন।" ব'লে হেসে বললেন : "আমি কি প্রার্থনা করি জানো ভগবানের কাছে ?"

আমি বললাম : "কী ?"

অতুলদা বললেন : "শ্মশানে যে দিন আমাকে নিয়ে যাবে—সে দিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন একবার সকলের দিকে চেয়ে খুব ক'রে হেসে তবে চোখ মুদি।"

* * * *

একজন লিখেছন, মৃত্যুর পরেও মুখে তাঁর সেই প্রসন্ন "স্বাভাবিক করুণ মধুর হাসি!"—আশ্চর্য, এই সন্ন্যাসরোগে দ্বিজেন্দ্রলালেরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়—তাঁর মুখেও দেখেছিলাম এই প্রসন্ন করুণ হাসি! দুজনারই ছিল যে প্রাণখোলা হাসি। দুজনাই ছিলেন সদাশিব। পরস্পরের প্রিয়তম বন্ধু। দুজনাই বাঙলার দুই শ্রেষ্ঠ সুরকার।—

মহাপ্রাণ মানুষ এমনি হাসিমুখেই বিদায় নেন বুঝি—
বাংলার ভালে সুরের তিলক পরালে দুজনে অমরপ্রাণ।
তোমাদের স্মৃতি মণিসম জেনো জ্বলিবে যখন গাহিব গান।
"জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি"
তোমাদের গানে ফুল হ'য়ে ফোটে—ধন্য আমরা—লভি' সে দান।*

* "জীবনের…ত্রুটি" চরণটি দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহানের "কেন এত সুন্দর শশধর ও যে তারি মুখ অনুকারি" গানটির একটি অন্তরার চরণ।

অলডাস হক্সলি

"We thus arrive at a conception of the relation of science to religion very different from the usual one. 'When one views the matter historically, one is inclined to look upon science and religion as irreconcilable antagonists and for a very obvious reason···On the other hand I maintain that the Cosmic religious feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research."

The World As I See It......Einstein.

"সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যোগসূত্রটি যে কী সে-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণায় এসে পৌঁছেছি সেটা চলতি ধারণা থেকে খুবই আলাদা। ঐতিহাসিকের চোখে দেখলে স্বতই মনে হয় ওদের সম্পর্কটা অহিনকুলের—আর তার কারণও প'ড়েই রয়েছে।···পক্ষান্তরে আমি খুব জোর ক'রেই বলতে চাই যে লীলাবিপুল অখণ্ড ধর্মানুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মহত্তম ও বলবত্তম প্রেরণা।"···আইনস্টাইন।

"Since Ultimate Reality cannot be calculated, since it must be immediately experienced, they (the physical sciences) can never really know life, but something of the mechanism of life's expression...

"Our greatest need today, therefore, is not to deny

the intellect, but to make it more profound. And we can only do this by recognising that it must be subordinated to something more complete and essential than itself......" (Science And The Changing World—Hugh L' Anson Fausset)

'অন্তিম সত্যকে গুনে মেপে মেলে না—পেতে হয় অপরোক্ষ অনুভবে: কাজেই বিজ্ঞান কোনদিনই জীবনকে সে-ভাবে জানতে পারবে না যাকে 'জানা' বলে। সে জানতে পারে কেবল জীবনের আত্মপ্রকাশের পদ্ধতিকে—তাও আংশিকভাবে।

সুতরাং আমাদের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন বুদ্ধিকে অস্বীকার করা নয়—তাকে আরো গভীর করা। আর এ সম্ভব হ'তে পারে শুধু এই অঙ্গীকারে যে বুদ্ধিকে নত হ'তে হবে এমন কিছুর কাছে যা তার চেয়ে বেশি সর্বাঙ্গীণ ও সারবান্"।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

চিত্তবান্ নিত্যরসিকেষু!

আপনি এখান থেকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার পর পড়লাম আপনার "পুরোনো কথা" বইখানি। প'ড়ে কী ভালোই যে লাগল—! বিশেষ ক'রে আপনার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলি, যেমন সেই বৈরাগী আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতের রঙ দর্শন করিয়েছিল। ইচ্ছে আছে পরে এ সম্বন্ধে কিছু লিখব যা প্রকাশ করা চলে—কারণ জীবনের এমন অনেক অন্তরঙ্গ কথাই আছে যার দীপ্তি সৌরভ খানিকটা আব্রুর অপেক্ষা রাখে। এ চিঠির উদ্দেশ্য অন্য। এতে আমি চাই "নবজাত" অলডাসের আধ্যাত্মিক অনুভব উপলব্ধি সম্বন্ধে দুটো "মনের কথা" বলতে।

আপনার "পুরোনো কথা" প'ড়ে আরো জোর পেলাম—ভরসা হ'ল আপনি শুধু গুরুভ্রাতাই নন দরদীও বটে—যাকে নৈলে শুধু যে "প্রাণ বাঁচে না" তাই নয়—"মনের কথাও কইতে মানা"—গেয়েছেন বাউল কবি। কথাটা লাখ কথার এক কথা। কাঁচা বয়সে মনে হয় বটে যে এ প্রমাণ করব, তা বুঝিয়ে দেব—কেন না অকাট্য যুক্তি এই এই এই ···জানেনই তো শুধু আশাই কুহকিনী নন—যুক্তিও মায়াবিনী! কিন্তু হায়রে, যতই বয়স পাকতে থাকে ততই the-sadder-though-wiser-man-এর মনে হয় টেনিসনের নিরাশায় আশার বাণী:

For nothing worthy proving can be proven
Nor yet disproven: wherefore thou be wise,
Cleave ever to the sunnier side of doubt
And cling to faith beyond the forms of Faith.

যা কিছুতে যায় আসে—হায়, প্রমাণ করার কোথায় ভাবা?
অপ্রমাণও যায় না করা—উন্মাদনার অন্ধকারে:
তাই মন আমার, দ্বিধার ছায়ায় আলোর-কূলেই বাঁধিস বাসা,
বরণ করিস শ্রদ্ধা-তারা মতামতের তুফান পারে।

একথা আরো মনে হয়—হওয়া স্বাভাবিক, মানবেন নিশ্চয়ই—যখন এ-অতীন্দ্রিয় সত্যের সঙ্গে হয় বর্ণপরিচয়—যখন ছায়ার রাজ্যে ঢেউ তোলে ঐ আলোর কূলের সাড়া। কিছুদিন আগেও ওরা এ-সাড়ার কথায় কী চম্‌কেই না উঠত! কিন্তু হাল-আমলে ঋতুচক্র ঘুরে যাচ্ছে যে। এমন কি বিজ্ঞানেরও কমছে অনেক আত্মম্ভরিতা—সে দেখছে যে বহুনিন্দিত ধর্মের গহন অনুভব তাকে অনেক কিছুই দিতে পারে—যার প্রমাণ গোড়ায় আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি—এডিংটন, জীন্‌সের কথা তো জানেনই। ভালো কথা, আজই চোখে পড়ল

খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক Joad-এর একটি চিন্তোদ্দীপক প্রবন্ধ। তাতে তিনি একজায়গায় লিখছেন "Nature abhors a vacuum in the spiritual world no less than in the physical, and it is not to be expected that men should live indefinitely without religion...Perhaps the most striking movement of this kind is that which finds expression in the books of Gerald Heard and the later books of Aldous Huxley. At present the number of its adherents is small, but its intellectual content is impressive, and if I am right in thinking that it reflects the need of the times from which it takes its rise, it may spread with great rapidity."

Need of the times-এর সম্বন্ধে জোডের অনুমান যে ভিত্তিহীন নয় তার আর একটা প্রমাণ মেলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বিশ্বাসে নানা বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা ফিরে আসছে দেখে—যে কথা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাব যথাপর্যায়ে। কিন্তু এ-সম্পর্কে আজ নিজেরি ভারি অবাক্ লাগে ভাবতে যে একদিন অতীন্দ্রিয় সত্যের সত্যতা নিয়ে কী ছেলেমানুষি তর্কই করেছি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে—যে জন্যে তিনি আমাকে লিখেছিলেন (অনামী ২৫৩ পৃষ্ঠা) :

"I suppose I have had myself an even more completely European education than you, and I have had too my period of agnostic denial ; but from the moment I looked at these things I could never take the attitude of doubt and disbelief which was for so

long fashionable in Europe. Abnormal, otherwise supraphysical experiences and powers, occult or Yogic, have always seemed to me something perfectly natural and credible. Consciousness in its very nature could not be limited by the ordinary physical-human-animal consciousness"

("আমি হয়ত তোমার চেয়েও বেশি বিলিতি শিক্ষা পেয়ে থাকব—কিন্তু এসব অতীন্দ্রিয় অঘটনকে আমি কখনই সন্দেহের চোখে দেখতে পারি নি। অলৌকিক অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা ও শক্তি—যৌগিক বা গুহ্য—আমার কাছে বরাবরই খুবই স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। চেতনার প্রকৃতিই এমন যে গড়পড়তা প্রাকৃতিক-মানবিক-পাশবিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সে আটক থাকতে পারে না।")

জোড়ের কথার সমর্থন পেলাম সেদিন হঠাৎ ডাক্তার আলেক্সিস ক্যারেলের Man the Unknown বইটিতে। ইনি একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক জানেনই তো। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার দরুণ। ইনি বৈজ্ঞানিক মঞ্চ থেকেই অকুতোভয়ে রায় দিয়েছেন তাঁর বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে যে:

"Religious intuition is as real as aesthetic inspiration." কাজেই তিনি বলছেন: "We must accept their (the great mystics') Experiences..." অপিচ—"Certainty derived from science is very different from that derived from faith. The latter is more profound."

এধরণের কথা দুদিন আগেও কোনো য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরুতে পারত কি? তাই মনে হয় বিজ্ঞানের জগতেও বিপ্লব এল ব'লে।

একথা আরো মনে হচ্ছিল দুখানি বিখ্যাত বই পড়তে পড়তে: মেটারলিঙ্কের "L' Hote Inconnu" (অচিন অতিথি) ও Charles Richet-প্রণীত "Note Sixie`me Sens" (আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়) পড়তে পড়তে। মেটারলিঙ্কের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই। তিনি এই বইটিতে তাঁর নানান অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দেখাশোনা অনুভব লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অনুপম স্বচ্ছ ভাষায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তিতে এ বর্ণনা সর্বত্র উজ্জ্বল। রিশে আমাদের দেশে তেমন জানিত নন—কিন্তু য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক মহলে এঁর নামডাক যথেষ্ট। ইনি পারিসের চিকিৎসাতত্ত্বের অধ্যাপক, দেহবিজ্ঞানের (physiology) গবেষক, ফ্রান্সের Academie des Sciences তথা Academje de Medicine-এর মেম্বর—নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে anaphylaxis গবেষণায়। বইটির ভূমিকায় ইনি লিখছেন:

"...L' expose´ des faits que je relate entraine cette conclusion qu'il y a un SIXIE`ME SENS. Or parler d'un sens dont nous ne connaissons pas les organes··· c'est tre`s revolutionnaire...Il m'a paru—et il paraitra, je l'espe`re, a` tous lecteurs de cet ouvrage—que la realite´ d'un sixie`me sens (en donnant a` ce mot sixie`me sens son acceptation la plus vaste et la plus myste´rieuse) ne peut plus etre nie´e."

("যে-সব ঘটনার কথা আমি লিখছি তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেই হবে যে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরেও আছে আর একটা ইন্দ্রিয়—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—যার কোনো বাহন দেহ যন্ত্রই আমরা জানি না। জানি এ অতি দুঃসাহসিক কথা...কিন্তু এ বইটি যাঁরা পড়বেন তাঁরা সবাই আশা করি আমার ম'তই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যাকে বলছি—যার ক্ষেত্র অতি বিশাল ও রহস্যময়—তাকে আর অস্বীকার করা চলে না।")

There are more things in heaven and earth, Horatio —যার কোনো হদিশই পায় নি বিজ্ঞান, প্রকৃতি যে:

নিশীথে মোহিনী অরুণ-মালিনী মরণে পরায় জীবনটিকা!
স্বৈরচারিণী সে-বহুরূপিণী—প্রসাধনে জ্বালে কত না শিখা

এধরণের কথা শুনলে আগে আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু গত পনের বৎসরের মধ্যে এমন বহু অভিজ্ঞতাই হয়েছে যার ফলে বুঝতে পেরেছি যে এসব অভিজ্ঞতা বা শক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করাটা বিজ্ঞতা নয়—ঠিক তার উল্টো—মূঢ়তা। আমার নিজের উদাহরণ দেবার লোভ জোর ক'রেই দাবিয়ে রেখে বলি শুধু একটি কাহিনী—আমার এক বন্ধুর। সংক্ষেপেই বলতে হবে—পাদপূরণ ক'রে নেবেন। বন্ধুটি আমাদের আশ্রমে ছিলেন কয়েক বৎসর। বললেন তাঁর একটি শিশুসন্তানের একবার খুব অসুখ হয়। বড় ডাক্তারে বললেন, পেটের মধ্যে ফোড়া—না কাটালে বাঁচবে না। বন্ধুবর তখন কৃষ্ণনগরে। সন্তান কলকাতায়। তার গেল। তাঁর ছিল এক যোগী বন্ধু লালগোলা ঘাটে। তাঁর কাছে যেতেই যোগিবর ধ্যান ক'রে বললেন—না পেটে ফোড়া হয় নি—কাটিয়ো না। ওর ক্রিমি হয়েছে (মনে রাখবেন শিশু কলকাতায়—আর ধ্যানী যোগী কলকাতা থেকে বহু দূরে) অমুক

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দাও। বন্ধু তাই তার করলেন। ডাক্তার বললেন—নিশ্চয় ফোড়া—না কাটালে বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু মা দিলেন সেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। পরদিন অজস্র ক্রিমি বেরুলো—শিশু রোগমুক্ত।

'পুরোনো কথা'য় ঠিক এধরণের না হোক কয়েকটি উপভোগ্য অতীন্দ্রিয় অঘটনের বিবরণ আপনি দিয়েছেন। অবশ্য আপনি স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করেছেন যে এ-অঘটনও ঘটনীয়, কিন্তু মনে রাখবেন এখনো এসব বিশ্বাস করা ফ্যাশন নয়—যেমন সেই ভূতুড়ে বৈঠকে "কাঁধের পিছনে যে এসে দাঁড়াল" তাকে না ফিরেও আপনার পরিষ্কার দেখতে পাওয়া। অর্থাৎ পিঠে চোখ না থাকা সত্ত্বেও যে পশ্চাতের জিনিষ আপনি দেখতে পেলেন এটা সত্য হ'লেও প্রকাশ্যে বলা আপনার উচিত হয় নি। It is not done—বুঝলেন না? কেমন জানেন? আমার এক তীক্ষ্ণধী ইংরাজ বন্ধুর কাছে শুনেছি গিলবার্ট মারে কয়েক বৎসর আগে হঠাৎ আবিষ্কার করেন তাঁর টেলিপ্যাথির ক্ষমতা রয়েছে—অর্থাৎ অপরের মনের কথা টের পান তিনি। লজ্জায় তিনি নাকি বহুদিন মাথা তুলতে পারেন নি, এ শক্তিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন অনেক দিন, যেমন মানুষ লুকিয়ে রাখে কুৎসিত ক্ষতকে। কিন্তু বলে না Murder will out কাজেই এ-লোমহর্ষক লজ্জাও চাপা থাকল না—প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। পাঁচটা ইন্দ্রিয় যে-যে এজাহার দেয় তার বাইরে কিছু বিশ্বাস করা এখনো কুসংস্কারের চূড়ান্ত—লজ্জা পান কি আর সাধে? সাক্ষাৎ ফ্যাশন যে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি ফরাসি দেশে মদ না খেয়ে জল খেলে লোকে অবাক হ'য়ে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে: ভাবটা—কোথাকার বর্বর রে! মদ ছেড়ে জল খায়! কবি

ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ কি সাধে বলেছিলেন : The prison unto which we doom ourselves no prison is !

চলতি ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বুদ্ধির বেলাও যে একথা খাটতে পারে এটা অবশ্য হাল আমলে স্বীকৃত হওয়া শুরু হয়েছে—কিন্তু তবু এখনো অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধির অভিজ্ঞতা যে কুলীন বৈজ্ঞানিক মহলে অস্পৃশ্য এবিষয়ে সন্দেহ করার পথ নেই।

সম্প্রতি অলডাসের লেখা পড়তে পড়তে এ ধরণের কথা যেন আরো বেশি মনে হচ্ছিল—তাই হঠাৎ খেয়াল চাপল আপনাকে তাগ ক'রে এ সম্বন্ধে একটা পত্রবাণ ছাড়লে মন্দ কি !—বিশেষত যখন আপনি এমন রসিক, যাকে মনের কথা ব'লেও সুখ—শুধিয়েও সুখ। অলডাস সম্বন্ধে আপনাকে দুটো মনের কথা বলবার ইচ্ছা জাগল আরও এই জন্যে যে সেদিন আমাদের আশ্রমে এসে আপনি ওর 'After Many a Summer' উপন্যাসটি সম্বন্ধে আপনার স্বভাবসিদ্ধ দরদী হাসি হেসে বলেছিলেন : "ওহে ! লোকটা সায়েব হ'য়েও বুদ্ধিমানের মতো কথা কয়েছে দেখলাম—আশ্চর্য !"

কিন্তু কয়েছে কেন তা আপনার পুরোপুরি জানবার কথা নয়। কারণ এসব খবর এমনই যে তাদের কাছে পৌছয় না যারা একটু চেষ্টা ক'রে খবর না নেয়। তাই একটু শুনলেনই বা। ও লোকটির সম্বন্ধে আমি গত সাত আট বৎসর ধ'রে খোঁজ খবর নিয়েছি। তাই জানতে পেরেছি যে উনি প্রকৃতিতে শুধু যে "সায়েব" নন তাই নয়—একজন অসামান্য অসাহেব। তাই উনি বুদ্ধিমান্ হয়েও প্রত্যয়ী হ'তে চান, সাহিত্যিক হ'য়েও বৈজ্ঞানিক-কৌতূহলী, কবি হ'য়েও সংশয়ী এবং ইংরাজ হয়েও বহুভাষাবিৎ। ওঁর পিতামহ বিখ্যাত হেনরি হক্সলি—ওঁর ভাই জুলিয়ানও একজন খ্যাতনামা বায়লজিস্ট—কাজেই বিজ্ঞান-

ওঁর রক্তে। উনি এখন আছেন কালিফর্নিয়ায়। সেখান থেকে আমাকে লিখেছেন একটি পত্রে নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। কিছু তর্জমা ক'রে দেওয়া মন্দ কি। তাতে অন্তত এটুকুও তো বোঝা যাবে কী ভাবে ওঁর বদল হ'ল। অলডাস লিখছেন এই পত্রে (২২শে অগস্ট ১৯৩৯—তারিখ):

"Now let me reply to your questions. I have been interested in mysticism ever since I was an undergraduate. For some time this interest was predominantly negative: that is to say, I read a good deal of Western and Eastern writing, always with intense interest, but always with a wish to 'debunk' them. Later, the interest became positive. I have also found a great deal in Buddhist literature. When and if the world is ever at peace again, I should like to return to India and see it with other eyes than those with which I saw it when I was there last fifteen years ago.

Sri Aurobindo's remarks on Lawrence interested me very much. That mysticism of life, of which, like Whitman, like Blake, and so many others, Lawrence was an exponent, and an exponent of genius, seems to me now the most subtle and beautiful of all forms of idolatry. It is easy enough to see the idolatrous nature of such monstrous aberrations as

nation-worship, leader-worship, socialism-worship. Not so with life-worship. It seems good, beautiful, divinely inspired; and yet it is just as much an idolatry as the others, and perhaps, in the long run, nearly as pernicious—though it may be that the passage from the worship of life to that of spirit may be easier than the passage from, say, nation-worship to spirit. I don't know."

আমার এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছে আরও খবর পেলাম যে উনি হিটলারি যুদ্ধের আগে নাকি ফ্রান্সে একটি ভিলায় ব'সে প্রায়ই ধ্যানধারণা করতেন। আমাকে উনি লিখেছিলেন, গুরুকরণ যাকে বলে তা ওঁর হয়নি—কিন্তু যৌগিক নানা ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যে ওঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে সে-পরিচয় ওঁর নানা বইয়েই মেলে। ফলে ওঁর হয়েছে আশ্চর্য নবজন্ম যার ফলে ওঁর যৌগিক 'ঔৎসুক্য' হয়ে উঠল 'সদর্থক'। ডুরাণ্ট তাঁর Revolt against Materialism প্রবন্ধে লিখেছেন, সেদিনই পড়ছিলাম যে:—

"There was matter enough for rebellion here; and if Bergson rose so rapidly to fame it was because he had the courage to doubt where all the doubters piously believed."

("বস্তুতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যথেষ্ট হেতু ছিল বৈ-কি; বের্গসঁর হু-হু ক'রে নাম-ডাক হ'ল এই কারণে যে সন্দিগ্ধমনারা যেখানে বিশ্বাস করেছিল তাঁর ছিল তাকেই অবিশ্বাস করবার স্পর্ধা")।

এ কথাগুলি তথা গোড়ায় খ্যাতনামা ফসেটের কথাগুলিকে অলডাসের "মনের কথা" ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, এ-অলডাসের "মনের কথা" দুদিন আগেও ছিল তাঁর ইদানীন্তন ভাবধারার ঠিক উল্টো। মানে, তিনি একেবারে বদ্‌লে গেছেন—শেক্ষপীয়রের "বটমের" মতন "ট্র্যান্সলেটেড" যাকে বলে। ফলে কালাপানির ওপারে ধলাদের মধ্যে কি ধরণের নড়চড় হয়েছে তারও কিছু কিছু খবর হয়ত রাখেন: যথা, যে-সব চার্বাকপন্থী আগেকার বোহেমিয়ান অলডাসের কালাপাহাড়িয়ানায় আহ্লাদে আটখানা হ'তেন (আত্মপ্রসাদে) তাঁরা রুখে উঠে তাঁকে গাল পাড়ছেন—ক'ষে। কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর আধ্যাত্মিক নবজন্মে অলডাস অন্তরে যে নবারুণমণির সন্ধান পেয়েছেন তার উল্টোপিঠে এ-শ্রেণীর আঁধার-অনুচরদের শ্রদ্ধা হারানোটাকে তিনি ক্ষতি মনে করছেন না একথা বলাই বেশি। শ্রীঅরবিন্দের একটি কথা মনে পড়ে (তীর্থংকর দ্রষ্টব্য): "মানুষ তোমার কাছে যত কম আশা রাখে ততই ভালো—যেহেতু তাহলেই বেশি খাঁটি কাজ করা যায়।" অলডাস তাঁর নবজন্মের ফলে আজকাল যা লিখছেন তা-ই হ'ল কাজের মতন কাজ—আগের কাজই ছিল তাঁর অপকর্ম না হোক, অকাজ, সুতরাং ভুল। ভুল করে অনেকেই—কিন্তু সেই ভুল থেকে সজাগ ভাবে শেখে খুব কম লোকই। বেশির ভাগ ভ্রান্তিবিলাসী ভুলটাকেই থাকে আঁকড়ে—আত্মাদর, অভিমান, চক্ষুলজ্জা, ভ্রান্তিগর্বিত বন্ধু-বান্ধবদের সায় এই সবের বিষম দায়ে। অলডাস যে তাঁর জড়ধার্মিকতাকে ত্যাগ ক'রে রুখে উঠে ভুলকে ভুল ব'লে বিদায় দিয়ে সত্য মন্ত্রদীক্ষায় অধ্যাত্মপথের পথিক হয়েছেন এ থেকে বোঝা যায় আরো একটা কথা: তিনি প্রকৃতিতে গতিশীল—তামসিক নন।

অবশ্য এই-ই তাঁর কাছে আমরা আশা করেছিলাম—যেহেতু তিনি ছিলেন বহির্ধর্মী, ভাবুক-চূড়ামণি ডি, এইচ লরেন্সের অন্তরঙ্গ—যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ প্রকারান্তরে গুপ্তযোগী বলেছিলেন। *

কিন্তু এই একটিমাত্র গুণমূল্যেই অলডাসের বিচার করলে তাঁর প্রতি সুবিচার হবে না। তাঁর মধ্যে আমরা পাই অনেকগুলি আশ্চর্য দীপ্তির সমবায়। এ দীপ্তি "আগেকার" অলডাসের মধ্যেও ফুটে উঠত নানা ভাবেই—এমন কি, যখন তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, যখন জীবনের বড় স্বপ্ন বড় আশাকে নিশানা ক'রে তাঁর লঘু হাসির শরক্ষেপ করতেন তখনও মনে হ'ত "এ রাম মনুষ্য নয়", মনে পড়ত Taine-এর কথা Voltaire-এর সম্বন্ধে :

* Dilip, One might imagine Lawrence was a Yogi who had missed his way and come into a European body to work out his difficulties···The passage you have quoted certainly shows that he had an idea of the new spiritual birth···He had the psychic push inside towards the Unseen and Beyond at the same time as a push towards the vital life which came in its way. He was trying to find his way between the two and mixing them up together till at the end he got his mental liberation from the tangle though not yet any clear knowledge of the Way. For that, I suppose, he will have to be born nearer the East or in any case in surroundings which will enable him to get at the Light. (সূর্যমুখী ৪৩০ ও ৪৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

যার দৃপ্ত রোষরাগে বুদ্ধির প্রদীপ্তি লাগে
অমনি সে ফেটে পড়ে যেন,
আগুনের হাসিতানে আলোকের কলগানে
কভু জলে বায়ুশিখা হেন !
কখনো সে ঝলকায় বৈদেহী কোমলতায়
প্রতি অণু স্পন্দন-চঞ্চল...
সুকুমার নীড়হারা চলে সে অধীরধারা,
শুধু, নহে স্খলিত, বিহ্বল। *

("Sheer intelligence transmuting anger into fun, fire into light...a creature of air and flame, the most excitable that ever lived composed of more ethereal and more throbbing atoms than those of other men; there is none whose mental machinery is more delicate, none whose equilibrium is at the same time more shifting and more exact"—The Ancient Regime ......Taine)

এ-সংজ্ঞা খুব সুপ্রযুক্ত বৈ কি আগেকার অলডাসের সম্বন্ধে—যাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল ছিল লিপিভঙ্গি ও পাণ্ডিত্য, যাঁর পথের পাথেয় ছিল অবিশ্বাস ও ক্ষণদীপ্তি—যাঁর জীবনের মালামন্ত্র ছিল বৈজ্ঞানিক জড়বাদ এবং জীবনের অতীন্দ্রিয় সব ইঙ্গিতকে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া—জগৎকে "তাৎপর্যহীন, লক্ষ্যহীন, জড়ধর্মী" ব'লে; সুখের বিষয়, সে-ক্ষণায়ু প্রজাপতিধর্মী অলডাসের চিহ্নও নেই আজ,

* "আলেখ্য" কবিতাগুচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের "মণ্ডপ" কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

তাই আমি এ-খোলাচিঠিতে লিখব গভীরদর্শী অলডাস, আধ্যাত্মিক অলডাস সম্বন্ধেই—যার নবজাত দীপ্তির কাছে আগেকার অগভীর অলডাসের ফুলঝুরিয়ানাকে মনে হয় সফরী ফর্ফরায়তে।† অলডাসের এ-নবজন্মের সূচনা হয় তাঁর Eyeless in Gaza উপন্যাসটিতে, পরিণতি—তাঁর অনুপম "Ends and Means" দর্শনে। এর পরের বই—After Many a Summer—নভেলবেশে আমাদের কাছে ধরেছে অলডাসের ধ্যানদীক্ষালব্ধ আরো অনেক মন্ত্রবাণী যেটা আপনিও দেখেছেন। যাঁরা উপন্যাসে শুধু আর্ট চান এ বইটি তাঁদের জন্যে নয়—কিন্তু যাঁরা গ্রন্থলোকে চান স্বপ্নের প্রেরণা, দিশার ইঙ্গিত, আনন্দের সম্পদ, পথের পাথেয়, আশার উদ্দীপন—তাঁদের কাছে এ-বইটি মহার্ঘ হবেই। এই যে অলডাস—নবজাত অলডাস—এঁর সম্বন্ধে আমার এক ইংরাজ সাহিত্যিক বন্ধু লিখছেন (৫. ২. ১৯৪০) লণ্ডন থেকে :

"...Sri Aurobindo is deeply interesting. Although in the English middle classes, conventions and the pressing calls of life (not least the call to 'give your children a good education') might seem to make our mentality quite alien to the teachings and wisdom of the East, and to the ideas of renunciation and

† "জগতের কোনো লক্ষ্য বা অর্থ নেই এই দর্শন আমার ও আমার সমসাময়িক অনেকের কাছে মুক্তিমন্ত্রী হয়েই এসেছিল। এ মুক্তির লক্ষ্য ছিল আরো সুনীতির শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি পাওয়া। সুনীতিকে আমরা সুনজরে দেখতাম না এই জন্যে যে সে ছিল আমাদের যৌন স্বাধীনতার পথ আগলে দাঁড়িয়ে।"

dedication, there is still a lamp burning in the shrine within many an English breast. And one proof of this is the wide reading of the later Aldous Huxley."

("মধ্যবিত্ত ইংরাজ সমাজের মনোভাব যদিও ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গের অনুকূল নয়, তবু অনেক ইংরাজেরই হৃদয়মন্দিরে যে আজো সে-আলো জ্বলছে তার প্রমাণ এই নবতন অলডাসের লেখায় এত লোকের সাড়া দিতে পারা।")

কিন্তু এই "সদ্যোজাত" অলডাসকে ঠিক মত চিনতে হ'লে পূর্ব-জাতকের সম্বন্ধে ভূমিকা একটু পাড়তেই হয়, যদিও ব'লে রাখি ফের, সে-অলডাসের মধ্যে "ইন্‌টারেস্টিং" উপাদানই ছিল বেশি, গভীর জীবনের গভীর অনুভবের খোরাক মিলত কম। কিন্তু তবু মিলত দীপ্তি, মিলত ভঙ্গি, মিলত ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত ঝিকিমিকি, আর মিলত সর্বদাই জীবনকে একটা নতুন চোখে দেখবার প্রোজ্জ্বল প্রয়াস। তাই বার্টরাণ্ড রাসেল বলছিলেন একবার: "What Aldous thinks to-day, England thinks to-morrow." বলবেন না? অলডাস যে সে-সময়ে ছিলেন বিজ্ঞানের অন্ধ পূজারী। আমাকে আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল আদর্শ মানুষের একটি নমুনা। আজ কোথায় সে-অলডাস? আজ তিনি বলেন, বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অতি মন্দ হ'তে পারে। সে কথা যথা স্থানে।

যাহোক্, সে-সময়ে অলডাসের লেখা পড়তাম আর রাসেলের প্রশস্তি মনে ক'রে দুঃখ হ'ত। কি রকম দুঃখ বলব? অনেকটা প্রতিভাবান মাতালকে দেখে সুস্থ মানুষের যে রকম দুঃখ হয়:

"দেখলাম একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঝাপসা হ'য়ে এলো ক্রমে,
দেখলাম একটা মহৎ হৃদয় ঢেকে আসে মতিভ্রমে।"

মনে হ'ত যার লেখার এমন ধার, যার চিন্তার মধ্যে এমন দীপ্তি *সে কেন তার প্রতিভাকে বাহাল রেখেছে একটা শূন্যবাদী জড়ধর্মের* ওকালতিতে—যে জড়বাদ শুধু ইন্দ্রিয়বোধেরই উমেদার—হৃদয়ের কোনো গভীর ক্ষুধাই পারে না মেটাতে (যেহেতু সব গভীর ক্ষুধাই মূলত অতীন্দ্রিয়), যে জড়বাদ চায় শুধু (অলডাসের ভাষায়):

"For myself, as, no doubt, for most of my contemporaries, the philosophy of meaninglessness (বিজ্ঞান ও জড়ধর্মের) was essentially an instrument of liberation. The liberation we desired was simultaneously liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom......†

এ থেকে বোঝা যায়—যেটা ওঁর লেখার মধ্যেও পাওয়া যেন—যে উনি আলো খুঁজতেন সত্যিই—কেবল আলোর দিশা কোন্ পথে সে খবর পান নি—বলেন শ্রীঅরবিন্দ। পরে পেয়েছিলেন কারণ চেয়েছিলেন। এই চাওয়ার ফলেই আসে আলোর সাড়া, আর তখনই মানুষের বদল হয়। বদল হ'লে সে দেখে, যাকে সে মনে করত তার দুর্ভেদ্য দুর্গ সে আসলে তাসের ঘর বৈ কিছুই নয়। কিন্তু যখন এই তাসের ঘরকেই মানুষ মোহবশে ভাবে লৌহপুরীর অচলায়তন তখন সে ঠিক জানে না চোখ-চেয়ে দেখা কাকে বলে। তাই তখন সে যে ডালে বসে তারি গোড়ায় কোপ দেয়—হাসাহাসি করে তাকেই নিয়ে যে ছাড়া এ জগতে স্থায়ী আশ্রয় নেই—মানে এমন আশ্রয় যাতে মন ভ'রে ওঠে গভীর গৌরব তৃপ্তিতে, নিটোল অনপনেয় শান্তিতে, দুকূলভাঙা সার্থকতায়·

প্লাবনে। এই শোচনীয় অন্ধতার ফেরে প'ড়েই অলডাস আরো হাসাহাসি করতেন:

"And what meaning for us have those airy assertions about God? God, we psychologists know, is a sensation in the pit of the stomach hypostatized".*

হাসিটি মজাদার বৈ কি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে হাসি হ'ল শাঁকের করাত—দুদিকেই কাটে—যেটা হাতে-কলমে ক'রে দেখালেন পরে এই অলডাসই তাঁর সদ্যোজাত উপন্যাসটিতে—তাতে হাসলেন আরো জোরে আরো রংদার হাসি তাঁর আগেকার হাসাহাসিকে নিয়েই। যথা:

"মিঃ প্রপ্‌টার বললেন: "মিস্টার পর্ডেজ! প্রতি আদর্শই হ'ল আমাদের ব্যক্তিরূপের (personality) একটি বহির্মূর্তি—অতিকায় সংস্করণ—কেবল সর্বোচ্চ আদর্শ বাদে—যার নাম মুক্তি—ব্যক্তিরূপের বেড়া থেকে—কালধর্ম থেকে—বাসনা থেকে। আর কোন্ সত্তায়? না, ভগবানে—যদি একথায় আপনার আপত্তি না থাকে অবশ্য। অনেকের আছে কি না—বুঝলেন না? বুদ্ধির শুচিবেয়েরা এ অস্পৃশ্য গড-এর নামে বড় বেশি ঘা খান। তাঁদের কোমল প্রাণে আমি ব্যথা দিতে চাই না সচরাচর—নিতান্ত দায়ে না পড়লে। যাই হোক, আদর্শবাদের কথায়ই ফিরে আসি। বলছিলাম কি, মানুষকে ভগবানের

---

* "আমাদের কাছে ভগবান ভগবান ব'লে ঐ দু'চারটে গাজোয়ারি কথার মানে কী শুনি। আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক—জানি না কি যে, আসলে ভগবান্ হচ্ছেন উদরে একটি বিশেষ অনুভূতি—যাকে আমরাই মানুষ করেছি।"

(The Jesting Pilate)

পূজারী বলা চলবে না যদি সে সর্বোচ্চ আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শকে বরণ করে—তা সে আদর্শ শিল্পীর সৌন্দর্যের আদর্শই হোক বা বৈজ্ঞানিকের সত্যের আদর্শই হোক। কারণ, বলতে কি, এসব স্থলে সে আসলে নিজেরই কোনো একটা আমিত্বকে ফাঁপিয়ে তুলে তাকেই করে বরণ। অবশ্য সে হয়ত মনে প্রাণে অনুরাগী এসব আদর্শের। কিন্তু এ পূজাবৃত্তি যতই তীব্র হোক না কেন, খতিয়ে দেখলে সে দাঁড়াচ্ছে ঐ আত্মপূজা—কি না, নিজের ব্যক্তিরূপেরই কোনো একটা ফাঁপিয়ে তোলা অংশের পূজা। কারণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে যাকে মনে হয় বুঝি এরই নাম নিরভিমানতা—তলিয়ে দেখলে দেখবে যে সে আসলে আত্মাভিমান থেকে মুক্তি নয়—সে হচ্ছে শুধু একটা বন্ধন ছেড়ে আর একটা বন্ধন-বরণ। একথার টীকা কী?—না, বিজ্ঞানকে যখন মনে হয় মুক্তিদাতা তখনো সে বৈজ্ঞানিকের কাছে গ্লানিকর হানিকর হ'তে পারে। আর একথা শিল্পকলা, পাণ্ডিত্য, বৈশ্বমানবিকতা সব কিছুর সম্বন্ধেই সমান খাটে।" *

কিন্তু মজাটা কি আপনি বেশ জানেন—কেন না আপনি প্রবীণ লোক, দুনিয়াটাকে যথেষ্ট দেখেছেন এবং সেটা বেশ চোখ চেয়েই। এজগতে মানুষ অপরকে যে অনধিকার-চর্চা করতে দেখলে রেগে আগুন হয়ে ওঠে, নিজে যখন সেটা করে তখন মনে করে এ সবজান্তামিতে তার অধিকার জন্মগত। তাই তো অলডাসের মতন গভীরদর্শী মানুষও যখন বিজ্ঞানকে কটাক্ষ করেন তখন বৈজ্ঞানিকরা হ'য়ে ওঠেন রাগে বিরূপাক্ষ—(বলেন : বিজ্ঞানের ও জানে কী শুনি?) —অথচ তাঁরা নিজেরা যখন ধর্মসাধনার অনুভব-উপলব্ধি, শক্তি-

* অলডাসের After Many a Summer ১১০, ১১১ পৃষ্ঠা।

বিভূতির সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এ-সবকে সেকেলি কুসংস্কার বা আত্মপ্রবঞ্চনা ব'লে ব্যঙ্গবাণ হানেন তখন মনে করেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক কুশলতার গুণে তাঁদের এ-কালাপাহাড়িও চতুর তীরন্দাজি ব'লে গণ্য হতে বাধ্য। অলডাস হাল আমলে এদের এইজাতীয় আত্মপ্রসাদের ফাঁপা বেলুন দিয়েছেন ফুটো ক'রে। আর সে কী অপরূপ স্টাইলে জানেনই তো।

স্টাইল বলতে মনে পড়ল এ সম্বন্ধে তাঁর একটি চমৎকার স্টাইলিশ ব্যঙ্গ—সেটি শ্লেষ সত্ত্বেও এত সত্য যে উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো অসম্ভব—আরো এইজন্যে যে এথেকে তাঁর আন্তরিকতার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। বলছেন তিনি (মিস্টার প্রপ্টারের জবানিতে, After Many a Summer-এ) :

'He writes nicely, don't you think? Probably that had a lot to do with his extraordinary success. How disastrous when a man knows how to say the wrong things in the right way! 'Incidentally', he added looking up with a smile into Jeremy's face, 'how few great stylists have ever said any of the right things. That's one of the troubles about education in the humanities. The best that has been thought and said. But best in which way? Alas, only in form. The content is generally deplorable.'

('খাসা লেখেন উনি, না? নৈলে কি ওঁর এমন ডাকসাইটে নাম! কী দারুণ লণ্ডভণ্ডই না ঘটে যখন আমরা বেঠিক কথা বলি ঠিক কায়দায়! বলতে মনে পড়ল—ওস্তাদ লিখিয়েদের মধ্যে কজনই

বা ঠিক কথাগুলি বলেছেন বলো তো? বিশ্বমানবের শিক্ষাবিধানের পথে এ এক কম ফ্যাসাদ নয়। খাসা খাসা জিনিস মানুষ বিস্তর ভেবেছে—বলেছে। বটেই তো। কিন্তু 'খাসা' কী ভাবে? হায় রে, কেবল সাজপোষাকে বৈ তো নয়—ভিতরের শাঁসটা প্রায়ই চাষা।'

একথাটা আরো স্মরণীয় অলডাসেরই সম্পর্কে—অর্থাৎ আগেকার অলডাসের, যিনি বাজে কথাকেই এইভাবে এমন চমৎকার ক'রে বলতেন যে তাঁর ঢঙের কায়দায় লোক চম্‌কে বলত—সাবাস্‌ জোয়ান! না বলে উপায় আছে? জানেনই তো এজগৎটা এম্‌নি যে বাইরের চটকেই বেশি লোকের মন ভোলে। বেশির ভাগই তো রূপবিচারী—গুণহিসেবি আর কজন বলুন? যাঁরা শিল্পী তাঁরা এ কথাটা খুব ভাল ক'রে জানেন ব'লেই অনেক সময় বাজে কথা বলেন এমন রঙচঙে রঙিয়ে যে লোকে সে-রূপসজ্জায় ভুলে মিথ্যাকে দেয় সেই সেলামি যে-সেলামি পেতে পারে কেবল সত্য অনুভব, সত্য দীপ্তি। আগেকার অলডাসের প্রতিপত্তি হয়েছিলও এইজন্যে। আর ঠিক সেইজন্যেই পরেকার অলডাস আমাদের কাছে এত আদরণীয়—তিনি সময় থাকতে বুঝলেন ব'লে যে, কথা গেঁথে-গেঁথে হাততালি বাহবার পুষ্পবৃষ্টির যে-তৃপ্তি—সে বিড়ম্বনা। এ তিনি পারলেন এই জন্যে যে, তাঁর অন্তরাত্মা উঠল জেগে—ছাপিয়ে উঠল তাঁর প্রাণমনের রঙ্গ-তৃষ্ণাকে।

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই যে অন্তরাত্মাকে জাগতে দেওয়া, এটা একেবারে দৈবাৎ ঘটে না। গভীরে সত্য-তৃষ্ণাকে যে সাদরে লালন করে সে-ই কাটিয়ে উঠতে পারে অগভীর লালসার মোহ। তাই অলডাসের যে মোহভঙ্গ হয়েছে এজন্যে তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হয় এই ব'লে যে তিনি চাননি মোহের মায়া-কাননে বাস

করতে—সোনার হরিণকে মিথ্যা ব'লে চিনবামাত্র বুঝেছিলেন যে, তার পিছনে ছুটোছুটি ক'রে আর যারই চলুক, তাঁর চলবে না। বুঝেছিলেন যে, আলোয় আমাদের জন্মস্বত্ব বটে—কিন্তু জন্মস্বত্বকেও জিতে নিতে হয়, ও প'ড়ে, পাওয়া জিনিষ তো নয়। তাই এ-বিজয়ের একটা সর্ত হচ্ছে আঁধার-তৃষ্ণাকে বিদায় দেওয়া। বড় ইতিকে পেতে হ'লে অনেকদিন ধ'রে নেতি-র তপস্যা চাই, এ হ'ল সত্য সাধনার একটা গোড়াকার কথা। কিন্তু এই নেতি-বাদ সব সময়ে সহজ হয় না। যে-মিথ্যার বাধা জড়িয়ে থাকে তাকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে চাই তো বটেই—কিন্তু কবির ভাষায় "ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।" বাজবে না, কারণ যে-মিথ্যাকে অনেকদিন ধ'রে লালন করি সে যে হ'য়ে ওঠে প্রায় আমাদের দেহাঙ্গের মতন, তখন মিথ্যাকে একটু আঘাত করলেও টনটনিয়ে ওঠে আত্মাদরের বত্রিশ নাড়ী।

একথা আরো খাটে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে। তাঁরা প্রায়ই আঁকড়ে ধ'রে থাকেন এক একটা ইসম্‌কে। যে-ইসম্ বেশি পপুলার তার লোভও বেশি কারণ জয়ধ্বনির স্রোতে গা-ভাসান দিলে নগদ-বিদায় হাতে হাতে। এই জন্যেই ক্ষণিকের লোভে পথিক চিরন্তনকে বিদায় দেয় ধুলো পায়ে—সে-চিরন্তন "কাছে এসে বসলেও তবু জাগে না।" নইলে কি আর মিথ্যাশ্রয়ী স্টাইলের এত জয়ধ্বনি? নীটশে ভুল বলেননি যে, কবির উপাস্য প্রায়ই হয় মিথ্যাদেবী কেননা সে-উপাসনার ফলে কবি লোককে অনেক আত্মাদরেরই খোরাক দিয়ে থাকেন চাটুবাণীতে—তাই তারাও দেয় কবিকে জয়ধ্বনির রাজকর।

কিন্তু মুস্কিল এই যে কালোকে সাদা প্রতিপন্ন করার এ-মিথ্যাচারে (গীতার ভাষায়) "সুরুতে অমৃতোপম সুখ" মিললেও খতিয়ে শুধু "বিষোপম দুঃখই" সার হয়। মেফিস্টফেলিসের কাছে ফাউস্টের

আত্মা বন্ধকি রাখাটা মানবজীবনের এ-ব্যাপক ট্র্যাজিডির একটি চমৎকার রূপক।

একথা বলছি কেন আন্দাজ করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই? বলছি এইজন্যে যে, জড়বাদী দার্শনিকী-বৈজ্ঞানিকী বুলি শুনতে গুরুগম্ভীর হ'লেও এ যে আসলে অতি ছেপ্‌লা জিনিষ, হাল্কামি,—একথা মানুষ অনেক সময়েই বুঝতে পারে না শুধু ওর জমকালো সাজ-পোষাকের দরুণ। নইলে বুদ্ধিমান্ মানুষও বৈজ্ঞানিক হ'তে না হ'তে অনেক সময়েই এ ছেলেমানুষি করত না, বলত না যে আমাদের স্মৃতিসীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়-বোধ ছাড়া আর যেসব বোধ নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত তারা না শ্রদ্ধেয় না বিশ্বাসযোগ্য; অথবা এমন নিরাশার বাণী মন্ত্রচ্ছন্দে প্রচার করত না যে ইন্দ্রিয়-বোধের পথে ছাড়া সত্যদেবতার পদার্পণের আর জো'টি নেই। শুধু কি তাই? দেখছেন তো একদল অল্পবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক কী অন্ধই না হ'য়ে উঠেছেন আজকাল!—নইলে বলেন এমন হসনীয় কথা যে ইন্দ্রিয়লভ্য অনুভব ছাড়া অন্য সব অনুভব হ'ল মিথ্যা ভণ্ডামি জুয়াচুরি আত্মপ্রবঞ্চনা—কী নয়?

এ হেন সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার পরিণাম যে কী দারুণ শোকাবহ তা অলডাস দেখিয়েছেন বড় চমৎকার ক'রে তাঁর Ends and Means-এ। তিনি বলছেন যে এই যে জগৎ, এর গঠন বিচিত্র। সেখানে শুধু বস্তুই নেই, গুণও আছে; রূপই নেই, রসও আছে; গতিই নেই, লক্ষ্যও আছে; স্পন্দনই নেই, সার্থকতাও আছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনো অবধি ঠাউরে উঠতে পারে নি—value-র জগৎ অর্থাৎ গুণ রস লক্ষ্য সার্থকতা জাতীয় দুর্ঘটনাদেরকে নিয়ে সে কী করবে। ফলে সে শুধু রূপ ওজন আয়তন গতি এই সব নিয়েই মত্ত রইল আর বলল এর বাইরে সত্য ব'লে কিছুই নেই, যার একটা বিষময় ফল

ফলছে—ফলতে বাধ্য—যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় ও রাজনৈতিক হানা-হানিতে। ফলবে না? যদি এজগতের কোনো লক্ষ্যই না থাকে তবে কেবল সেইটুকু নীতি মেনে চললেই হ'ল যেটুকু না মানলে নয়: অর্থাৎ চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে কেবল দেখো যেন ধরা পোড়ো না। এক কথায়, বুদ্ধিমানের পক্ষে সেরা পথ হ'ল আত্মসুখবাদের পথ, কেননা জগৎই যদি নির্লক্ষ্য হয় তা'হ'লে এ জগতের এক তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কীটাণুকীট মানুষের লক্ষ্য স্বপ্ন আশা সাধনা—এসব ছায়াবাজি ছাড়া কী?

এই জন্যেই—বলছেন অলডাস—জগৎটাকে এভাবে খণ্ডিত ক'রে দেখলে চলবে না। গায়ের জোরে বললে শুনব না যে, লক্ষ্য প্রেম দরদ এসব নিয়ে বিজ্ঞানের মাথাব্যথা নেই।* জগৎটাকে যদি সত্যি বুঝতে হয় তবে শুধু বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে যার কারবার (আয়তন গতি ওজন ইত্যাদি) শুধু তাকেই মঞ্জুর ক'রে বাকি সবকিছুকে বরখাস্ত ক'রে জগতের একটা মনগড়া (arbitrary) ছক খাড়া

---

* বিখ্যাত গাণিতিক দার্শনিক হোয়াইটহেডও এ-বৈজ্ঞানিক-প্রবণতাকে বিদ্রূপ করতে বাধ্য হয়েছেন এই ব'লে যে:

"Many a scientist has patiently designed experiments for the *purpose* of substantiating his belief that animal operations are motivated by no purposes. He has perhaps spent his spare time in writing articles to prove that human beings are as other animals, so that 'purpose' is a category irrelevant for the explanation of their bodily activities, his own activities included. Scientists animated by the purpose of proving that they are purposeless constitute an interesting subject for study".

করলে চলবে না। সে ছককে টেঁকসই সত্য ব'লে মানা অযৌক্তিক কেননা সেটা হ'ল শুধু কয়েকটি একদেশদর্শী মনোবৃত্তির ফল। এ জগৎটা তো শুধু বস্তুরই সমষ্টি নয়, এখানে গুণাগুণেরও (value-র) একটা বৃহৎ রাজ্য থাকতে বাধ্য :—"Love and understanding are valuable even on the biological level." (বাঁচতে হ'লেও ভালোবাসা চাই, ব্যথার ব্যথী হওয়া চাই) (৩০১ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু হয়েছে কি, বিজ্ঞান যখন খুশখেয়ালে ধ'রে নিল যে ভালো-বাসা গুণ লক্ষ্য সার্থকতা জাতীয় জিনিষ (পরিমাপ্য নয় ব'লে) সত্য-সন্ধানীর কাছে অবান্তর, তখন এ সবকে তার ছকে জায়গা দেয়ই বা সে কোথায় ? বলে না, You cannot both eat your cake and have it, কাজেই—কর্মফল—বিজ্ঞানের সঙ্কট সঙিন হ'য়ে উঠতে উঠতে শেষটা ঐ বৈজ্ঞানিকের আমি-কে নিয়েই টানাটানি। এ আমি কে ? না, চেতনা। এ চেতনা কে ? না, মগজে যে কিলবিলিয়ে ওঠে। কিলবিলিয়ে ?—মানে ? না, মগজের অণু-পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটনদের ছুটোছুটি, গলাগলি, হানাহানি··· ইত্যাদি। কাজেই চেতনাও জড়েরই সামিল ছাড়া আর কি—যখন জড়বস্তুর কিলবিলানি থেকেই তার জন্ম ? অথ কিং কর্তব্যম্! বিমূঢ়ম্ ?—তা কেন ? বক্তব্যম্—যে, চেতনা আদবেই নেই। অর্থাৎ যে-চেতনা জগৎকে দেখছে সে-জগৎ থাকলেও (যেহেতু এ জগৎকে মেপে পাওয়া যায়) যে-মাপছে সে নেই যেহেতু তাকে মেপে পাওয়া ভার। অর্থাৎ চেতনাই ভেবে-চিন্তে বলছে—এ কী ! সব আছে, কেবল নেই আমি ! কথাটা শুনতে বেয়াদবির মতনই বটে, কিন্তু মজা এই যে বেয়াদবিটা করছেন স্বয়ং বৈজ্ঞানিক সে-ই একথা মেনে নিলেন হাজার হাজার বুদ্ধিমন্ত ! শ' বলেছেন কি সাধে যে :

"I must not be taken as implying that all or any of our amazing credulities are delusions. I am only defending my own age against the charge of being less imaginative than the Middle Ages. I affrm that the nineteenth century, and still more the twentieth, can knock the fifteenth into a cocked hat in point of susceptibility to marvels and miracles and saints and prophets and magicians and monsters and fairy tales of all kinds...The mediaeval doctors of divinity who did not pretend to settle how many angels could dance on the point of a needle cut a very poor figure as far as romantic credulity is concerned beside the modern physicists who have settled to the billionth of a millimetre every movement and position in the dance of the electrons. Not for worlds would I question the precise accuracy of these calculations or the existence of electrons (whatever they may be)··· But why the men who believe in electrons should regard themselves as less credulous than the men who believed in angels is not apparent to me.—(Saint Joan)

অর্থাৎ—

হাসিলা হুলাল :"পিতা পিতামহ !—কী কানপাতলা ছিলে যে আগে।
পরী-দেবদূতে হ'তে বিমুগ্ধ ! শুনে শিশুরাও বাঁচে না হেসে।"

হাসিলা বৃদ্ধ : "বলে বিজ্ঞানী—অণু কুটি মোরা লক্ষ ভাগে
গণি সে অদেখা নূপুরের বোল না শুনেও ! ওরে সর্বনেশে !
সাপের চেয়ে যে ভ্যাঁপের চক্র বেশি কুলোপানা—পুরাণে রটে—
বিজ্ঞান আজ যা বলে না বুঝে—মেনে—কোঁশ ক'রে বুঝালি বটে।"

আপনি রসিক লোক, জানেন কোন্ হাসির পিছনে থাকে খুশির লহরী-নৃত্য, আর কোন্ laughter veiled in tears. অনেক বৈজ্ঞানিকের অতীন্দ্রিয়-বিদ্রূপ এই শেষোক্ত শ্রেণীর—শোচনীয়, সাংঘাতিক। কৃত্তিবাস এরই নাম দিয়েছেন "শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা ?" নৈলে কি সত্যি এমন মতিভ্রম হ'তে পারত যে সবই আছে নেই শুধু চেতনা ? শুধু তাই নয়, এইটে প্রমাণ করতে তাঁরা আদাজল খেয়ে লাগলেন যে, নাস্তিক্যই হ'ল জ্ঞানের শিখরদৃষ্টি !—একবাক্যে বললেন বড় গলা ক'রে যে "the scientific picture of an arbitrary abstraction from reality is a picture of reality as a whole and that therefore the world is without meaning or value !"*

কিন্তু এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে : বুঝলাম না হয় তাঁরা বললেন একথা—কিন্তু বহুলোকেই মেনে নিল কেন ? হেতু ছিল। একটা শুভফলপ্রসূ—যে, বিজ্ঞানের নাস্তিক্য অনেক কুসংস্কার দূর করল—সময়ে সময়ে যখন মিথ্যার আগাছা বড় বেশি ভিড় করে তখন ভালো মালীতে সব দেয় পুড়িয়ে। বিজ্ঞান তাই সব দিল তুড়িতে উড়িয়ে—বলল একমাত্র বস্তুই সত্য—চেতনা অসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ—যে-কথা

---

* **Ends and Means······Belief** অধ্যায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর Life Divine-এর Materialist Denial অধ্যায়ে। †

কিন্তু আর একটা দিক আছে যা শুভ নয়। সেটা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞানের ইজ্জৎ এমন হু-হু ক'রে বেড়ে গেল সে জীবনের সুখ-সুবিধা আশাতীত রকম বাড়িয়ে দিল ব'লে। ইঁদুর ধরা পড়লে বিড়ালটা কাঠের হ'লেও জীবন্ত বিড়ালের সম্মান পায় এই আর কি : অর্থাৎ যেহেতু "By using this technique of simplification and abstraction the scientist has succeeded to an astonishing degree in understanding and dominating his physical environment—" সেহেতু বৈজ্ঞানিকের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি বানের জলের মতন দেখতে দেখতে হু-হু ক'রে ফুলে উঠল। উঠবে না? আমাদের চারদিকের জলস্থল ভূগর্ভ উদ্ভিদ সবাই যে একবাক্যে বলল : "মেনেছি হার মেনেছি।" বেঁচে থাকাটা নিশ্চয়ই আমরা সদাই চাই। বাঁচতে হ'লে নিশ্চেতনের (তথা শ্বাপদ মাইক্রোবের) সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের হার-মানানো পোষ-মানানোও চাই। এ অতি-জরুরি কাজটির ভার নিল বিজ্ঞান। কাজেই জীবন-সংগ্রামে এতবড় সেবককে শুধু বন্ধু কেন—গুরুই তো বলব। উৎসাহ চললে নিউটনের ইনার্শিয়ার আইন মেনেই চলে, থামতে চায় না—তার পরের ধাপই হ'ল দেবত্ব—বৈজ্ঞানিকই নিলেন ভগবানের পদবি

---

† It became necessary for a time to make a clean sweep at once of the truth and its disguise in order that the road might be clear for a new departure and a surer advance. The rationalistic tendency of materialism has done mankind this great service. (P. 15.)

দিশারির উপাধি। মানুষ খুশি হ'য়ে, কৃতজ্ঞ হ'য়ে (ভয় পেয়েও বটে) বলল :

"যা দেবী সর্বভূতেষু যন্ত্ররূপেণ সংস্থিতা—
অন্নরূপা শস্ত্রদাত্রী—নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

বৈজ্ঞানিক শুনে হ'লেন আত্মপ্রসন্ন। বললেন : "জীতা রহো বৎস ! এই-ই তো চাই, কারণ এক আমিই জানি সত্য কী বস্তু। বাকি সব ?—হয় ভণ্ড নয় অজ্ঞান। হবেই তো। কারণ সত্যকে জানার শুধু এই একটিমাত্র বৈ তো প্রণালী নেই—আর সে-প্রণালী কেবল আমাদের—বৈজ্ঞানিকদের দখলে। তাই শোনো হে অবোধ নর ! এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে পাওয়া গেল যে, জড় আছে কিন্তু চেতনা নেই—একথা না মেনে উপায় নেই, কারণ এ হ'ল যুক্তি-জনাবের রায়—অপৌরুষেয়, অপ্রতিবাচ্য। তিনি দেখিয়ে দিলেন : "শোনো মন বাবাজি, মন দিয়ে—যে তুমি, মানে চেতনা, নেই। কারণ চেতনা জন্মাল মস্তিষ্ক থেকে আর মস্তিষ্কের মধ্যেও খেলছে ঐ ইলেকট্রন-প্রোটনরা। কাজেই হে চেতনাচন্দ্র ! জেনো যে তোমার টিকি থাকতে পারে, নস্য থাকতে পারে, এমন কি নামাবলি জপমালাও থাকতে পারে কেবল তুমি আদৌ নেই।" অর্থাৎ—বিজ্ঞান মানলে—দাঁড়াল, নাম আছে, নেই নামী ; দেহ আছে, নেই দেহী ; সুখ আছে নেই সুখী ; যন্ত্র আছে, নেই যন্ত্রী।

এতে মন বেচারি একটু ভড়কে গেল। তাতে বৈজ্ঞানিক রুখে উঠলেন। বললেন : "কী ! মানবে না ? মেপে-জুপে দেখিয়ে দিচ্ছি এত ক'রে, তবু বলবে যে আমাদের বৈজ্ঞানিক গজকাঠির বাইরে টেস্টট্যুবের বাইরেও সত্য আছে ? ধিক্।"

মন বেচারি তো থ। তখন প্রাণ বলল ভয়ে ভয়ে :
মাপজোপ সব মেনেও হুজুর, মন মানে না যেন!
প্রশ্ন ওঠেই : ম্যাটার্ আছে—চেতনা নেই কেন?
দেখি শুনি হাসি কাঁদি—চাই যে ভালোবাসা,
সবই যদি শূন্য—তবে কোথায় বাঁধি বাসা?

বৈজ্ঞানিক (উদ্দীপ্ত) ঃ

ধিক্ শত ধিক্, বললি ব'লে চেতনা তোর 'আছে'!
শোন্, ধড়ে তোর নেই সে—যেমন নেই ভূত ঐ গাছে।
সেকেলি চাল ছাড়্ রে বাচাল! নৈলে দেব সাজা
যুক্তিকে গড় না করলে—আজ তিনিই রাজার রাজা।
আর্জি সবই তাঁরই পায়ে—যে-মর্জি তাঁর হবে
তা-ই তো হুকুম, যা তিনি চান তা-ই মান্‌বে সবে।
বলেন তিনি : "বিশ শতকে পাইনে মেপে যাকে
থাকলেও সে নামঞ্জুর—ব্যানিশ করো তাকে।"
বলেন তিনি : "হাসিস কাঁদিস—'গ্ল্যাণ্ড'ই হেতু তার
সে-ফোয়ারা থামলে হাসবে কাঁদবে না কেউ আর।
ভালোবাসিস—সেও শুধু দুটো বীজের টানে।"
এ-সব ফাঁকির ফিচেলি কি অবিজ্ঞানী জানে?
তাই বলছি—বিজ্ঞানকেই করিস যদি স্তব
জানবি তুইও যে—চেতনা মিথ্যে কলরব।
এ-যুগে test tube-এ যা দিচ্ছে ধরা—কেবল
সে-ই সত্যি—বাকি যা সব, জানিস—মিথ্যে অচল।

প্রাণ কাবু। তখন হৃদয় এসে কেঁদে পড়ল :

যুক্তিজনাব, কী যে চমক আনলে তুমি ভবে!
এমন রোমাঞ্চকর কথা কে শুনেছে কবে?
কেবল ধীরাজ, অভয় দিলে বলি দুটো কথা :
(রাজা ছাড়া কে শুনবে প্রজার হৃদয়ব্যথা ?)
হয়েছে কি—ইয়ে—যেমন যুক্তিকে চাও তুমি
চায় চেতনার ফুলের ফসল আমার স্বপ্নভূমি।
নৈলে সে যে ধূ-ধূ করে—চায় সে সার্থকতা :
'টিউব'-জীবন চায় না সে তো—চায় সে মানবতা।
চায়—দেবতা, চায়—সুন্দর, চায় সে —গন্ধধূপ,
চায়—গান, রঙ, কাব্যকুহু, আলোছায়ার রূপ।
'গ্ল্যাণ্ড্' শুধু সার আর সব অসার—'গ্ল্যাণ্ড্' বদ্‌লে গেলে
আবেগ যাবে বদ্‌লে—এমন যুক্তি হয়ত মেলে—
কিন্তু সেটা মান্‌বার ভার রইল চেতনারি
কারণ সেই-ই রেজিস্টারির করে খবরদারি।
তা' ছাড়া এ-বিপুল বিশ্বে ম্যাটার্-কারার মাঝে
লক্ষ্যহারা ঘোরার কি হায় সাধ্যি সবার আছে ?
যুক্তির নলকূপে ওঠে কতটুক্ বা জল ?
মন-প্রবাহে কতটুকু নামে সুধার ঢল ?
নেই আমি হায়, বিজ্‌লি শুধু করে ছুটোছুটি,
এমন রাজ্যে থাকতেও যে হায় পেরে না উঠি।
তা' ছাড়া, কি জানেন হুজুর, সবাই কি সব পারে ?
যুক্তি-জাঁকে আপনি জেতেন—ভক্তি যে হায় হারে!

বৈজ্ঞানিক

(বৈদ্যুতিকী দাড়ি চুম্‌রে)

ফের ঐ সব—সেকেলে চাল ? বুঝবি তোরা এটা কবে—
সত্য-বরণ করতে হ'লে যুক্তিনলেই ঢুকতে হবে ?
এ কী কথা ? চাস্ না তোরা অমন নলে রইতে কায়েম।
বাঁচতে হ'লে লক্ষ্য আশা—এসব কী ? আর চেতনা ? প্রেম ?
ধিক্ তোদের !—এ বিশশতকে আনলি মুখে এমন কথা !
শোন্ রে জ্ঞানগর্ভ বাণী—নাম দিনু যার বাস্তবতা।
দেখিস যা-সব—নয় তো সে-ধাঁচ দিনদুনিয়ার স্বরূপধারা,
বাইরে যা থির—অন্দরে তার অযুত অণু কেঁপেই-সারা।
কেন ?—সেটা কেউ জানে না—জানতে চাওয়াও নয় ঠিক তাই,
'কেন' প্রশ্ন বাতিল এখন, 'কেমন ক'রে'—পুছিস সদাই।
ভক্তি ?—কাকে করবি শুনি ? কে ভগবান ? তার নিশানা
কেউ কি জানে ?—দূর্ দূর্—যার নেইকো প্রমাণ ঠিক-ঠিকানা।
ভয় থেকে যার সৃষ্টি হল—ভয় গেলে সে যাবেই যাবে ;
ভক্তি ? সে-ও মগজ-কাঁপন। ফের প্রশ্ন—'কেন কাঁপে' ?
চোপরাও, শোন্ চপল অণুর বিদ্যুতেরি হানাহানি
রচল যাকে—উচ্ছাস তাকেই বলল—'প্রেমের কানাকানি'।
'প্রাণের ভক্তি' ? হায় রে, যাকে নিষ্প্রাণ ঢেউ সৃষ্টি করে—
তারি মায়ায় না-ভেবেও বোকারা সব ভেবে মরে !
এমন মায়া কেন হ'ল ?—ফের !—জানে না কেউ তা—ইয়ে—
মানে, সেটা যায় না জানা গজকাঠি বাটখারা দিয়ে।
এমনতর সত্য কেন থাকেই বা—তা-ও যায় না বোঝা !
বুদ্ধি যাকে পায় না—বুদ্ধিমানের কি তা উচিত খোঁজা ?

তাই যে-অবোধ সত্য ধরা দিল না মাপজোপের কাছে—
বৈজ্ঞানিকে করল তাদের জাতে-ঠেলা, বলল—'বাজে।'
বলল : 'জগৎ লক্ষ্যহারা প্রহেলিকা—' তবে যদি
লক্ষ্য কিছু চাস—তা চাপা 'ইস্‌ম্‌'-স্কন্ধে নিরবধি।
রাষ্ট্র নেশন্‌ বলশেভিকি ফাশিস্তি বা হিট্‌লারি চাল
নে মেনে—নেই আপত্তি তায়—শুধু, ধ'রে বুদ্ধিরি হাল
চলিস মূঢ়! ভবের রোগে নেই এ ছাড়া কোনোই দাওয়াই :
মরলে নাচার : পাইনি দিশা—কেমন ক'রে তোদের পাওয়াই ?*

ব্যাপারটা কি আসুন একটু ক'ষে দেখা যাক। বৈজ্ঞানিক সাহেব দেখলেন যে সময়ে সময়ে Prudence is the best part of valour : তুমি একেবারেই নেই একথা বল্লে মানুষ ভড়কে যাবে। তাই প্রথমটায় তাকে বললেন "তুমি না-ই বা থাকলে, সমাজ রাষ্ট্র ইস্‌ম্‌-রা তো আছে। তাদেরই বৃহত্তর সত্তায় তোমার তুমিত্ব দাও ডুবিয়ে, শ্যাম কুল দুই-ই থাকবে—দার্শনিক নামও রটবে, ভোগও

---

* But nobody likes living in such a world (without meaning or value). কাজেই To satisfy their hunger or meaning and value they turn to such doctrines as Nationalism, Fascism and Revolutionary Communism. Philosophically and scientifically these doctrines are absurd ; but for the masses in every community they have this great merit : they attribute the meaning and value that have been taken away from the world as a whole to the particular part of a world in which the believers happen to be living.

(Beliefs—Ends and Means)

চলবে তর্ তর্ করে। এই দেখ না—সেদিকে আমরা খরদৃষ্টি রেখেছি বন্ধু! কত কি দিচ্ছি তোমাকে চাক্ষুষই তো করলে—বাঃ প্রেস, রেল, স্টীমার, বিজলিবাতি, রেডিও, টকি, টেলিভিশন আরো কত কী আসবে—এ ও বুঝলে না হে ?

আসলে ঐ গরু রোগেই ঘোড়া মরল। সমাজ রাষ্ট্রের বৃহৎ সত্তা-টত্তা শুনতে খাসা কিন্তু কেবল ততক্ষণই যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভোগের কাজে লাগে। বলাই বেশি, বিজ্ঞান এ প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার সাক্ষ্য দিল অজস্র উপায়ে ভোগের তাঁবেদারি ক'রে! লোকে প্রায় ভুলেই গেল যে বিজ্ঞানের মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান—ইন্দ্রিয়ভোগ নয়। তাছাড়া ভোগের বাঁধন হ'ল নেশার মৌতাত—দেখতে দেখতে মানুষকে পেয়ে বসল। ফল যা হবার : দুদিন যেতে না যেতে দেখা গেল বিজ্ঞান নইলে আর চলে না। তখন বিজ্ঞান কামধেনু বললেন স্নেহের দাব্ড়ি দিয়ে: 'কিন্তু আমার কামদুগ্ধ পেতে হ'লে আমার চাঁটও সইতে হবে যে বৎস!' কামনাসক্ত মানুষ অগত্যা বলল—যো-হুকুম। এই কথাটা জেরাল্ড হার্ড বেশ বলেছেন তাঁর 'Surprising World'-এ :

"The layman realises his place in religion, philosophy and art, but in science he is prepared to accept without question the position allotted to him of an outsider. Nor can there be much doubt that he makes this exception, and from this quarter, this alone, accepts authority, not because he believes that science alone has a perfect and irrefragable system, but because it delivers the goods."

এ যেন অনেকটা পেয়ে বসা আর কি—বলিয়ে নেওয়া পাকে পিষে। বিজ্ঞান মানুষের রকমারি বস্তুর অভাব রচল নব নব বস্তুর জাঁকজমকে। বলল, বস্তুর বাহুল্য তথা ভোগের প্রকরণ-বৃদ্ধির নামই তো সভ্যতা—মা ভৈঃ। কিন্তু পার্থিব তৃষ্ণা বাড়াতে গেলে পারমার্থিক তৃষ্ণার প্রতিযোগিতা কমিয়ে একেশ্বর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—এক কথায় ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুনো। ফল দাঁড়ালো মনোপলি।

কিন্তু মনোপলিতেও মানুষ সহজে সায় দেয় না। কিছু না পেলে কিছু ছাড়া—লোভীর স্বভাব এ নয়। বিজ্ঞান বুদ্ধির লক্ষ্যহীন ভোগের রাজ্যে অশান্তি এনে দিল বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে একটা যাহোক আশ্রয়ও তো দিল। অন্যদিকে যে অথই জল। অবশ্য একথা সত্য যে প্রতি মানুষের অন্তরের অন্তরে কোথাও না কোথাও একটা কান্না আছে—যার নাম অসীমের আকুলতা, অচিনের অভিসার। কিন্তু বাইরের দিকে আবার একটা পিছুটানও আছে—ভয়ের। তাইতো মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় অচিনের তৃষ্ণা শাশ্বত হ'লেও তার প্রভাব ব্যাপক হবার পথে বাধা পায় প্রতিপদেই। আসে ভয়—আর আসে ভোগের লোভ। তাই বেশির ভাগ মানুষ—মেজরিটি—এই ভয়ের আর লোভের তাড়নায় সাড়া দিল, ছুটল বিজ্ঞানের তৃপ্তিহীন ভোগসত্রের দিকে। যে মাইনরিটি অন্যদিকে ছুটল ভোগ ছেড়ে বনে জঙ্গলে নির্জনবাসে—তাদের কয়েকজনের সৌম্য শান্তি দেখে মন গলে বটে, কিন্তু আবার তপস্যা দেখেও প্রাণ কাঁপে যে! ও রাজ্যের পাসপোর্ট পাওয়া বড় সহজ কথা নয় তো! বিজ্ঞানের রাজ্যে আধিভৌতিক বিলাসের ও প্রকাশের রাজ্যের প্রজা হ'তে হ'লে বুদ্ধিকে 'হাইল হিটলার' ব'লে অভিবাদন করতে পারলেই হ'ল—কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে

ফ্যাসাদ কি কম? ত্যাগ রে, বৈরাগ্য রে, নিরভিমানতা রে, নিরুৎসাহের মাঝখানেও বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকা রে, চিত্তশুদ্ধি রে,—সব চেয়ে শক্ত : যাকে চিনি না জানি না দেখতে পাই না তাকেই বলতে চাওয়া :

তব চিরচরণে চাই শরণাগতি
জপি আঁধারবনে তব অলখজ্যোতি।

ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবণ করতে ছোটার ম'ত প্রত্যয়ের পাথেয় নিয়ে কম লোকই জন্মায়—এ প্রতিভা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার চেয়ে ঢের বেশি বিরল—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে—হাজারে একটা ধায়—অতীন্দ্রিয়ের অভিসারে। বড় পথের পথিক হওয়া কি মুখের কথা? তাই সাত-পাঁচ ভেবে তনু-মন-প্রাণ থ্রি মাস্কেটীয়ার্স কুর্নিশ ক'রে বলল কোরাসে :

আচ্ছা জনাব, যুক্তি যখন সবার সেরা বলেন যাঁরা
সেরা মানুষ বিশশতকের—করব বরণ তারই কারা।
কারণ হুজুর, দেখছি ভেবে—বৈজ্ঞানিকী খাসতালুকে
খোশ মেজাজেই আছে সবাই (যুদ্ধ বাদে)—সুখচুমুকে
রঙিন সুধায় জাগিয়ে ক্ষুধা—ভোগলালসার মশাল জ্বেলেই :
রেডিও বিমান টকি—আরো জ্বলবে কতই—হেসে খেলেই
কাটবে জীবন ভর্সা আছে—রসদ বহু জুটছে দেখে
জয়ধ্বনিও করছে সবাই—লাগছেও বেশ চোখে চেখে।
তাছাড়া, কি জানেন জনাব, যাকে 'অচিন' বলেন মুনি
তাঁর দাবি তো নয় কো সোজা—ভুক্তভোগীর কাছেই শুনি।

হন ওমুখো যাঁরা দেখি—উঃ, তাঁদের হয় ছাড়তে এত
আগে থেকে জানলে কি কেউ এমন আদর কাড়তে যেত ?
এমন নাকাল করেন ঠাকুর—ভয় করে হায় পা বাড়াতে !
অতিলোভে নষ্ট তাঁতি সর্বহারা তপস্যাতে।
তাই হুঁম্—বেশ, বিজ্ঞানই সই, ঐ দলিলই রইল পাকা,
করছি হলফ : 'বুদ্ধি সলিড্, বাকি—জলে ছবি-আঁকা।'
আরো, মান্‌লে অচিন-সোনা কাঙালপনা চলবে না তো,
তাই—মানবো ইন্দ্রিয়েরি বালভাষণ আধো-আধো ;
আউড়ে তারি বিজ্ঞ বুলি—বলব : "ঝুলি আপ্‌নার অশেষ,
মরি মরি যন্ত্রলোকের ভোগ-রাগিণীই সবার সরেস।"
হায় অন্ধ শক্তি—যে রোজ দু-পা গেলেই অথই জলে
কিন্তু চালাক—হাঁটুজলেই অতল মীনের খবর বলে !
বিজ্ঞানে নেই শান্তি বটে—তবু কিছু সুখ যে আছে
মানতে হবেই—আমরাও তাই গড় করব সে-ধীরাজে।
আখের যদি হয় মাটি ? হোক্—দুলব গোড়ায় নাগরদোলে
এখন মিঠাই দাও তো—পরে পুড়িয়ো না হয় হলাহলে।

কিন্তু হৃদয় সায় দিল ঘোর অনিচ্ছায় under protest, বলল :

কেবল একটা ভয় তক্ষক রয় যে রাঙা শাঁশের মাঝে
হচ্ছে মনে—(ফল দিয়ে যাই বিচার যদি করতে গাছে)
জানেন তো কী করছেন হুজুর ? বৈজ্ঞানিকী সুখের পিছু
ছোটে যারা সত্যি তারা পায় কি সুখের আরাম কিছু ?
অন্তরে কে বলে যেন—'সুখ ব'লে ধাও যার পিছনে
সে যে সোনার হরিণ—তাকে মিলবে না জড়-অন্বেষণে।'

তাছাড়া যে-সুখ-সজ্জা আজ বিজ্ঞান দিচ্ছে ধারে
সুদ তার আদায় করছে নাকি টাকায় ষোলো আনা হারে ?
একটুখানি ভূমির তরে জগৎজোড়া আর্তনাদে
আপনার প্রাণ অটল—ধন্য—কিন্তু প্রাণীর প্রাণ যে কাঁদে !
শুনেছিলাম স্বর্গ পাব বৈজ্ঞানিকী সিঁড়ি দিয়ে
কিন্তু সে সুরঙ্গ কেটে কোন্ পাতালে আসছে নিয়ে
বুঝছি না তো !—তবে জনাব, আমরা স্বতই ভয়কাতুরে
তাই কাঁপি যেই আপনি আনেন ভূমিকম্প জগৎ জুড়ে।
ব্যথিয়ে আরো উঠি যখন আপনারই চর জলে স্থলে
ব্যোম বিমানে বাজ হানে আর তাকেই সবাই বীর্য বলে !
হয় মনে সেই ফৌস্টকে যে শয়তানে তার বেচল প্রিয়
আত্মা ক্ষণিক ভোগের তরে—নন তো হুজুর তার আত্মীয় ?
আলাদিনের জিন জ্বালত মুহূর্তে এক হাজার ফানুষ
আপনার এ-অগ্নিলীলার পাশে সে তো ছেলেমানুষ !
সবই মানি—শুধু মনে হয় যে এসব হাউই-রাগে
ভুলবে সে কে ? মিলবে যা—তা চিরন্তনী করবে কাকে ?
ধন ব'লে যা পাই—তার সুখ নেই বলি না—কিন্তু কে যে
গভীরে গায় : "ওঠে না হায়, বাঁশির বাঁশি সেথায় বেজে !"

(২)

The immediate reaction of human nature to the religious vision is worship. Religion...is the one element in human experience which persistently shows an upward trend. It fades and then recurs. But when it renews its force, it recurs with an added richness and purity of content...Apart from it, human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience...The vision claims nothing but worship; and worship is a surrender to the claim for assimilation, urged with the motive force of a mutual love ·· The power of God is the worship he inspires.

[Science and the Modern World...Whitehead]

হে অন্তরতম !
বরেণ্য বল্লভ নিরুপম !
ধ্যানে তব বসুন্ধরা উচ্ছ্বসিয়া চরণে তোমার
নিরন্তর নমে নাথ !—যুগে যুগে তুমি বারবার
নিভে যাও—পরে পুনরায়
জ্বলিয়া উঠিতে দীপ্ততর মহিমায়।
যুগে যুগে—ভূমিকম্পে, বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ে তব
তুঙ্গ শুভ্র স্বপ্নচূড়া বারবার—পরে অভিনব

তুঙ্গতর শুভ্রতর অভ্রচূড়া ঝলসে গগনে!
তোমা বিনা মানব জীবনে
ভোগ হয়—ফুলঝুরি স্ফুলিঙ্গ নির্দিশা
ঝলকিয়া হায় শুধু যন্ত্রণার নিশা
ক্ষণরাঙা দুর্ভোগের জোনাকির লীলা।
শুধু তব দীপ্তি অনাবিলা
জাগায় প্রণয়ে হৃদয়ের পূজারতি
মিলনে কৃতার্থ করি' শিখায় প্রণতি
পূজারী পূজার্হে বাঁধি'
একই প্রেমডোরে—দোঁহে করি' চিরসাথী।
তব ঐশী শক্তি ভগবান্!—
দেয় তব বন্দনার মন্ত্রদীক্ষা আনন্দ-অম্লান।

প্রথম অঙ্কের শেষে বিজ্ঞানের ট্রাজিক গাম্ভীর্যের অন্তরালে যে কমেডিটুকু লুকিয়ে আছে সেটা নিয়ে একটু প্রগল্‌ভতা ক'রে ফেললাম—ক্ষমণীয়। এ-অপরাধ করতাম না যদি আপনি রসিক না হ'তেন। এ ছাড়াও আর একটা সাফাই আছে আমার: হাল-আমলে বৈজ্ঞানিকরাও তো ধর্মকে নিয়ে কম ইয়ার্কি করেন নি। যথা—একজন বললেন: ভগবান হচ্ছেন gaseous vertebrate!

কিন্তু দোহাই আপনার, ছড়া ব'লেই ওকে নিতান্তই 'ছড়া' নাম দিয়ে নামঞ্জুর করবেন না। ছড়া কি সীরিয়স হ'তে পারে না? যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? ওর মধ্যে দুএকটা সত্যি অভিযোগও আছে। যথা—বর্তমান সময়ে যুদ্ধের সাংঘাতিক কুচ-কাওয়াজের জন্যে বৈজ্ঞানিকরা যে (উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে) বলেন তাঁরা দায়িক নন—ও ছড়ায় আমি পাল্‌টে সে হাসিকেই ভাগ্ ক'রে

একগাল হেসেছি। এঁদের অভিপ্রায়টা কি জানেন? এঁরা চান to eat the cake and have it : ধর্মের মন্ত্রতন্ত্রের ব্যভিচারের জন্যে এঁরা খোদ ধার্মিককে যুক্তির আদালতে আসামী দাঁড় করাবেনই করাবেন অথচ বিজ্ঞানের তুকতাকের মহামারীর জন্যে বৈজ্ঞানিককে দেবেন রেহাই। এঁদের ভাবখানা কী বলব?—

বিজ্ঞান তো জ্ঞানের পুরুত, তার সে-জ্ঞানের মন্ত্র যদি
পাঁচজনে রোজ বারুদ ক'রে কামান দাগে নিরবধি
তার জন্যে আমরা দায়ী—এটাকে কি যুক্তি বলে?
আমরা শুধু সেলামি চাই জ্ঞান ও ভোগের ভূমণ্ডলে।

বেচারী মানুষ সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বলে :—(কেঁচো খুঁড়তে সাপ পেয়ে):

মরি মরি, কী জ্ঞান আর ভোগের ভিয়েন চড়াও প্রভু!
গর্জে ওঠে লঙ্কাকাণ্ড—ভক্তরা চায় তাকেই তবু।

কিন্তু বলুন দেখি, বৈজ্ঞানিক প্রভু বিজ্ঞানের সুফলের জন্যে সুনাম কিনবেন—অথচ দুর্নামের দায়িত্ব নেবেন না—এ-ফন্দিবাজি ক'দিন চলে? সেই গল্প আছে না? রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে মৃগ ভেবে গো-বধ করে মহা ভাবনায় পড়লেন। শেষটা বললেন: "বাঁচা গেছে, গো-বধ তো আমি করিনি, করিয়েছেন আমাকে দিয়ে ত্বয়া হৃষীকেশ।" হৃষীকেশ এসে বললেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে: "মহারাজ!—রাজ্যশাসন করে কে?" রাজা বললেন: "ময়া।"—"মগধ জয় করল কে?"—"ময়া।" "ঐ বিরাট বিদ্যালয় গড়ল কে?"—"ময়া"—"কাঞ্চী-দুহিতাকে বীর্যবলে হরণ ক'রে আনল কে?"—"ময়া।" হৃষীকেশ তখন বললেন নিজমূর্তি ধ'রে: "মহারাজ! সব সুকীর্তির ভাগী আপনিই একা—ময়া,—কেবল গো-হত্যার অপকীর্তির দায়ের বেলাই দায়িক শুধু ত্বয়া!"

বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি প্রায়ই এই শ্রেণীর। বিজ্ঞানের জ্ঞানফল আহরণ করছে মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি--যে-বুদ্ধি ভগবানকে বরখাস্ত করল কুসংস্কার ব'লে। এ ভোগবাদের তথা নাস্তিকতার বেপরোয়া আরামটুকু লুটে নেব—কিন্তু শেষটা কুরুক্ষেত্র বাধলে সে-ব্যারামের জন্যে কোনো দায়িত্বই স্বীকার করব না? এ না হ'লে কূটবুদ্ধি! সাবাস্ জোয়ান্।

আপনি হয়ত প্রথমটায় এতটা সইতে পারবেন না, বলবেন: "কিন্তু সত্যিই তো বৈজ্ঞানিকের প্রকৃত কাজ জ্ঞানাহরণ—রণচণ্ডী হওয়াটা তো হ'ল বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার।" মানি। কিন্তু এ অপব্যবহার করছে কে? ছুরি শানাতে শেখাচ্ছে কে? মানুষের সব মারণাস্ত্রের মৃত্যুশক্তি বাড়াচ্ছে কে? নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিকরাই নন কি?

পাছে বলেন এ হ'ল ধার্মিকের বক্রোক্তি তাই একটু উদ্ধৃতি দিই রাসেলের একটি লেখা থেকে যিনি "ধার্মিক" নন এবং বৈজ্ঞানিকেরই পরম পাণ্ডা। তিনি বলছেন: There are signs, however, of a new dovelopment, in which victory will depend more upon scientific skill than upon numbers : victory will go to the Government which can most successfully spread its poison gas and bacteria among the enemy. This is a problem rather of technical ingenuity than of man-power, and suggests for the future an oligarchy employing scientific experts." শুধু ভবিষ্যতেই না তো, অতীতেও এই-ই হয়েছে বলছেন রাসেল—"In the French Revolution all the scientists whose heads

remained upon their shoulders occupied themselves feverishly with the problem of the manufacture of explosives. During the Crimean War, Faraday was appealed to by the war office on the subject of poison gas. And in the present day, as everyone knows, even the most pacifistic physicist or chemist can hardly avoid contributing something to the art of war.*

একথা বলার তাগিদ থাকত না যদি না আজকের দিনে এই আশ্চর্য লজিকটা বৈজ্ঞানিকদের মুখে মুখে এত বেশি রটত যে ধর্মের আনুষ্ঠানিক নানা কুসংস্কার ব্যভিচার প্রভৃতির জন্যে ধর্মকে দেগে দিতে হবে "অধর্মের কর্মভোগ" ব'লে, অথচ এই বিশ্বব্যাপী ঘাতকতা—যার বীভৎস পরিণতি দিন দিন বৈজ্ঞানিকের হাতেই বীভৎসতর হ'তে চলেছে—তার জন্যে বৈজ্ঞানিকের নিষ্পাপতাকে প্রতিপন্ন করতে হবে এই ব'লে যে, যেহেতু বিজ্ঞানের স্বধর্ম হ'ল অমৃতবীজ বপন করা, সেহেতু বিষবৃক্ষ তারা লালন করলেও সে পাপ তাদের অর্শাবে না।

এরকম ছেলেমানুষি যুক্তি যে বড় বড় বিজ্ঞানধ্বজেরা নিত্যই প্রয়োগ করেন তার কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, শুধু এই যে তাঁদের বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে তাঁরা ঠিক রাম-শ্যাম-যদু-হরির ম'তই গড়পড়তা মানুষ—যে (ঐ ত্বয়া হৃষীকেশপন্থী রাজার মতনই) চায় সুকৃতির গৌরবের দরুণ জয়টিকা কিন্তু দুষ্কৃতির দায়িত্ব থেকে পূর্ণ অব্যাহতি।

এই মানুষী দুর্বলতার আর একটি মূল কি, তাও আপনি জানেন। সেটা হচ্ছে—যা নেই কোরাণে (mutatis mutandis—অত্র

---

*Dare We Look Ahead বইটির প্রথম প্রবন্ধ "Science and Social Institutions."

বৈজ্ঞানিকী পঞ্জিকায়) তা নেই ভুবনে। সুতরাং—বৈজ্ঞানিকরা সিংহনাদ ক'রে বললেন—সত্যকে জানবার একটিমাত্র বৈ পন্থা নেই—যার নাম হ'ল বৈজ্ঞানিক মাপজোপের পথ। অবশ্য সব বৈজ্ঞানিকই একদেশদর্শী বলছি না—বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হোয়াইটহেড, এডিংটন, জীন্স, প্লাংকও মেলে বৈকি।* কিন্তু তবু এখনো অনেক অল্পবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক আছেন (মানে যাঁরা নিজের এলাকার বাইরে কথা কইতে গেলেই বালভাষিতং রূপ অমৃত বিতরণ ক'রে থাকেন) যাঁরা স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে অনধিকারচর্চায় দুর্ধর্ষ গৌরব বোধ করেন।

---

*এডিংটন বহু জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের কটূক্তি সয়েছেন বলার জন্যে যে "Perhaps the most essential change is that we are no longer tempted to condemn the spiritul aspects of our nature as illusory because of their lack of concreteness." জীন্স্‌ও ডিটো, যেহেতু তিনি বলেছেন স্পষ্টই যে "the ultimate realities of the universe are at present quite beyond the reach of science, and probably are forever beyond the comprehension of the human mind." এঁদের কথা আমরা জানি অনেকেই। তবে Max Planck-এর কথা তত রটেনি এখনো। তিনি কি বলেছেন শোনাই যাক না একটু: "There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other. Every serious and reflective person realises, I think, that the religious element in his nature must be recognised and cultivated if all the powers of the human soul are to act together in perfect balance and harmony. And indeed it was not by any accident that the greatest thinkers of all ages were also deeply religious souls, even though they made no public show of their religious feeling. (Where Science is Going—p. 168)

আর তাঁদের একদল উপাসক থাকেন যাঁরা করেন জয়ধ্বনি—বৈজ্ঞানিক হাঁড়ির খবর না রেখে শুধু দাড়ির অথরিটিতে।

কিন্তু তবু দিন বদলাচ্ছে। তাই—বলছেন অলডাস—বহু বৈজ্ঞানিক এযুগে বুঝবার কিনারায় এসেছেন যে বিজ্ঞান এ জগতের যে ছক কেটেছে সেটা অত্যন্ত একপেশো, কেননা সে ছক হ'ল শুধু তাদের গাণিতিক অভিজ্ঞতার ফল। তাঁরা যদি শৈল্পিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘর করতেন ও সার্থকতা-বোধের খবর রাখতেন তাহ'লে এ ছক হ'ত অন্যরূপ। ষাট বৎসর আগে বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকই ভাবতেন যে গণিত ছাড়া আর কোনো বিদ্যার ক-খ পর্যন্ত না জেনেও তাঁরা এ-ব্রহ্মাণ্ডের যে-ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন সেই-ই হ'ল পরম তত্ত্ব, নক্সার নক্সা। হাল-আমলে এ-বিশ্বাসের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অন্দর-মহলে এই গভীর বোধ জাগতে শুরু করেছে যে আমাদের সমগ্র অনুভূতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুভবের সই পাতানো দরকার, নৈলে মাত্র সাত চিতে পরম সত্যের গোলোকধামে পৌছনো অসম্ভব। কিন্তু হ'লে হবে কি—বলছেন অলডাস, ঠোঁটে তাঁর হাসির ঝিলিক—যাঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিঞ্চিৎ কমের দিকে তাঁরা বোঝেন, কিন্তু একটু দেরিতে। কাজেই ষাট সত্তর বৎসর আগের বৈজ্ঞানিকরা যে-রকম একপেশো ডগম্যাটিক দাম্ভিক ঢঙে বোলচাল দিতেন আজকের গড়পড়তা মানুষ সেই ঢঙ নকল করাকেই মনে করে দিব্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

(মূলটা উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি অলডাসের চমৎকার ভঙ্গির জন্যে : "All that I need add is the fact that, in recent years, many men of science have come to realise that the scientific picture of the world is a

partial one—the product of their special incompetence to deal systematically with aesthetic and moral values, religious experiences and intuitions of significance. Unhappily, novel ideas become acceptable to the less intelligent members of society only with a very considerable time-lag. Sixty or seventy years ago the majority of scientists believed—and the belief often caused them considerable distress—that the product of their special incompetence was identical with reality as a whole. To-day this belief has begun to give way, in scientific circles, to a different and obviously truer conception of the relation between science and total experience. The masses, on the contrary, have just reached the point where the ancestors of today's scientists were standing two generations back."—Ends and Means 269 p.)

কিন্তু আরো হয়েছে কি,—বলছেন অলডাস (২৭০ পৃষ্ঠা)—আমরা যে জানি না তার প্রধান কারণ আমরা চাই না জানতে। তাই তো আমরা হামেশা এত বড় গলা ক'রে বলি যে জগতের নেই কোনো লক্ষ্য—বললে আমাদের জলযোগ ও গোলযোগের কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয় ব'লে। ফলে হয়েছে কি (২৭৬ পৃষ্ঠা) আমরা বিজ্ঞানের পরিচর্যায় নিকৃষ্ট লক্ষ্যভেদের জন্যে সাধছি উৎকৃষ্ট ধনুর্বেদ। তাই—বলছেন অল্‌ডাস—যাঁরা জীবনকে এই সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিতে দেখতে রাজী নন, এই সব একপেশো বৈজ্ঞানিক তাঁদের উপাধি দিচ্ছেন "বৈজ্ঞানিক

কুলাঙ্গার, সুবিধাবাজ, আত্মমুখর" ("bad scientists, charlatons, self-advertisers")! দেবেন না?—এই ধরণের ধনুষ্টংকারই যে হালফ্যাশনের যুক্তিঝঙ্কার ব'লে কল্কে পায়।

কিন্তু মুস্কিলটা কি, আপনি-আমি-রাম-শ্যাম-হরি কারুর কাছেই অবিদিত নেই। মুস্কিল হচ্ছে এই যে-কথা জেরাল্ড হার্ডও বলেছেন "If man could not find any place for meaning in the universe, he could only break down and desert science." * অন্যভাষায়, যদি এ জগতের তাৎপর্য সার্থকতা লক্ষ্য-জাতীয় কোনো মানে না-ই থাকে, যদি সে দেখে যে বিজ্ঞানের পথে আস্তানা মিলতে পারে শুধু এক বৈদ্যুতিকপ্রবাহসার গতিশীল মতিহীন হাহাকারে যেখানে মানুষের মনপ্রাণবুদ্ধিচেতনা একেবারেই অবান্তর তাহ'লে তার বৈজ্ঞানিক উৎসাহের ঘনঘটা এক সময়ে না এক সময়ে ফিঁকে হ'য়ে আসবেই আসবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেননা বিজ্ঞানের কাছে পরীক্ষার সত্য যেমন অপরিহার্য মানুষের চেতনার কাছে সার্থকতার সত্য ঠিক তেম্‌নি—এ তার চোখের আলো, বুকের হাওয়া, তৃষ্ণার জল,—বস্তু আছে কিন্তু চেতনা নেই, ক্ষুধা আছে কিন্তু সুধা নেই, গতি আছে কিন্তু লক্ষ্য নেই এ-কথা বললে সে শুধু যে নাচতে পারে না তাই নয়—বাঁচতেই পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা একথার উত্তরে কি ব'লে থাকেন তাও আপনি জানেন। বলেন—বিজ্ঞ হেসে অবশ্য—"ধার্মিক ঠাকুর! সবই তো বুঝলাম—কিন্তু পরীক্ষা ক'রে যদি সার্থকতা বা লক্ষ্যের কোনো দিশাই না পাই তবে মানি কী ক'রে? চাই সত্য—মিথ্যা তো নয়।

---

* This Surprising World—৭৭ পৃষ্ঠা

জীবনের লক্ষ্য আছে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ না পেয়ে তাকে বিশ্বাস করলে সেটা হবে হাঁদার স্বর্গবাসের সামিল (fool's paradise)। এ-ধরণের স্বর্গ টেঁকে না—মোটাবুদ্ধি ঠাকুর, ধ্ব'সে পড়েই। এক সত্যই টেঁকসই।"

কিন্তু উত্তরে ঠিক অম্‌নি তেরছ হেসেই বলা চলে: "বৈজ্ঞানিক সাহেব! সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পরীক্ষা বলতে যে কেবল বৈজ্ঞানিক বকযন্ত্র ও গজকাঠির পরীক্ষা বোঝায় একথাটা কেমন জানেন? পরমহংসদেবের সেই হাতির উপমা স্মরণ করুন—এক অন্ধ ছুঁলো তার দাঁত—বলল হাতি হ'ল শক্ত মসৃণ—লাঠির মতন। আর এক অন্ধ ছুঁলো তার শুঁড়, বলল হাতি হ'ল লম্বা নরম—সাপের মতন। আর এক অন্ধ বসল তার পিঠে, বলল হাতি হ'ল প্রশস্ত মখমলের দোলনার মতন। বলবেন কি চোখ যাঁর নেই যাঁর সম্বল শুধু স্পর্শবোধ তিনি হাতির পূর্ণ পরিচয় পান? বুদ্ধিচুঞ্চু সাহেব, এ আমার নৈয়ায়িক তর্কও নয়—এ সত্যকে উপলব্ধি করার ঠিক তেম্‌নি পথ আছে, যেমন পথ আছে আপনার প্রোটন ইলেকট্রনের মতিগতি জানবার। সে-পথে গেলে হাতে হাতে দেখতে পাবেন যে দুর্লভ সত্য সন্ধানের পথে ইন্দ্রিয়-বোধশক্তি ও মানস-প্রতিভা যে-বাতি ধরে তার দৌড় অতি সামান্যই।—শুধু তাই নয়, নানা অতীন্দ্রিয় বোধ অতীন্দ্রিয় শক্তির যদি একবার পরিচয় পান (সে-শক্তির, সে-জ্ঞানের তপস্যা ক'রে অবশ্য) তাহ'লে দেখতে পাবেন যে সে-বিভূতি সে-শক্তি সে-দীপ্তির কাছে আপনার মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দাঁড়ি-পাল্লা বকযন্ত্রের শক্তি মনে হয় ছেলেমানুষি, মানে জ্ঞানের বৈকুণ্ঠলোকে। তবে হয়েছে কি জানেন সায়েব? যেমন মন-হাতিয়ার বিনা শুধু প্রাণশক্তির জোরে পশু শুধু যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

আহরণ করতে পারেনা তাই নয়—জানেও না যে এ জ্ঞান তার নেই—তেম্‌নি শুধু মনঃশক্তিসম্বল বৈজ্ঞানিক জানেও না যে মনের ফন্দি-ফাঁশে মানসাতীত সত্যকে, অতীন্দ্রিয় জগৎকে, বাগে পাওয়া যায় না। অবশ্য এ-জগৎকে বাগে পেতে চাইবেন কি না সেটা আপনার নিজের উপরেই নির্ভর করে—তবে যদি চান তাহ'লে ওরকম একগুঁয়ে অন্ধ মন-রোখালো হ'লে চলবে না—নম্র অর্থীর মতনই চাইতে হবে মনের আয়ত্তাতীত শক্তি—Supraintellectual powers—নৈলে এ জীবন জগৎ সম্বন্ধে শুধু মনের পিদিমে যেটুকু দেখতে পাবেন তার পরিধি যে খুব প্রশস্ত নয় সেটা অগত্যা ঠেকেই শিখতে হবে। আরো এক কথা সাহেব! যদি এ-বিভূতি এ-শক্তি পান তাহ'লে বুঝতে পারবেন আপনি কী হসনীয় কথা বলতেন যখন স্পর্ধা ক'রে ঢাক পেটাতেন যে, ল্যাবরেটরির তৌল বাটখারায় যে-সব সত্যের নাগাল মিলল না, আপনার গাণিতিক অঙ্ক যে-সব অনুভূতির খবর পেল না তারা অসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ। এক কথায়, আপনি যে-ধরণের জড়জাতীয় সাক্ষীকে ডাক দিচ্ছেন তারা চেতনাজাতীয় উপলব্ধিকে সনাক্ত করতে একেবারেই অপারগ। অবশ্য আপনার এসব সাক্ষী-সামন্ত বলছে বটে জাঁক ক'রেই (শেক্ষপীয়রের ভাষায়): We can call up spirits from the deep কিন্তু উত্তরে ঐ কবিরই ভাষায় আমরা প্রশ্ন করব:

> "So can I and so can any man,
> But wilt they come when you do call them up"?

আমায় ভুল বুঝবেন না কিন্তু। একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে মনের বঁড়শিবাজিতে সত্যসিন্ধুর কোনো মাছই গাঁথা যায় না। নিশ্চয়ই যায়—আর সে-সব মাছের বাহারও থাকতে পারে যথেষ্ট। আমার বক্তব্য এই যে, সত্য-রত্নাকরের অতলবাসী শুধু এই ঝিকমিকে

বাহারে মাছই নয়—সেখানে এমন অতলমণিও আছে যাদেরকে না গাঁথা যায় মনের বঁড়শিতে, না ধরা যায় বুদ্ধির জালে। তাদের নাগাল পেতে হ'লে সমগ্র সত্তাকে হ'তে হবে ডুবুরি—ধ্যানের ডুবুরি, প্রেমের ডুবুরি, প্রার্থনার ডুবুরি। বৈজ্ঞানিকের একথা বলবার এক্তিয়ার আছে যে প্রশ্নহীন সর্তহীন হ'য়ে এ ধরণের ডুবুরিপনা তাঁর ভালো লাগে না। বেশ তো। থাকুন না তিনি ঐ মানসলোকের ঝিকমিকে মীনমকরের ধীবর হ'য়ে। কিন্তু ডুবুরি হ'য়ে রত্নাকর থেকে যারা অন্য জাতীয় রত্ন আহরণ করছে সে সব মুক্তা-মণি মন-বঁড়শিতে গাঁথা যায় না বা বুদ্ধিজালে বাঁধা যায় না ব'লেই একথা বলবার এক্তিয়ার তাঁর নেই যে ওসব রত্নই নয়। এ অবশ্য হ'তে পারে যে এ-রত্নের তাঁর কাছে কোনো মূল্যই নেই—এমন কি একথা অবিশ্বাস করবার দুঃসাহসও আমার নেই যে জড়তথ্য তাঁকে চেতনাতত্ত্বের চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। বহুলা প্রকৃতি বিপুলা চ পৃথ্বী—সবাই সব জিনিষ চাওয়া তো দূরের কথা বোঝেও না এ-চাওয়ার সার্থকতা কোথায়; যার বিদ্যে-বুদ্ধির যতটা দৌড় আর কি। পরমহংসদেবের সেই গল্প স্মরণ করুন—হীরে নিয়ে গেল লোকটি প্রথম বেগুনওয়ালার কাছে। সে দাম দিল—দশথান কাপড়, তার একটিও বেশি না। তারপরে জহুরীর কাছে যেতেই সে দর হাঁকল—দশ লাখ টাকা। তাই তো যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা সবাই বলে গেছেন শাখামৃগের কাছে শাখারই মূল্য আছে মুক্তাহারের না।

একথা উল্টো দিকেও সমান সত্য। অর্থাৎ শাখামৃগ যেমন শাখা পেলে মুক্তা চায় না—তেমনি জহুরী মুক্তা পেলে শাখার জন্য লালায়িত হ'তে পারে না। অনেক ক্ষীণচিত্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে চিন্ময় চেতনার নানা অপরূপ দীপ্তি উল্লাস আনন্দের মূল্য নেই—বটেই তো। কিন্তু

চেতনার গহনবাসীর কাছে বৈজ্ঞানিক সাংবাদিকতার (অণুপরমাণুর গতিবিধির খবরাখবর) মূল্যও ঠিক অমনিই অকিঞ্চিৎকর। তাই কলহ রেখে মেনে নেওয়াই ভালো যে প্রকৃতিভেদ অনুসারে চাওয়ারও ভেদ ঘটে—পরমহংসদেবের ভাষায়, যার পেটে যা সয়। যে-সন্ধানীর কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্যই উপাস্য তাঁকে অশ্রদ্ধা করার কোনোই কারণ নেই বটে, কিন্তু যে-সন্ধানীর কাছে অণুপরমাণুর ঘরোয়া কথা বা গ্রহনীহারিকার রেসকোর্সের খবর বাহ্য তাকে বৈজ্ঞানিক-সাংবাদিক কোন্ যুক্তিবলে বোঝাবেন যে এইসব দৌড়-ধাপের খবরই হ'ল একমাত্র খবর—বাকি সব গুজব—জনশ্রুতি ?—বিশেষ যখন যুগে যুগে দেশে দেশে বহু শ্রেষ্ঠ মানুষই এই খবরের জন্যেই উদাসী হয়েছেন, নমস্য হয়েছেন, মানুষকে দিয়েছেন অমূল্য শান্তি প্রেম সেবার প্রেরণা। তাঁদের তপস্যালব্ধ সত্য অবিশ্বাস্য—তাঁদের অনুভব-স্বাক্ষরিত দলিল "মিথ্যা" একথা অল্পবুদ্ধি বৈজ্ঞানিকরা বললেও কোনো গভীরজ্ঞ বৈজ্ঞানিকই বলতে সাহস করেন না—শুধু বলেন ও খবর বৈজ্ঞানিক জরিপের মধ্যে পড়ে না। বেশ কথা। এতে তর্কের তো কিছুই থাকতে পারে না।* তর্ক ওঠে কেবল যখন বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক ছকই হ'ল জগতের একমাত্র স্বরূপ—সত্যের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মানচিত্র।

---

*যথা রাসেল বলছেন তাঁর Science and Social Institution প্রবন্ধে : "Everything that has to do with values is outside the province of science." কিম্বা এডিংটন বলচেন তাঁর Science and the Unseen World-এ : "Natural law is not applicable to the unseen world behind symbols because it is unadapted to anything except symbols... you cannot apply such a scheme to the parts of our personality which are not measureable by symbols any more than you can extract the square root of a sonnet...It is to this background that our personality and consciousness belong."

মনে রাখবেন এ হ'ল বিজ্ঞানের সন্ধানী দিকটার কথা, যার খবর রাখেন শুধু বিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিত কয়েকজন। কিন্তু, বলাই বেশি, বিজ্ঞান আজ জগতের জনসাধারণের কাছে যে সম্মান সম্ভ্রম পেয়েছে তার মূল হ'ল বিজ্ঞানের শক্তির দিক্, বিভূতির দিক, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিক্, মারণ বশীকরণের দিক্। বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান-রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দিল—তার অনেক কুসংস্কার দূর করল—স্বাস্থ্যবিধানের আখড়া বসাল—এ সবই খুব ভালো কাজ সন্দেহ কি। বিজ্ঞান আরো এই কাজের মতন কাজটি করল যে, যন্ত্রের গতিবলে মানুষকে মানুষের কাছে এনে ব্যবসা-বাণিজ্যের আড্ডার অজুহাতে তাদের মধ্যে চেনাচেনি জানাশোনার ঘটকালি করল নানাভাবেই। এ সবের জন্যেও বিজ্ঞানের কাছে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও বলা যায় না যে বিজ্ঞান মানুষের আদিম তৃষ্ণার জল এনে দিল। মানি জগতের তথ্য-তৃষ্ণাও একটা তৃষ্ণা—কিন্তু একথা মানব না যে এই-ই হ'ল মানুষের অন্তরের গভীরতম ক্ষুধা। অন্নও ব্রহ্ম মানি—কিন্তু উপনিষৎ বলছেন সেখানেই মানুষ থামেনি কোন দিন, থামতে পারে না, প্রাণ, মন বিজ্ঞান ছাড়িয়ে আনন্দে পৌঁছিয়ে তবে সে জানল যে আনন্দই হ'ল ব্রহ্মের পরমতম স্বরূপ, উজ্জ্বলতম বিভূতি, মহত্তম সত্তা। এই জন্যেই যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ মানুষের পরম প্রশ্ন হয়ে এসেছে যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?—যাতে অমৃতই না হলাম তা নিয়ে করব কী?*

*উইলিয়ম জেম্‌স তাঁর প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্‌-এ এই কথাটি বলেছেন বড় সুন্দর ক'রে; "Religious melancholy is not disposed of by a simple flourish of the word 'Insanity'. The last things, the absolute things, the overlapping things are the truly philosphic concerns; all superior

এই-ই হ'ল মানুষের প্রশ্নের প্রশ্ন, তৃষ্ণার তৃষ্ণা—মনের এই ততঃ কিম্-তৃষ্ণা, চেতনার অন্তর্মুখিতা-তৃষ্ণা, হৃদয়ের প্রেমতৃষ্ণা, প্রাণের ঐক্য-তৃষ্ণা। এই মূল তৃষ্ণাগুলি মিটলে তবেই এ-জগৎ হ'য়ে ওঠে আনন্দধাম—নইলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় শুধু একটু-আধটু আমোদ-প্রমোদের নাগরদোলা, হট্টমন্দির—যার পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু শূন্য নিরর্থকতার অসাঙ্গ ব্যাপ্তি—গীতার ভাষায় "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্"। তাই সব সাধনা, সব তপস্যার মূল্যই সমান—সত্য-সন্ধানের রাজ্যে মুড়ি-সন্ধানী ও মিছরি-সন্ধানী সমান কুলীন এ হ'তেই পারে না। মানুষের উপলব্ধিলোকে সার্থকতার, শান্তির, আনন্দের অভিজ্ঞানেই মানুষ সত্যের ক্রমমূল্য যাচাই করতে বাধ্য। তাই বিজ্ঞানের ঐহিক সুখবিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রেও একথা বললে অন্যায় হয় না (যা অলডাস বলেছেন তাঁর After many a Summer-এ ১১১ পৃষ্ঠায়) যে বিজ্ঞানের আহরণী প্রবৃত্তি খতিয়ে মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি, দিয়েছে উত্তেজনা। অবশ্য নতুন নতুন ভোগবৃত্তি উস্কে দিয়ে সে প্রথমটায় মানুষকে কিছু সুখের লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু সেই সুখের সঙ্গে এনেছে দশগুণ আসক্তি; এনেছে অসুখ, অশান্তি, অন্তর্দাহ; বাড়িয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের সংহারশক্তি, চাতুরীর প্রবঞ্চনা শক্তি—এবং সবচেয়ে ভয়ের কথা :—মানুষের নিম্নপ্রবৃত্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিক যাগযজ্ঞে ব্যাপক করবার শক্তি। ফল কি হয়েছে তা কি বলবার দরকার আছে আজকের জগৎজোড়া কুরুক্ষেত্রের পরেও? এর পরেও যারা বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি ক'রে স্তব করতে থাকে : "যা দেবী সর্বভূতেষু হত্যারূপেণ সংস্থিতা"—একমাত্র তাঁর প্রসাদেই এ জগৎ হ'য়ে উঠতে পারে

---

minds feel seriously about them, the mind with the shortest views is simply the mind of the more shallow man."

স্বর্গরাজ্য—তাদের উৎসাহী বলতে পারা যায়, কিন্তু জ্ঞানী বললে একটু অত্যুক্তি হবে না কি ?

মানি, বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির কুপ্রয়োগে জগতে যে দারুণ ভয় ও অমঙ্গলের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুধু সে-কুফল দিয়েই বিজ্ঞানকে বিচার করা চলে না। কারণ তলিয়ে দেখলে বিজ্ঞান হচ্ছে মনের স্বাভাবিক তথ্যসন্ধানীবৃত্তির বিধিবদ্ধ চর্চা। এ-চর্চার ফলে মানুষ তার পরিবেশের উপর প্রভুত্ব পেয়েছে। শক্তির দিক দিয়ে বিজ্ঞানের এ-আধিপত্যের কোনো মুখ্য আধ্যাত্মিক মূল্য না থাকলেও জ্ঞানের দিক দিয়ে বিজ্ঞানের বোধশক্তির ব্যাপ্তি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সহায় হ'তে পারে—মানুষকে শুধু অবসর দিয়ে বা তার জীবিকার্জনের শ্রম লাঘব ক'রেই নয়—বহির্জগতের নানা গতিবিধির সম্বন্ধে এমন প্রবুদ্ধ চৈতন্য জাগিয়ে যার ফলে মানুষের রহস্যবোধ গভীরতর হ'য়ে ওঠে—তার অন্তরাত্মা আনন্দে সম্ভ্রমে শিউরে ওঠে বিশ্বলীলার শৃঙ্খলার অনুধ্যানে, ঐক্যের অনুভবে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন বড় সুন্দর ক'রে : "The more the mind knows, the better it understands its forces and the order of nature ; the more it understands its forces or strength, the better it will be able to direct itself and lay down the rules for itself ; and the more it understands the order of nature, the more easily it will be able to liberate itself from useless things."

অবশ্য একথা না মেনেই উপায় নেই যে বিজ্ঞানের চর্চার ফলে যে জ্ঞান মানুষ লাভ করেছে তার এই দার্শনিক মূল্য সম্বন্ধে খুব কম লোকেই সচেতন। একথাও মানতেই হবে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানোৎ-

সাহীরা এজন্যে বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি করেন না যে বিজ্ঞানচর্চায় মানুষ বেশি নির্লোভ হ'য়ে "বাজে মালের" (useless things) হাত থেকে মুক্তি পে'ল। বরং বিজ্ঞান-চর্চার ফলে যা দেখা যাচ্ছে সে তো এই বাজে মালেরি সিংহনাদ, হট্টগোল। কিন্তু তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে এজন্যে দায়িক আসলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়—দায়িক হচ্ছে মানবিক গৃধ্নুতা, লোভ, নিষ্ঠুরতা ও আসক্তি। তাই বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক হাজারো কুফল সত্ত্বেও সে-সব কুফলের জন্যে প্রকৃত বিজ্ঞানকে "অভিশপ্ত" বলা চলে না। বরং স্পিনোজার কথাই বেশি সত্য যে মানুষ যদি তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ঠিক ভাবে আত্মসাৎ করতে পারে তবে তার ফলে তার শুধু যে বহির্জীবনের সুখবৃদ্ধি তা-ই নয়—তার আন্তর আনন্দ ও অনাসক্তিও বাড়বারই কথা। কেননা বিপুলের বিশালের অনন্তের অনুধ্যানে মানুষের অন্তর তাঁর ছোঁয়াচ পায়ই কিছু না কিছু। তাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় একটা আশ্চর্য সরলতা ও আধ্যাত্মিক অনাসক্তির ভাব। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞানের প্রভাবই তার সব চেয়ে সত্য প্রভাব—যেহেতু এ হল আধ্যাত্মিকতার সগোত্র।

কিন্তু এখানে প্রায়ই চিন্তার গোলমাল ঘটে দেখতে পাই—আমাদের দেশে। আমাদের দেশে বলছি এইজন্যে যে ওদেশে এধরণের এলোমেলো চিন্তা যথেষ্ট থাকলেও সুধীসমাজে সে-চিন্তামণি-দের প্রতিষ্ঠা কম। বলে না, হিন্দু মুসলমান হ'লে গোরক্ত হয় তার প্রাত্যহিক অনুপান? তাই আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত মানুষও সব ছেড়ে বিজ্ঞানকেই তেড়ে ধ'রে দাঁড় করাতে চান কল্পতরু—যদিও ওদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা আর বলেন না যে বিজ্ঞান মানুষকে তার যা কিছু কাম্য তাই এনে দিতে পারে। যাহোক্ কথাটা এই যে

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যখন বিজ্ঞানচর্চায় আধ্যাত্মিকতার কোটায় ওঠেন তখনও ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে এ গৌরবলোকে তাঁকে পৌঁছে দিল জড়বস্তুবিচার নয়—পৌঁছে দিল তাঁর আন্তর প্রজ্ঞা। জড়বস্তু-চর্চায় লাভ হয় কয়েকটি তথ্যজ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে জ্ঞানী হ'য়ে ওঠেন সে এ-তথ্য জানার ফলে না—জ্ঞানী হ'ন এ তথ্যগুলি নিয়ে গভীর ধ্যান ক'রে, তপস্যা ক'রে। তবে জ্ঞানী কথাটা নিয়েই এখানে গোল বাধে ব'লে কথাটা আর একটু খুলে বলতে হবে।

ইংরাজিতে দুটো কথার চল আছে, একটা হ'ল knowledge—এর চলতি নামই বাহাল রাখি—জ্ঞান (অর্থাৎ তথ্যজ্ঞান)—আর একটা হচ্ছে wisdom—একথাটিকেও আমরা সচরাচর জ্ঞানই ব'লে থাকি। তাতেই হয় গোল। তাই একে নাম দেওয়া যাক প্রজ্ঞা।

একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে বৈজ্ঞানিকও বরেণ্য ও পূজার্হ হ'য়ে ওঠেন তখনই যখন তাঁর এই তথ্যগত জ্ঞানকে পরিপাক ক'রে তিনি লাভ করেন জানার শ্রেষ্ঠ ফল, অর্থাৎ—প্রজ্ঞা। মানে, সে-বৈজ্ঞানিককে আমরা খাতির করতে পারি কিন্তু প্রণাম করব না যাঁর জ্ঞান আছে কিন্তু প্রজ্ঞা নেই। কারণ তিনি বাইরে "জান্তা" হ'লেও ভিতরে অবোধই বটে।

কিন্তু জ্ঞানকে প্রজ্ঞাতে পরিণতি দেয় কে? এ হয় কি জড়ের গুণে? তা তো নয়। জ্ঞান প্রজ্ঞা হয় ঠিক সেই পথেই যে পথে তাপ হ'য়ে ওঠে আলো, কামনা হ'য়ে ওঠে প্রেম, বেদনা হ'য়ে ওঠে আনন্দ। অর্থাৎ আত্মার ছোঁয়াচে—জড়ের সাহচর্যে না।* কিন্তু

* এটা অবৈজ্ঞানিকের কথাও নয়, স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর The World As I See It-এ লিখছেন "It is not the fruits of scientific research that elevate a man and enrich his nature, but the urge to understand the intellectual work, creative or receptive.

এই ছোঁয়াচই তো দিব্যশক্তি—ঐশী করুণা। কাজেই বৈজ্ঞানিক সত্যি প্রণম্য হন তখনই যখন তিনি জড়ের তথ্যজ্ঞানে আত্মিক আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে তাকে রূপান্তরিত করেন তত্ত্বে। এ যিনি না পেরেছেন তিনি সত্যকে পেয়েছেন তথ্যরূপে—তত্ত্বরূপে না। অর্থাৎ জ্ঞানের পথ্যে তাঁর আত্মার পুষ্টি হয় নি, হয়েছে বুদ্ধির উদরাময়। যেসব বৈজ্ঞানিক অল্প একটু জ্ঞানতথ্য পেয়ে বোধিসত্ত্বকে নিয়ে হাসাহাসি করেন তাঁরা হচ্ছেন আসলে এই পেটরোগাদের দলে—অসুস্থ moron, কেবল Zi ন্‌তি পারেন নি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে চেতনার যে-সজাগ আত্মনিবেদনের প্রসাদে জীবনের ও জগতের পরম রহস্যের চরম শিখরে পৌছনো যায় বোধশক্তির চিন্ময়পরিব্যাপ্তিতে, প্রেমের পরমানন্দে, শান্তির আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠায়—সে পূর্ণায়তি বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে থাকবেই থাকবে যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক চাইবেন শুধু জ্ঞানকে, প্রজ্ঞাকে না। কারণ এ পরমবিকাশ আমাদের উপলব্ধিগম্য হ'তে পারে শুধু চেতনার আরোহণের ফলে—অখণ্ড দিব্যচেতনার সাযুজ্য ও সাধর্ম্য লাভ ক'রে—অন্য কোনো পথে না। আর একথা শুধু অবৈজ্ঞানিকরাই বলেন না—বৈজ্ঞানিকও বলেন, বলতে বাধ্য যদি জ্ঞানের পথে প্রজ্ঞার ছিটে-ফোঁটাও তিনি পেয়ে থাকেন।

বাহুল্যভয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দেব—রাসেল। রাসেলকে টানছি আরো এইজন্যে যে তিনি নিজেকে সেরা নাস্তিক ব'লেই প্রচার ক'রে থাকেন। এহেন মানুষের মুখে আস্তিক্যমন্ত্রের মূল্য বেশি। তাঁর সেদিনকার বই Power-এর শেষে তিনি বলেছেন। "...The really valuable things in human life are individual, not such things as happen on a battlefield or in the clash

of politics or in the regimented march of masses of men towards an externally imposed goal. The organized life of the community is necessary (কিন্তু গৌণভাবে—মুখ্যভাবে না) but it is necessary as mechanism, not something to be valued on its own account. What is of most value in human life is more analogous to what all the great religious teachers have spoken of." *

কিন্তু এ-ছন্দ, এ-বাণী কার ?—বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যে নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ বলেছি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাথা-ব্যথা নেই—value নিয়ে, তত্ত্ব নিয়ে—সে এ-দুনিয়াটাকে দেখে শুধু একগঙ্গা নিশ্চেতন অণুপরমাণু বা প্রবাহের লক্ষ্যহীন গাণিতিক গতিবিধির নিশ্চেতন নাট্যমঞ্চ হিসেবে। এ-বুদ্ধির জড়বাদকে বের্গসঁ বেশ চমৎকার ঠাট্টা করেছেন এই ব'লে যে "এর ব্যাকরণ হ'ল শুধু বিশেষ্যকে নিয়ে, কিন্তু বাস্তব জীবন ভাষার মতন,.তার মধ্যে শুধু বস্তুই নেই গতিও আছে, শুধু বিশেষ্যই নেই ক্রিয়াপদও আছে।" একদেশদর্শী বুদ্ধির এহেন অপঘাতের ট্র্যাজিডি শুধু যে বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামির খাসতালুকেই মেলে অন্যত্র না—এমন কথা বলছি না অবশ্য: এদুর্ঘটনা ধর্মের গোঁড়ামি দুর্যোগেও ঘটে বৈ কি। এ-বিপাকে মানুষ পড়ে তখনই যখন

* ভাবার্থ: মানুষের জীবনে মহার্ঘ বলব তাদেরকেই যারা তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিব্যক্তি—যুদ্ধবিগ্রহের কুচকাওয়াজের দুর্ভোগ নয়—কিম্বা বাইরে থেকে চাপানো কোনো একটা খাতিরে নয়। সুসম্বদ্ধ সামাজিক জীবন দরকার, কিন্তু ব্যবস্থা হিসেবে—তার নিজের জন্যে নয়। মানুষের জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু বলবও তাদেরকে যারা শ্রেষ্ঠ ঋষির বাণীর সগোত্র।

মানবিক বুদ্ধি তার একটা বিশেষ প্রয়োগ, গবেষণা বা প্রকাশভঙ্গিকেই সত্য মনে ক'রে বাকি সবকিছুকে দেয় ডিশমিশ ক'রে। তাই একসময়ে ধর্মের পুরুতমোহান্ত যে-ধরণের ভুল করেছিল আজ ঠিক সেই ধরণের ভুলই করছেন বৈজ্ঞানিক পুরুতমোহান্তরা—যেজন্য রাসেল অমন দারুণ বিজ্ঞানোৎসাহী হ'য়েও আপত্তি ক'রতে বাধ্য হ'লেন এই ব'লে যে :

"কোন সত্যিকার বড় সভ্যতাই নিছক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা হ'তে পারে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাথাব্যথা শুধু জীবনের প্রকাশের ধরণটি নিয়ে : সে পারে কেবল অশুভকে নিবৃত্ত করতে—শুভকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে না। বিজ্ঞান রোগব্যাধি কমাতে পারে কিন্তু বলতে পারে না স্বাস্থ্যকে নিয়ে কী করা কর্তব্য; দারিদ্র্যকে দূর করতে পারে কিন্তু নির্দেশ দিতে পারে না অর্থ কী ভাবে ব্যয় করা উচিত…"*

পারে না কেন সেটা বোঝাও শক্ত নয়। বিজ্ঞানের উৎসাহীরা তাঁদের উৎসাহের স্বর্ণমৃগে যদি এতটা মুগ্ধ না হতেন তবে তাঁরাও বুঝতে পারতেন কেন বৈজ্ঞানিক সন্ধানের স্বধর্ম জীবনের লক্ষ্যনির্ণয় নয়—এমন কি পরম সত্যনির্ণয়ও নয় (মানে আন্তর সত্য যা কেবল অনুভব-গম্য—বস্তুবিশ্লেষণলভ্য নয়)—বিজ্ঞানের এলাকা হ'ল তথ্য—তত্ত্ব নয়; জড়ের গঠন-সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রবুদ্ধ চেতনার আকাশ-বাতাস

* Science and the Changing World বইটিতে রাসেলের The Scientific Society প্রবন্ধ: "No civilization truly worthy of the name can be merely scientific. Scientific technique is concerned only with the mechanism of life. It can prevent evils but cannot create positive goods…ইত্যাদি।

জড়বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে। কাজেই এ-জ্ঞানের সঙ্গে শুভবুদ্ধির কোন সম্বন্ধই নেই। শুভবুদ্ধি হ'ল আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার ফল, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের না।

কিন্তু ফের মুশকিল এল এই জন্যে যে এ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রজ্ঞার (wisdom) দিশা পাওয়া সহজ নয়। কারণ সে-পথকে শেষটায় মুক্তিপথ হ'তেই হবে, নইলে সে হতে পারে শুধু চোরাগলি। স্পিনোজা তাঁর Ethics-এর শেষে বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা : যে, মুক্তির পথ যদিও খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু এ মানতেই হবে যে সে-পথ দুর্গম, তাইতো সে-পথের পথিক এত দুর্লভ। * দুর্লভ হবে না? মুক্তির পথ যে জীবন-সাধনার পথ—সমস্ত জীবনের জিজ্ঞাসা দিয়ে চাইলে তবে যাকে মেলে—মনের একটিমাত্র সন্ধানীবৃত্তির আংশিক অনুশীলনে তাকে বাগানো যাবে কেমন ক'রে?

তাই তো মুক্তিপথের দিশারি হ'তে পারে না কোনো একটিমাত্র সাদামাটা দার্শনিকের ডগমা বা বৈজ্ঞানিক-বিধান। কিন্তু এহেন একরোখা বৈজ্ঞানিক জড়বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে রুসো প্রমুখ অনেকে ঠিক আবার এই ভুলই করলেন উল্টোদিকে—ব'লে বসলেন : ফিরে যেতে হবে সেই নিরুপকরণ নিরুপাধি উলঙ্গ সাদাসিদে জীবনে—বিজ্ঞানের সাজসজ্জা, বুদ্ধির জটিলতা, সভ্যতার

---

* "On the contrary, the wise man...is conscious of himself, of God...If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discovered. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is neglected practically by all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare..." (Ethics—Spinoza)

ফ্যাসাদ, বিচারের ভ্রান্তিবিলাস এসব বরখাস্ত ক'রে কুটীর-বাসী হ'তে হবে নির্ঝঞ্ঝাট গ্রামে—মিল ছেড়ে কাটো চরকা, মোটর ছেড়ে চড়ো গোরুর বা গাধার গাড়ি—যন্ত্রীতন্ত্রী হওয়া ছেড়ে হও নখীদন্তী। (টলস্টয়, গান্ধি এই রুসোরই মানসপুত্র—জানেনই তো।) সাধে কি ভলটেয়ার রুসোকে লিখেছিলেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত ব্যঙ্গলিপিকায় :

"হে ধীমান তব সম দেখি নাই নিরুপম
রসিক এমন !
মানবের মহা হিতে পশুধর্মে ফিরাইতে
যার প্রাণও পণ।
সত্য সখা, সাধ যায় চতুষ্পদ হ'য়ে হায়
হামাগুড়ি দিতে
কিন্তু ষাট বর্ষ কুলে সে-চাল গিয়েছি ভুলে,
হইবে কষিতে।"*

তবে হয় কি জানেন—যে কথা তাঁর Psychology of Social Development-এ শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন বড় চমৎকার ক'রে—মানুষ এম্‌নি ক'রেই এক একটা মন্ত্রতন্ত্রের দীক্ষা পেয়ে উৎসাহে অন্ধ হ'য়ে ভাবে—মুক্তি শুধু ঐ পথেই, কিন্তু হায় রে, সে-পথ শেষটা গিয়ে ঠেকে চোরাগলিতে—তখন ফিরতেই হয়—মানুষ বোঝে একটা সনাতন সত্য যেন আবার নতুন ক'রে : যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কোনো

* I have received, Sir, your new book against the human species...No one has ever been so witty as you are in trying to turn us into brutes : to read your book makes one long to go on all fours. As, however, it is some sixty years since I gave up the practice, I feel that it is unfortunately impossible for me to resume it." (Voltair's letter to Rousseau)

আংশিক সুখ-ব্যবস্থা নয়—তার তৃষ্ণার নিশানা হচ্ছে পূর্ণ সামঞ্জস্য। তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life Divine-এ :—"What we are striving towards is completeness and harmony; an imperfection and incapacity or a discord of our nature is that from which inwardly we most suffer." (The Gnostic Being, ১০৩৭ পৃ:)

এই জন্যেই এজগতে শান্তির, মৈত্রীর, প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন যুগে যুগে তাঁরাই যাঁরা পেয়েছেন এই উদার মুক্তদৃষ্টি—সমগ্রদৃষ্টি—যে-নির্বাধ দৃষ্টি মিলতে পারে না বুদ্ধির সমতল ক্ষেত্রে—তার জন্যে উঠতে হবেই ঋষিত্বের ধ্যানশিখরে। কেবল সেখান থেকেই দেখা যায় মঙ্গলের পরম স্বরূপ, আনন্দের পরম আলো, শান্তির পরম কান্তি, সৌন্দর্যের পরম প্রতিমা। এ জীবনে যেটুকু স্থায়ী শুভ তৃপ্তি, সার্থকতা, সিদ্ধির স্বাদ আমরা পেয়েছি সে এই সব পারমার্থিক দ্রষ্টাদেরই মন্ত্রপ্রসাদে, যেকথা অল্ডাস তাঁর Ends and Means-এ বড় সুন্দর ক'রে দেখিয়েছেন: (আমরাও সবাই হৃদয়ে অনুভব করি শান্ত মুহূর্তে) "All the ideals of human behaviour formulated by those who have been most successful in freeing themselves from the prejudices of their time and place are singularly alike......The enslaved have held up for admiration now this model of a man now that; but at all times and in all places, the free have spoken with only one voice."*

* ভাবার্থ: তাঁদের দেশকালের গণ্ডি যাঁরাই পেরিয়েছেন তাঁদের সবাই বলেছেন একই বাণীর কথা। বদ্ধ জীবই মতিভ্রান্ত—তারা আজ ছুটছে এ-পথে, কাল—ও-পথে। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে জীবন্মুক্ত মানুষের মন্ত্র হ'য়ে এসেছে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু একথা বললে এ স্বয়ংধ্বজ যুগে শুনবে কে বলুন? একেলে স্বাতন্ত্র্যবাদের ও ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার জয়ডঙ্কার সাম্‌নে এহেন সেকেলে বুলি দাঁড়াবে কোন্ বনেদে ভর ক'রে? সত্যনির্ধারণের তীর্থপথে যে শুধু একটি মাত্র পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়—সে-পদ্ধতি হাজারই মডার্ণ হোক্ না কেন—একথা এযুগে বোঝানো কঠিন বিজ্ঞানের নবজাত আস্ফালনের আঁধিতে। বড় প্রত্যয়, বড় অনুভব, বড় সত্য তর্কাতর্কির হুহুঙ্কারে মেলে না একথা এযুগে যে কেমন-কেমন শোনায় তার কারণ শুধু এই যে, এযুগের আবহাওয়া শ্রদ্ধার ফসলের অনুকূল নয়। অবশ্য হাওয়া বদ্‌লাচ্ছে একটু একটু ক'রে, লোকে সন্দেহ শুরু করেছে যে বিজ্ঞানের রাজ্যেও যা-ই চক্ চক্ করে তাই সোনা নয়। তবু এখনো একেলিয়ানার (অলডাসের ভাষায় the last bus-এর) ঘোর এখনো কাটে নি। বরং ধর্ম ফের মোহান্তগিরি করবার জন্যে তোড়জোড় বাঁধছে দেখে বৈজ্ঞানিকী একেলিয়ানাও ফের সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, বলছে ধ্যানধারণা, প্রেম-করুণা, স্বপ্ন-আল্পনা সব হ'ল সেকেলে প্রতিমার রং-রাংতা, একালে একমাত্র টেকসই সাঁচ্চা উপাস্য হচ্ছে বিজ্ঞান। তাই কাল স্বপ্নে শুনলাম এক ব্যাটালিয়ান জয়ধ্বজ বলশেভিক সায়েন্টিফিক তরুণ রেডিওতে কোরাস ধরেছেন নিউটন সেন্টেনারিতে বন্দেভ্রাতরম রাগে, কাড়ানাকাড়া তালে:

এযুগে তোমায় নম মনচোর, হে বৈজ্ঞানিক রাজা!
মুনিঋষি হায় শুধু নেশাখোর দাও মূঢ়েদের সাজা।
তুমি মহিমায় খুঁড়েছ পাতাল চিরেছ আকাশ প্রভু!
মুনি ঋষি চায় রচিতে আড়াল ধ্যানের জালেই তবু।
গগনে গরুড় কভু তুমি—কভু কেঁচো, মরি, খনি-তলে।
কভুবা অসুর কৃতান্ত প্রভু, অজেয় ভূমণ্ডলে!

হে সর্বভেদী, বস্তুরে ফুঁড়ে বসালে রাজ্য-পাট
তাই তব বেদী এ বিশ্ব জুড়ে— জয় জয় সম্রাট!
মুনি ঋষি ধুধু মরু ধার্মিক! মরে প্রেম ধ্যান খুঁজি।
এ-ভুবনে শুধু তুমি তার্কিক— তাই এত জ্ঞান বুঝি?
(আহা) হে একেলেনাথ, অধরা সেকেলে চেতনারে বিতাড়িতে
(উহু) ঘনঘটানাদ ক'রে কেগো এলে ম্যাটারের বৃংহিতে!

কিন্তু এ স্তবৈক্যতানের উৎসাহেও ক্রমশ ভাঁটা প'ড়ে এল যখন দেখা গেল যে ধর্মের উপলব্ধি ঠিক সেকেলে ধোঁয়া নয়—আর ম্যাটারের রূপও ঠিক রিইন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের মত সলিড্‌ নয়। ক্রমে, হরি হরি, আরো দেখা গেল যে ম্যাটারের রসাতলে সিঁধ কাটলেও নাকি তার তল পাওয়া যায় না—ইলেকট্রন যে কী বস্তু সেটা নাকি কল্পনা পর্যন্ত করা চলে না।* এর মানে কি? না, জলে কুমীর। আর ওদিকে—ডাঙায়? হায়রে—বাঘা বারুদ। ঠাট্টা না। আমি বলতে চাইছি বিজ্ঞান একদিকে মাটি ফুঁড়েও পেল না মাটির হদিশ, অন্যদিকে তার বিশ্লেষণে বস্তু-জগতের আধিপত্য পেয়েও মানুষ দেখল যে তার অন্তর চায় যে পরম শান্তি সুষমা প্রেম জ্ঞান যা বিজ্ঞানের বক-যন্ত্র ও গজকাঠির রাজ্যে মেলে না, মিলতে পারে না। এই জন্যেই মুখে ম্যাটারের বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি করা যত সহজ—মনে-প্রাণে তার

* এডিংটন তাই মুচকে হেসে বলছেন আজকের দিনে "বাস্তব" বলতেই বোঝায় ছায়ারও ছায়া, ইলেকট্রন্‌ হেন সোনামণিও যে কী বস্তু শুধালে—"**The answer will not be a description...he (the physicist) will point to a number of symbols, and a set of mathematical equations which they satisfy. (Science and the Unseen World).**

আধিপত্যে সায় দেওয়া ঠিক তত সহজ হ'য়ে ওঠে না, আর এই জন্তেই (ইতিপূর্বে দেখিয়েছি—বাহুল্যভয়ে আরো নজির দিলাম না) এযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই ফের ধর্মের রাজ্যে কেঁচে-গণ্ডূষ শুরু করেছেন এই মন্ত্র-পাঠ ক'রে যে ধর্মের রাজ্য হ'ল এমন চেতনার রাজ্য—অনুভবের সিংহাসন—যেখানে বিজ্ঞান ধরতে পারে না রাজদণ্ড। কারণ সে-রাজ্যের আকাশ-বাতাস, লীলাখেলা, ছন্দগন্ধ সবই এমন সুরে বাঁধা যার মহিমা বিজ্ঞানী মানস-লোকের বহু উর্ধ্বে। তাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চেয়ে আজ বলছেন বৈজ্ঞানিক : "Religion is the vision of something which stands beyond, behind, and within the passing flux of things; something which is real, and yet waiting to be realised; something which is a remote possibility, and yet the greatest of present facts; something that gives meaning to all that passes, and eludes apprehension; something whose possession is the final good, and yet beyond all reach; something which is the ultimate ideal, and the hopeless quest." †

সত্য কথা। আর এই জন্তেই বিজ্ঞান হ'তে পারে কেবল ধর্মের

† 'অধ্যাত্ম' হ'ল সেই সত্তার ধ্যানরূপ যে লীলাচক্রের অন্তরে থেকেও অন্তরালে —সমূর্ধ্বে; যে প্রত্যক্ষ—অথচ উপলব্ধির অপেক্ষা রাখে; যে সুদূর দুরাশা—অথচ সত্যের সত্য; যে গতিকে করে কৃতার্থ—অথচ নিজে থাকে প্রচ্ছন্ন, বুদ্ধির অগম্য; যে-লাভ ক্ষেমের ক্ষেম—অথচ চিরদুর্লভ, সাধনার সাধনা—অথচ সব সন্ধানের পার। (Science and the Modern World.)

বাহন—দোসরও নয়, প্রভুও নয়। কারণ বিজ্ঞান দিতে পারে না সেই আলো যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—যার আলোতে ভুবন আলো। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর Life Divineএ: "The utmost widening of a physical objective knowledge, even if it embraces the most distant solar systems and the deepest layers of the earth and sea and the most subtle powers of material substance and energy, is not the essential gain for us, not the one thing which it is most needful for us to acquire. That is why the gospel of materialism in spite of the dazzling trinmphs of physical science, proves itself always in the end a vain and helpess creed, and that too is why physical science itself with all achievements, though it may accomplish comfort can never achieve happiness and fulness of being of the human race."*

তাই মানুষ যুগে যুগে পরম সার্থকতার জন্যে বাইরের কাছে হাত পাতে নি—পেতেছে অন্তরের কাছে—কারণ অমৃত নেই বাইরের

* "বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের পরিধি যতই কেন না বিস্তীর্ণ হোক্, সে সুদুরতম সৌর জগৎকেই ধ'রে এনে দিক, কি গভীরতম জলস্থলগর্ভেরই বার্তা এনে দিক, কি সূক্ষ্মতম সত্তা বা শক্তিরই খবর দিক—এ-আহরণে মিলবে না ধনের ধন, বর, সম্পদের সম্পদ। সেই জন্যই বস্তুবিজ্ঞানের রাজসূয় যজ্ঞদীপ্তি আমাদের চোখ ধাঁধালেও বস্তুতন্ত্রের মন্ত্রবাণী খতিয়ে র'য়ে গেল অকৃতার্থ—আর সেই জন্যেই বস্তুবিজ্ঞানের হাজারো কীর্তিকলাপে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু সুরাহা হ'লেও মেলে না পরম সুখ বা সমৃদ্ধির কোনো পরম নির্দেশ।"

জাঁকজমকে, অমৃত-মন্দাকিনী চিরপ্রবহমাণা শুধু আমাদের অন্তরের অতলে। সেই আনন্দলোকের দিকে না ফিরলে মুক্তি নেই। এই কথাটি অলডাস বলেছেন তাঁর দীপ্তিময় ভাষায় বড় চমৎকার ক'রে—তাঁর After Many a Summer-এ। এতই চমৎকার সে-ভঙ্গি যে দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃত করার লোভ হচ্ছে। (তর্জমা ক'রেই দিই স্থান-সংক্ষেপের জন্যে):

পীট নামে একটি সরল আদর্শবাদী যুবক খুব রেগেছে:

"তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে কী শুনি? যে, আমরা কিছু করতে পারি নে?"

নিরুদ্বেগ বিচারকের সুরে মিস্টার প্রপ্টার বললেন: "এর উত্তর হাঁ-ও বটে, না-ও বটে। মানে যদি পুরোপুরি মানবিক স্তরে থাকো—কাল ও বাসনার স্তরে—তাহ'লে দেখবে যে খতিয়ে কিছুই করতে পারি নে আমরা।"

"এ তো হ'ল হার মানা"—পীট রুখে উঠল।

"সত্যকে সত্য ব'লে মানার নাম যদি হার মানা হয় তবে তাই।"

"দ্যুৎ। উপায় নিশ্চয়ই আছে।"

"এর মধ্যে 'নিশ্চয়' আসে কোত্থেকে?"

"তাহ'লে ঐ যারা হটর হটর ক'রে সমাজের নানা সংস্কার ক'রে বেড়াচ্ছে তারা?—তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে তাদের সব কাজ সব চেষ্টাই তো পণ্ডশ্রম।"

"সেটা নির্ভর করে তারা যা করছে সে-সম্বন্ধে তাদের ধারণার উপর। যদি তারা ভাবে যে তারা নানা দুঃখদৈন্যের এটা-ওটা-সেটার একটু-আধটু কাজচালানো-গোছের মেরামত করছে, যদি তারা

নিজেদের মনে করে সেই সব লোকের দলে যাঁরা একটা অশুভকে একটা প্রণালী থেকে টেনে অন্য একটা প্রণালীতে চালিত করছেন তা'হলে তারা বলতে পারে যে তারা যা করছে সব পণ্ড নয়। কিন্তু যদি তারা ভেবে ব'সে থাকে যে তারা যেখানে অশুভ ছিল সেখানে শুভকে ডাক দিল—তাহলে তাদের শ্রম পণ্ড বৈ কি।"

"কিন্তু যেখানে অশুভ ছিল সেখানে শুভকে ডাক দিতে তারা পারবে না কী জন্যে শুনি?"

"যে জন্যে দশ তলা থেকে আমরা ঝাঁপ দিলে আমরা হু হু ক'রে নিচুদিকে পড়ি। অর্থাৎ এ জগতের ধর্মই এই যে শূন্যে লাফালে আমাদের পড়তে হয় মাটির টানে। ঠিক তেম্‌নি, কাল ও বাসনাবদ্ধ মানবিক স্বভাবের স্তরে থাকলে তুমি অহিত ছাড়া আর কিছুই করতে পারো না। মানে, যদি তুমি ঐ স্তরে থেকেই কাজ করতে চাও—চাও শুধু ঐ স্তরেরই লীলাখেলা নিয়ে থাকতে। তা'হলে তোমাকে বলব না পাগল—যদি দেখি তুমি ভাবছ যে অশুভের জায়গায় তুমি শুভ আনছ? কারণ পাগল না হ'লে তুমি ঠেকে শিখতে যে ঐ স্তরে ভালো ব'লে কিছু নেই—আছে কেবল নানা রকম ও নানা ডিগ্রির মন্দ।"

"তা'হলে কী করবে তারা শুনি।"

"যদি তারা রকমারি অশুভ চায় বেশ তো—যা করছে ক'রে চলুক না। তবে যদি তারা সত্যি মানুষের হিতসাধন চায় তাহ'লে তাদের পদ্ধতি বদ্‌লাতে হবে। আর এখানে একটা ভারি আশার কথা এই যে এমন পদ্ধতি আছে যার ফলে শুভ ও মঙ্গলের আমদানি হয় এজগতেও। মানবিক স্তরে নয় অবশ্য—সেখানে কিছুই করবার নেই, অথবা অগুন্তি কাজ করবার আছে যা পণ্ডশ্রম। কিন্তু যদি

সে-স্তরে পৌঁছও যেখানে শুভের সহজ প্রতিষ্ঠা তাহ'লে এমন হিতসাধন করা যায় যা করবার ম'ত।"

এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে: তা'হলে কেমন ক'রে সে-স্তরে পৌঁছনো যায়? কী ক'রে এই অতিমানব অনুভবলোকের বাসিন্দা হওয়া যায়? এতবড় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই—তবে সাধারণ সন্ধানীর অন্তরের সায়ে এটুকু বললে হয়ত শ্রুতিকটু শোনাবে না যে-কথা অলডাসও বলেছেন পূর্বোক্ত বইটিতে (১২১—১২২ পৃষ্ঠায়) যে:

"And to some people fairly frequently, perhaps occasionally to all, there come little flashes of illumina--tion—momentary glimpses into the nature of the world as it is for a consciousness liberated from appetite and time, of the world as it might be if we didn't choose to deny God by being our personal selves. Those flashes come to us when we are off our guard: then craving and worry come rushing back and the light is eclipsed once more by our personality and its lunatic ideals, its criminal policies and plans." *

*অনেকে প্রায়ই আভাষ পান তাঁদের অনুভবে—বোধহয় সবাই-ই কখনো না কখনো পায় এ আভাষ যদিও অতি ক্ষণস্থায়ী এ-দর্শন—যে, বাসনা ও কালের বেড়াজাল পেরুলে এ-জগতের স্বরূপ কোন্ রঙে রঙিয়ে ওঠে, এ-জীবন কী হ'য়ে উঠতে পারত যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহম্-এর মধ্যে আটক থাকতে চেয়ে ভগবানকে না অস্বীকার করতাম। এই যে সব ঝিলিক এরা খেলে যায় আমাদের অসতর্ক মুহূর্তে: কিন্তু হায়রে, পরক্ষণেই বাসনা ও দাহনার বান ওঠে ডেকে—অমনি সে পরাদ্যুতি ঢাকে আমাদের ব্যক্তিরূপের মেঘে, উন্মত্ত আদর্শের মোহে ও ঘাতকবৃত্তির ফন্দিবাজিতে।

ভারি চমৎকার নয় কথাগুলি ?

এখানে শেষ করাই উচিত ছিল। কিন্তু এ-আশ্চর্য মানুষটির ভাষায় কবিত্ব-শক্তির কিছু পরিচয় না দিলে তাঁর এ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ পরিচিতি আরো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ব'লে তাঁর Eyeless in Gaza-র শেষ অধ্যায় থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তবে ইতি করব :

"Step by step towards the experience of being no longer wholly separate, but united at the depths with other lives, with the rest of being. United in peace. In peace, he repeated, in peace, in peace......A dark peace that is the same for all who can descend to it. Peace that by a strange paradox is the substance and source of the storm at the surface. Born of peace, the waves yet destroy peace ; destroy it but are necessary ; for without the storm on the surface there would be no existence, no knowledge of goodness, no effort to allay the leaping frenzy of evil, no re-discovery of the underlying calm, no realization that the substance of the frenzy is the same as the substance of peace...... From storm to calm and on through yet profounder and intenser peace to the final consummation, the ultimate light that is the source and substance of all things ; source of the darkness, the void, the submarine night of living calm ; source finally of the waves and the frenzy of the spray—forgotten now. For now there is only the darkness expanding and deepening, deepening into light ; there is only this final peace, this consciousness of being no more separate, this illumination..."

এ হ'ল "শান্তির"-র বর্ণনা—যথার্থ আধ্যাত্মিক শান্তি যাকে বলে—শান্তি বলতে চলতি ভাষায় আমরা যে নঙর্থক বিশ্রামজাতীয় সুখ বুঝি সে-শান্তি নয়, এ হ'ল সেই সদর্থক শান্তি, গভীর অমৃত যার কিছু-না-কিছু স্বাদ পান তাঁরা সবাই যাঁরা বাসনার এলাকা ছাড়িয়ে পৌছন সেই রাজ্যে যেখানে নেই হাজারো বিরুদ্ধ স্রোতের দ্বন্দ্ব। এ শান্তির বর্ণনা অলডাস যা দিয়েছেন তার মূলানুগ অনুবাদ আমি দেব না—কারণ ভাবানুগ অনুবাদেই তাঁর ভাবটা বেশি ফুটবে। বলছেন তিনি :

"ধীরে ধীরে চলেছি যেন সেই সত্তার অভিমুখে যেখানে খণ্ডতা আর খণ্ডতা হ'য়ে নেই—যেখানে আমার জীবন অবলীন হ'ল বিশ্বজীবন লীলার অতল তলে—যেখানে সব জীবনটাই গাঢ় হ'য়ে উঠল নিটোল হ'য়ে। শান্তি...শান্তি...শান্তি...সেই গহন নিথর শান্তি—যেখানে সবাইকারই অনুভূতি হয়ে গেছে একাকার অধ-উর্ধ্বে আশে-পাশে। অথচ—কী আশ্চর্য—সেই একই অতল শান্তি ঝড় তোলে উপরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যারা শান্তির দুলাল হয়েও প্রশ্নতিকে করে খান খান। কিন্তু এ-ধ্বংসলীলাও যে আবশ্যিক—উপরে যদি কেউ এ তুফান না তোলে তাহ'লে প্রাণের লীলাই যে হবে নিরস্ত, আমরা জানব না তো মঙ্গল্ কাকে বলে, লুপ্ত হবে যে সেই উদ্যম যা অশুভের লেলিহ নৃত্যকে করে প্রশমিত, নতুন ক'রে চিনবে না কেউ সেই অন্তঃশীলা স্তব্ধতাকে, মিলবে না সেই উজ্জ্বল উপলব্ধি যে প্রমত্ততার মূলাধার হ'য়েও শান্তির মূলাধার হ'তে অভিন্ন।...তারপর আবার ঝড়-তুফান থেকে ফিরে চলি সেই স্তব্ধতায়—তারও মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পাই আরো গভীর আরো নিবিড় শান্তি—আরো আরো—যতক্ষণ না ডুবে যাই সেই শেষ সমাধিলোকে, সেই পরম্ আলোয় যে-আলো

সব কিছুরই উৎস ও মূলাধার—অন্ধকারেরও, আকাশেরও, জলধি-অতলের সেই স্তব্ধচিন্ময় নিশীথেরও। আবার সে-ই যে লহরীলীলার শেষ উৎস—জলকলোচ্ছ্বাসের পরম প্রেরণা—যে এখন আমার কাছে বিস্মৃতিলীন। এখন শুধু আছে সেই গহন তিমির—উদ্বেল, গভীরায়মান অন্ধকার—যে কালো হ'তে হ'তে লীন হ'ল আলোয়। এই তো অন্তিম শান্তি অখণ্ড অভিন্নতার এই পূর্ণ চেতনা—দিব্যদ্যুতি !"

এটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "এটি একটি মস্ত যৌগিক উপলব্ধি"। বলবেন কি এ-জাতীয় উপলব্ধি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির মধ্যে মিলবে কোনো দিন—মিলতে পারে কখনো ?

সমাপ্ত